এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস রা. -এর
ইতিহাসখ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস

শেষ আঘাত

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

কিংবদন্তী বীর সেনানী হযরত আমর ইবনুল আস রা.-এর
ইতিহাসখ্যাত রোম অভিযানের চমকপ্রদ কাহিনী সম্বলিত উপন্যাস

মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন

ঐতিহাসিক উপন্যাস

শেষ আঘাত [তৃতীয় খণ্ড]

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ	মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন
প্রকাশক	তারিক আজাদ চৌধুরী আল-এছহাক প্রকাশনী বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল ফোন : ০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯
স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশকাল	মে ২০১২
গ্রাফিক্স	নাজমুল হায়দার
কম্পোজ	আল-এছহাক বর্ণসাজ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য	২০০ [দুইশত] টাকা মাত্র

984-837-062-5-[SET]

প্রিয় মারুফ মনসুর

তার সঙ্গে মক্কা মিনা আরাফা মুযদালিফা ও পবিত্র মদীনার
মাটিতে সফর সঙ্গী হওয়ার নেক ইচ্ছা মহান আল্লাহ্
কবুল করুন॥

–মুজাহিদ ইয়াসীন
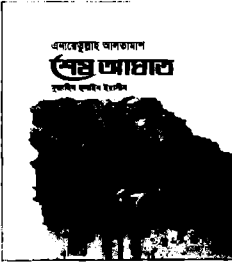
মেয়েটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো শারীনার দিকে।

'শারীনা!' মেয়েটি শারীনার একেবারে কাছে এসে বললো। 'তোমাকে চিনতে আমার মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। তুমি কি শারীনা নও?'

'হুঁ, 'আমি শারীনা', শারীনা কৌতূহলী গলায় বললো, 'মুখ থেকে আগে নেকাবটা তো সরাও। তোমার মুখটি কি আমি দেখতে পারি না? শুধু মুখের কথা শুনে তো সব সময় কাউকে চেনা যায় না। তুমি কি মুসলমান নও?'

'না, আমি মুসলমান নই। আমি আরবীলা। আমরা নিশ্চয় একে অপরকে কখনো ভুলতে পারবো না।' মেয়েটি বললো।

'উহ, আরবীলা' শারীনা আরবীলাকে জড়িয়ে ধরে খুব দ্রুত বললো, 'তুমি এখানে কি করে এলে? কি করছো এখানে? কার সঙ্গে এসেছো? তাড়াতাড়ি বলো। তোমার এখানে একা একা ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়।'

'আমি তো এসেছি ওই নষ্ট চরিত্রের আতরাবুনের সঙ্গে। আতরাবুন আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে। শুনেছি, সে নাকি মারা গেছে। এই খবরটা আমাকে দারুন আনন্দ দিয়েছে'।

'আর এখানে এক ফৌজি অফিসার রোহাশকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আতরাবুনের লাশটা কোথাও দেখা যায় কিনা সেটাও দেখছি। তাহলে আমি নিশ্চিত হয়ে যাবো যে, আমি মুক্ত। ওর লাশের মুখে আমি থুথু ছিটাতে চাই।'

আরবীলা শারানীকে যা বললো সংক্ষেপে তাহলো এই যে,

আতরাবুন তাকে এক প্রকার রক্ষিতা বানিয়ে রেখেছিলো। অথচ সে পঁচিশ বছরের যুবক এক রোমীয় অফিসার রোহাশকে ভালোবাসতো। আরবীলাও ছিলো রোহাশের মন-প্রাণ জুড়ে।

কিন্তু আরবীলার ওপর নজর পড়ে গেলো নারী খেকো আতরাবুনের'।

সে তার অবৈধ ক্ষমতার জোরে তার মা বাবাকে নগদ কিছু টাকা পয়সা দিয়ে আরবীলাকে এক প্রকার কিনে নিলো। এ নিয়ে টু শব্দটি করলেও ওর মা বাবার বড় ভয়ংকর পরিণাম হবে বলে হুমকি দিয়ে রাখলো আতরাবুন।

আরবীলার মা বাবা আগ থেকেই আতংকিত ছিলো। কারণ, ওরা একে তো কিবতী ছিলো, দ্বিতীয়ত হেরাকলের মনগড়া সরকারি ঈসায়ী ধর্ম মানতো না ওরা। তাই ওরা মুখ বুক পাথর বানিয়ে একেবারে চুপচাপ রইলো।

এটা পাঁচ ছয় মাস আগের কথা। আরবীলা আতরাবুনের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে অনেক কান্নাকাটি করেছে। বুক ফাটিয়ে আর্তনাদ করেছে। আতরাবুনের দানব হাত তার গলা চেপে ধরে কণ্ঠ রোধ করেছে। তারপরও আরবীলা তার প্রেমিক রোহাশের সঙ্গে লুকিয়ে ছাপিয়ে তিন তিনবার দেখা সাক্ষাত করেছে।

আতরাবুন একবার এ ঘটনা জানতে পেরে আরবীলাকে মারপিট করেছে। রোহাশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে। যেহেতু রোহাশ ফৌজি অফিসার ও শাহী খান্দানের সঙ্গে তার দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা ছিলো তাই আতরাবুন ওর বিরুদ্ধে বড় কোন ধরণের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলো না। তবে ওকে একেবারে ক্ষমাও করে দিলো না।

রোহাশ তখন ইস্কান্দারিয়ায় ছিলো। এখানে থাকলে আরবীলার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাত হওয়াটা সহজ। তাই আতরাবুন তাকে ইস্কান্দারিয়া থেকে সরিয়ে সেই ফৌজে পাঠিয়ে দিলো যারা ফারমা ও বিলবীসে ছিলো।

আসলে আতরাবুন রোহাশের জন্য চতুর কৌশলে মৃত্যুর ফায়সালা করে রেখেছিলো। আতরাবুন ধরেই নিয়েছিলো, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে রোহাশ নিশ্চিত মারা পড়বে।
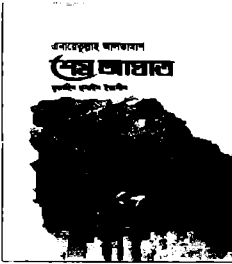
আতরাবুন বার হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে আসার সময় আরবীলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সঙ্গে আরেকটি মেয়েও নিয়ে আসে। বিভিন্ন অভিযানে মুসলমানরা তো নিজেদের স্ত্রী কন্যা বা বোনদেরকে সঙ্গে নিয়ে আসতো। আর রোমী ফৌজি অফিসাররা নিয়ে আসতো তাদের রক্ষিতাদেরকে।

যা হোক, আরবীলা কোন এক সূত্রে জানতে পারে যে, রোহাশ বিলবীসের দুর্গে রয়েছে। সঙ্গী রক্ষিতা মেয়েটি যদি আরবীলার সঙ্গ দিতো তাহলে আরবীলা খাবারে বিষ মিশিয়ে বা অন্যকোন ভাবে আতরাবুনকে আগেই হত্যা করতে পারতো। কিন্তু সঙ্গের

রক্ষিতাটি আতরাবুনের ওপর দারুন খুশি ছিলো একারণে যে, সে এত বড় এক জেনারেলের রক্ষিতা।

আরবীলা একমাত্র আতরাবুনের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে পারতো। আর সেটা সে করতোও সব সময়।

অবশেষে বিলবীসের লড়াইয়ের শেষ দিকে তার কানে পৌঁছে আতরাবুন মারা গেছে।

আতরাবুনের সেনা ছাউনি ছিলো বিলবীসের রনাঙ্গণ থেকে দুই তিন মাইল দূরে। সেখানে অবশিষ্ট যে কয়জন রোমীয় সেনা ও রোমীয় কর্মচারী ছিলো সব দেখতে দেখতে পালিয়ে যায়। আতরাবুনের অন্য রক্ষিতা মেয়েটিও ওদের সঙ্গে পালিয়ে যায়।

আরবীলা আতরাবুনের তাঁবুতেই রইলো। তার বিশ্বাসই হচ্ছিলা না, আজ তার কপাল হঠাৎ এত বড় হয়ে গেছে যে, আতরাবুনের মৃত্যু সংবাদ শুনতে পাবে।

অনেকক্ষণ পর সে তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখলো, এত বড় তাবুপল্লীতে একমাত্র সেই আছে।

সেখানে তো একটা ঘোড়াও ছিল না যার ওপর সওয়ার হয়ে সে ওখান থেকে পালিয়ে যাবে। পালিয়ে যেতে চাইলেও সে বিলবীসের দিকে হাঁটা দিলো। রোহাশের টানই তাকে বিলবীসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মৃত লাশ ও আর্তনাদরত আহতদের গা এড়িয়ে সে রোহাশকে খুঁজতে খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

এ সময় নেকাবে আবৃত দুটি মেয়েকে দেখে আরবীলা এগিয়ে যায় এবং নেকাবের ভেতর শারীনার চোখ দেখেই সে অনুমান করে এটা শারীনা।

হেরাকলের মহলে আরবীলা প্রায়ই শারীনার সঙ্গে দেখা করতে হেরাকলের মহলে আসতো। শারীনার সঙ্গে ওর দারুন সখ্যতা ছিলো।

'একটু ভেবে দেখো শারীনা!' আরবীলা বললো, 'রোহাশকে আমি এমন পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম যে, এটাও চিন্তা করলাম না যে, মুসলমানরা যদি আমাকে ধরতে পারে তাহলে কী অবস্থা হবে আমার'।

'না, আরবীলা!', শারীনা তাকে বাঁধা দিয়ে বললো, 'তোমার শুধু ধরা পড়ারই আশংকা ছিলো। মুসলমানদের পক্ষ থেকে অন্য কিছুর আশংকা ছিলো না। তোমার মাথায় যে আশংকা নিয়ে তুমি ঘুরছিলে- মুসলমানদের ব্যাপারে এর বিন্দুমাত্র কল্পনা করাও তাদের প্রতি বড় অবিচার'।..........

'শত্রুপক্ষের যেসব মেয়েরা বন্দি হয়ে আসে মুসলমানরা তাদেরকে তাদের নারীমহলে পাঠিয়ে দেয়। যত বড় পদের অধিকারী হোক না কেন কোন মুসলমান সেনা কর্মকর্তা কোন মেয়েকেই রক্ষিতা বানাতে পারে না'।...

'তাকে রীতি মতো বিয়ে করে স্ত্রী বানাতে পারে। বন্দি নারীদের সঙ্গে এমন আচরণই করা হয়। তুমি ধরা পড়লে ক্ষতি এতটুকু হতো, তুমি আর রোহাশকে খুঁজতে পারতে না। ...কিন্তু তুমি রোহাশকে কোথায় কোথায় খুঁজে মরবে?'

'তুমি কি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারো না?' আরবীলা প্রায় কেঁদে ফেলে বললো।

'অবশ্য এটাও আমি জিজ্ঞেস করিনি যে, এখানে তোমার অবস্থান কী এবং তুমি আমার ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে আদৌ পারবে কি না?'

'হুঁ, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।' শারীনা তাকে আশ্বস্ত করে বললো । 'আমি এখানে পৌঁছেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারপর যার সঙ্গে এসেছিলাম তার সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়'।

'আমি তোমার প্রতি কোন শর্তারোপ করছি না, পরামর্শ দিচ্ছি। সেটা হলো, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে রোহাশকে খুঁজবো। তাকে জীবিত পেয়ে গেলে তোমরা দুজনই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ো। তখন সহজেই তোমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে যাবে'।

শারীনার মুখে ইসলামের ব্যাপারে আরো কিছু তুলনামূলক কথা শুনে আরবীলা বলে উঠলো

'এটা তোমার শর্তারূপ হোক বা পরামর্শ হোক, রোহাশকে পেয়ে গেলে দুজনে আমরা এক সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করে নেবো।'

শারীনা ঈনীকে সেখানেই ছেড়ে দিলো এবং আরবীলাকে সঙ্গে নিয়ে কেল্লার ভেতর ঢুকে গেলো।

শারীনা সবার আগে সেসব রোমীকে দেখতে চাচ্ছিলো যারা অস্ত্র সমর্পন করছিলো।
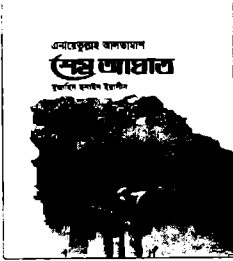
খুবই মজবুত শক্তিশালী, চাওড়া ও উঁচু প্রাচীর পরিবেষ্টিত বিলবীস শহর। এসব প্রাচীরের ওপর জায়গায় জায়গায় লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যে কিছু অচেতন আহত সৈন্যও রয়েছে।

শারীনা জানতো অস্ত্র কোথায় সমর্পণ করা হচ্ছে। ভেতরে বড় একটা ময়দান আছে। সেখানেই অস্ত্র সমর্পণের কাজ চলছে।

শারীনা ও আরবীলা ময়দান থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই রোমীয় সেনাদের ছোট একটা দল ওদের নজরে পড়লো। তিন চারজন মুজাহিদ ওদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ময়দানের এক দিকে।

দলটি তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আরবীলা আচমকা, রোহাশ, বলে চিৎকার করে উঠলো।

রোহাশ বলতে বলতে দলটির দিকে ছুট দিলো। রোহাশ ঠিকই সে দলে ছিলো। শারীনাও ওর পিছু দৌড়াতে লাগলো। রোহশ আরবীলাকে দেখেই দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

'আরে ওই রোমী!' এক মুজাহিদ তাকে দল থেকে বের হয়ে যেতে দেখে পাজরে খোঁচা মেরে বললো, আরে যাচ্ছো কোথায়? নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে থাকো। তুমি তো কয়দী।'

মুজাহিদ তাকে ধাক্কিয়ে দলের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো।

শারীনা আরবীলাকে সেখানেই থামিয়ে দিয়ে বললো মুখটি যেন সে আগের মতো নেকাবে ঢেকে ফেলে।

'এই মেয়েরা!' তোমরা এখানে কি করছো? সেই মুজাহিদ তাদের দুজনকে বললো। 'অন্য মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে কাজ করো। এখানে তামাশা দেখার কি আছে?

শারীনা আরবীলার হাত ধরে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়লো এবং শহর থেকে বেরিয়ে গেলো। রোমী ফৌজের এক কয়েদী অফিসার তাদের দেখে কেন এগিয়ে এলো? কেন জানি ওদেরকে এ প্রশ্নটি সেই মুজাহিদ করলো না।

তারপরও এধরনের প্রশ্ন করার আশংকা এখনো রয়েছে। তাই শারীনা আরবীলাকে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে তার স্বামী হাদীদের কাছে চলে গেলো।

আরবীলার পরিচয় দিয়ে তার সব কথা সংক্ষেপে হাদীদকে জানালো। রোহাশকে মুক্ত করা গেলে যে ওরা দুজন ইসলাম গ্রহণ করবে এটাও জানালো।...কথাগুলো হাদীদ তার সঙ্গীদের জানালো।

হাদীদ ও তার সঙ্গীরা গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ লোক। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)- এর সঙ্গে ওদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। আর রোহাশের মতো একজন রোমীয় সেনা অফিসারের মুক্তির ব্যাপারে সিপাহসালারই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই তাকেই এখন দরকার। কিন্তু এসময় তাকে পাওয়াটা খুব সহজ নয়।

মাত্র শহর জয় হয়েছে। শহরের শৃংখলা, নিরাপত্তা বহাল করা, সবদিক থেকে রিপোর্ট নেওয়ার কাজে তদারকি করতে হবে তাঁকে।

সবচেয়ে স্পর্শকাতর কাজ মালেগনীমতের ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

সঙ্গে সঙ্গে সিপাহসালারের এটাও দেখার ছিলো যে, শহরের কোথাও কোন ধরনের হয়রানি বা লুটপাট চলে কি না। মুজাহিদদের পক্ষ থেকে যদিও এ আশংকা ছিলো না, কিন্তু মুসলিম সেনাদলের মিসরীয় বেদুঈনরা তো তখনো ইসলামী আইনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)-কে পাওয়া গেল ঠিকই; কিন্তু তিনি তখন শহরের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক ও তাঁর দুই সালারকে

নিয়ে জরুরী সলাপরামর্শ করছিলেন। অপেক্ষা করতে করতে মাগরিবের সময় হয়ে গেলো।

সেখানে তো কোন মসজিদ ছিলো না। এক মুজাহিদ বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দিলো। তার পেছনেই সবাই জামাআতে নামাযের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে গেলো। সিপাহসালারও ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন।

এটাই সুবর্ণ সুযোগ। নামায শেষ হতেই হাদীদ পায়ে পায়ে সিপাহসালারের কাছে চলে গেলো। তাকে আরবীলা ও রোহাশের সব কথা জানালো।

সব শুনে সিপাহসালার হুকুম দিলেন, রোহাশ নামের রোমী অফিসারকে যেন এখনই তার তাঁবুতে হাজির করা হয়।
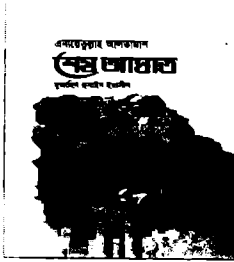
নামাযের অনেক্ষণ পর আমর (রা.) তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন। রোহাশকে সেখানে আরো আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে হাদীদ, শারীনা ও আরবীলাও ছিলো। চারজনকে বসালেন আমর (রা.)।

'এখন বলো কী ঘটনা তোমাদের?' আমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন।

সবার আগে আরবীলা কথা শুরু করলো। কথা শুরু করতেই তার বুক ভেঙ্গে কান্না এলো। কান্নার বেগে তার জন্য কথা বলাই মুশকিল হয়ে গেলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে কথা শুরু করলো।

শারীনাকে যা শুনিয়ে ছিলো সিপাহসালারকে তাই শোনালো আরবীলা।

'এখন তোমরা কি করতে চাচ্ছো?' আমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন।

'এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছ থেকে শুনুন।' রোহাশ বলে উঠলো। 'আপনি যদি মনে করেন আমি একজন অসহায় মানুষ বলে এই কয়েদী দশা থেকে মুক্তি চাচ্ছি তাহলে ভুল করবেন। আসলে আমি সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না যেখানে কারো ইযযত সম্মান নিরাপদ নয় এবং যেখানে একজন জেনারেলের হুকুমেই সবকিছু চলে। হেরাকল এমন এক বাদশাহ যিনি খ্রিস্টানদের জন্য এক বিকৃত ধর্ম আবিস্কার করেছেন এবং অস্ত্রের মুখে সে ধর্ম মানতে জনগনকে বাধ্য করেছেন।...

'মুসলমানদের ব্যাপারে আমি অনেক কিছু শুনেছি। যদি এর সব কিছু ঠিক হয় তাহলে আমি আপনাদের ধর্মে দীক্ষিত হতে চাই। আরবীলারও তাই ইচ্ছে'।......

'আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে, আমি একজন অভিজ্ঞ ফৌজি অফিসার। আমার সেবা আপনাকে হতাশ করবে না'। আপনি যদি আমাকে কয়েদ করেই রাখেন তাহলে এটাও নিশ্চয় অনুভব করবেন যে, আপনার কাজে লাগার মতো একজন মূল্যবান অফিসারকে নষ্ট করছেন। এখনো আমি একজন রোমীয় খ্রিস্টান ঠিক, কিন্তু রোমী শাসকদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেও মুখিয়ে আছি।'

এত সহজে অন্যের কথায় প্রভাবান্বিত হওয়ার মতো লোক নন আমর ইবনে আস (রা.)। তিনি রোহাশের সঙ্গে রোমী ফৌজের খুটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বললেন। এর দ্বারা তিনি দেখতে চাচ্ছিলেন, রোহাশ কতটা বিশ্বাসযোগ্য। দীর্ঘ কথা বার্তার পর স্বতঃস্ফূর্ত মনে আমর ইবনে আসের হাতে রোহাশ ও আরবীলা ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইসলামের প্রাথমিক বিষয়াদি ও দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য সব সময় একদল বিশেষজ্ঞ আলেম মুসলিম সেনাদলে কাজ করে থাকে। রোহাশ ও আরবীলাকে এদলের দায়িত্বে তুলে দেওয়া হলো।

এর কয়েকদিন পর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রোহাশ ও আরবীলার বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হলো। রোহাশের নাম পাল্টে রাখা হলো ফারুক। আর আরবীলার নতুন নাম হলো ফাতেমা।

আমর ইবনে আস (রা.) এখানে অভিযানের অনেক আগে মিসর ভ্রমণে এসে মিসরের ব্যাপারে অনেক কিছুই জেনে যান। এখন তিনি যে এলাকায় অগ্রসর হচ্ছেন সে এলাকা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা রাখেন। কিন্তু এতটা নয় যতটা তিনি প্রয়োজন মনে করছেন।

আগেরবার যখন মিসর এসেছিলেন তখন মিসর তার চোখে ছিলো অন্যরকম তাৎপর্যময় দেশ; কিন্তু এখনকার অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত তো সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন সূত্র থেকে তার কাছে অনেক কথাই আসছে। কিন্তু সেগুলোকেও তিনি যথেষ্ট মনে করছেন না। এখন তার হাতে একজন রোমীয় অফিসার আছে। সঠিক ও স্পষ্ট তথ্য তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

'তুমি তো একজন ফৌজি অফিসার ছিলে ফারুক।' আমর (রা.) রোহাশ পরিবর্তিত ফারুককে বললেন।

'তুমি এক আধটা ব্যাটালিয়নের নেতৃত্বে ছিলে। কিন্তু এখনই তোমাকে কোন ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব দেবো না। কিছু দিন তুমি আমার গোয়েন্দা বিভাগে থাকো। নৈশ গেরিলা হামলার জন্যও তোমাকে পাঠানো হবে'।.....

'মনে রেখো, তোমাকে আমি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মনে করছি। আমার এখন নীল দরিয়া ও ওপারের অবস্থা সম্পর্কে জানা জরুরী। সামনে যে আরো দু তিনটি কেল্লা আছে তা তো জানিই। কিন্তু সেসব কেল্লার প্রতীরক্ষা অবস্থা কি তাও জানা দরকার।
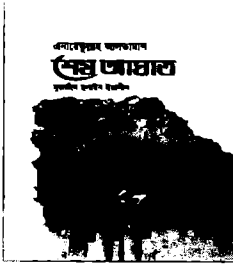
'আমার চেয়ে ভালো এব্যাপারে আপনাকে আর কে বলতে পারবে?' ফারুক হেসে বললো। 'এখান থেকে আপনি সামনে অগ্রসর হলে কিছু পথ গিয়ে মরুভূমিতে পড়বেন। এরও আগে সামান্য কিছু এলাকা পড়বে দারুন সবুজ ও মনোরম। সম্ভবত এমন এলাকা আপনারা এর আগে কখনো দেখেননি'।...

'নীল দরিয়ার এ প্রান্তে উম্মেদানীন নামে একটি শহর গড়ে উঠেছে। কেল্লা বেষ্টিত অসম্ভব মজবুত শহর সেটা। শহরের একেবারে কাছেই নদীর বড়-সড় একটা ঘাটলা রয়েছে। এখানে নৌকা ও মাঝারি ধরনের পালতোলা জাহাজও অবস্থান করে। ফেরাউন তার আমলে এ শহরকে দেশের অস্থায়ী রাজধানীও বানিয়েছিলো।'..........

'মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মূলত এখান থেকেই শুরু। আপনার বীরত্ব, শক্তি ও জযবার অনেক বড় পরীক্ষা দিতে হবে ঐসব কেল্লায়। প্রতিরক্ষার দৃষ্টিতে বিচার করলে আমার মন্তব্য করাটা দুঃসাহসের হলেও আমি এটা বলবো যে, আপনার সঙ্গে যে সেনাদল আছে লড়াই ও টিকে থাকার জন্য এর সংখ্যা নেহায়েতই কম'।

'শুধু একটি কেল্লাতেই যে পরিমাণ রোমী ফৌজ আছে তাও আপনার সেনাদের কয়েকগুণ বেশি। তবে সামনের কেল্লাসহ পরবর্তী যত কেল্লা আছে তাতে যত রোমীয় ফৌজ আছে সারা আরবেও সম্ভবত এত ফৌজ নেই'।

'কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে যেটা আপনাকে কিছুটা সুবিধা দেবে। সেটা হলো তাদের ওপর আপনার সৈন্যদের এমন আতংক ছড়িয়ে আছে যে, আপনার সৈন্যরা যখন 'নারায়ে তাকবীর' বলে শ্লোগান দেয় তখন রোমী ফৌজের প্রত্যেক সৈনিকের চোখে মুখে ভয় ও আতংকের কালো ছায়া বিস্তার করে'।.....

'বিলবীস থেকে পালিয়ে যাওয়া রোমী ফৌজ যেখানেই যাবে সেখানেই আপনাদের ব্যাপারে আতংক ছড়িয়ে যাবে'।...

'আসল কথা হলো, আপনার সেনাদলের যে মনোবল তার ছিটে ফোঁটাও রোমীদের মধ্যে নেই'। ....

'উম্মেদানীনের দক্ষিণ দিকে কয়েক মাইল দূরে ব্যবিলনের অনেক বড় শহর। এটাও কেল্লা পরিবেষ্টিত। আপনাকে আমি একান্ত মনে পরামর্শ দিচ্ছি, এই কেল্লা জয় করতে আপনার এই বর্তমান সৈন্যদল নিয়ে যাবেন না'।....

'কারণ, ব্যবিলন শহরে এত বেশি সেনা রয়েছে যে, ওরা যদি একবার কেল্লার বাইরে এসে আ' নার সেনাদলের ওপর আক্রমণ করে মুহূর্তকালও আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন া। মুজাহিদদের পা টলে যাবে'।...

'এই কেল্লার প্রাচীরের ওপর দূরপাল্লার পাথর নিক্ষেপের জন্য মিনজানীকও আছে। এর জন্য আপনার সেনাদের অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এই কেল্লার প্রাচীর অনেক প্রশস্ত এবং পাথুরে। আপনি এতে দড়ি নিক্ষেপ করে আংটাও গাঁথতে পারবেন না'।.......

'ফেরাউনের যুগের এ কেল্লা রোমীয়রা এসে আরো অনেক মজবুত ও সংগঠিত করে তুলেছে। রোমীয়রা যে একে শ্রেষ্ঠ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে গর্ব করে সেটা মোটেও অমূলক নয়'।...

'নদীর তীরবর্তী আরেকটি কেল্লাবেষ্টিত শহর হলো 'ফিউম'। এ শহরের কেল্লাগুলোও মজবুত। উম্মেদানীন ও ব্যবিলন যে পর্যন্ত জয় করতে না পারবেন ফিউম শহরে সে পর্যন্ত পৌঁছতেই পারবেন না। আপনি সোজা ফিউম-এ যদি চলে যান এবং ফিউম অবরোধ করেন তাহলে ব্যবিলনের এক অংশের সৈন্যও যদি অবরোধ ভাঙ্গার জন্য পেছন থেকে আপনার ওপর হামলা করে আপনি পেছন ফিরে তাকানোর আগেই সব নাটক শেষ হয়ে যাবে।'...

'একমাত্র উল্লেখযোগ্য সেনাসাহায্য পেলেই আপনি ব্যবিলনে অভিযান চালাতে পারেন'।.....

'এই সুবিশাল এলাকার গুরুত্ব এতই বেশি যে, এখানে ফেরাউনের পিরামিড অবস্থিত। 'আবুল হাওল'-এর পিরামিড সারিও রয়েছে এখানে। কয়েকটি দেশের সমান এ এলাকার পরিধি। যে এই এলাকা জয় করতে পারবে, ধরে নিন সে পুরো মিসর জয়ের পথ উন্মুক্ত করে নিলো'।.....

'মুকাওকিস ও আতরাবুন আমাদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে ছিলেন যে, উম্মেদানীন, ব্যবিলন ও ফিউম পর্যন্ত মুসলমানরা পৌঁছে গেলে তখন রোমীদের জন্য সেটা হবে জীবন-মরণ যুদ্ধ।'...

'রোমীরা এই এলাকায় হেরে গেলে মিসরের অধিকাংশ ঠিকানাই তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। হেরাকল শাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, 'হে শাম, আল-বিদা, আমরা আর কোন দিন তোমার মাটিতে বিচরণ করতে পারবো না'।...

'এখানকার যুদ্ধে যদি আপনি জিতে যান তাহলে হেরাকল নীল দরিয়ার ওপারে দাঁড়িয়ে এটা বলার প্রস্তুতি নিতে থাকবে যে, 'হে মিসর! আমরা হয়তো আর কখনো তোমার মাটিতে ফিরে আসতে পারবো না'।

আমর ইবনে আস (রা.) মনোযোগ দিয়ে ফারুকের কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন,

'কিবতী খ্রিস্টানদের মনোভাব কি? হেরাকলের বিরুদ্ধে কি ওদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা আছে?'

'ওদের প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় না মাননীয় সিপাহসালার!' ফারুক বললো, 'এটা ঠিক যে, কিবতী খ্রিস্টানরা যুদ্ধের ময়দানে রোমীয় সেনাদের সহযোগিতা করবে না'।......

'তবে বিনয়ামীন খুবই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক। তিনি এটাও হয়তো চিন্তা করেন যে, হেরাকলকে যদি ক্ষুব্ধ করে তুলেন এবং বিজয় তারই হয় তাহলে তো একজন কিবতীকেও জীবন্ত রাখবেন না হেরাকল'।.......

'তাছাড়া হেরাকলের মনোনীত আসফাকে আজম (প্রধান পাদ্রী) কীরাসও অতি চতুর ও ধূর্ত লোক। তিনি এমন কুটচাল দেবেন যে, কিবতী খ্রিস্টনরা ধোকায় পড়ে তার দলে ভিড়ে যাবে'।...........

'হ্যাঁ, আপনার কাছে যে সৈন্যদল আছে একমাত্র তাদের ওপরই আপনি নির্ভর করতে পারেন। কীরাস ও বিনয়ামীনের রাজনীতির খেলাটা বুঝতে পারলেই আপনি আর কিবতীদের ওপর ভরসা করবেন না। আপনার সৈন্য সংখ্যা কম হোক বেশি হোক এটাই আপনার আসল শক্তি।'

আমর ইবনে আস (রা.) তার কথা শুনে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।
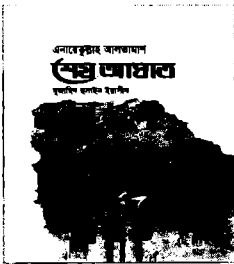
মদীনা থেকে সেনা সাহায্য রওয়ানা হয়েছে কিনা এ সংবাদ এখনো আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে পৌঁছেনি।

বিলবীস জয়ের সংবাদ জানিয়ে আমর (রা.) হযরত উমর (রা.)- এর কাছে দ্রুত পত্রদূত পাঠিয়ে দিলেন। পত্রে জরুরী ভিত্তিতে সেনা সাহায্য পাঠানোর কথা বলা হলো। সেনা সাহায্য ছাড়া আর এক কদমও সামনে অগ্রসর হওয়া মানে পুরো সেনাদলকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া। পত্রদূতকে অবিরত সফরের নির্দেশ দিলেন।

পরদিন ফজরের পর তাঁর সহকারী সালার ও পদস্থ সেনা কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে জুরুরী এক বৈঠকে বসলেন। আমার ইবনে আস (রা.) সবার উদ্দেশ্যে বললেন,

'বন্ধুরা আমার, তোমাদের যে আমি অতি কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন করতে যাচ্ছি এ উপলব্ধি আমার আছে। এ ছাড়া তো কোন উপায়ও নেই। সৈনিকদের শারীরিক অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি খুব কাছ থেকে। তারপরও আমি এ ফয়সালা করেছি যে, এখান থেকে আমাদের খুব দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে হবে। পরবর্তী কেল্লাটি অবরোধের আওতায় নিয়ে নিতে হবে।...

'মিসর অভিযানের বিরোধী যারা ছিলেন তাদের অন্যতম হযরত উসমান (রা.) বলেছিলেন, 'আমি অন্ধকারে ঝাপ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। আর সেনাদলকে অজানা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিই অনায়াসে। কখনো কখনো মৃত্যুমুখেও ফেলে দিই'। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো একথার সঙ্গে একমতও।.......

'আমার বিরোধীরা আমার ব্যাপারে যা বলেন তা বেঠিক নয়। কিন্তু এও ঠিক যে, আমি অন্ধের মতো কোন ঝুঁকিতে পা বাড়াই না। আমি বুঝে শুনে এবং প্রতিটি দিক ভেবে চিন্তে যাচাই বাছাই করে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তে পা বাড়াই'।

'মাননীয় সিপাহসালার! এক সালার বলে উঠলেন, 'এখন তো আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে নয় যারা মিসরে অভিযানের বিরোধীতা করছিলেন। আমি ভুল কিছু বলে থাকলে আমাকে মাফ করে দিবেন। আমাদের এখন রোমীয় সেনাদের মুখামুখি দাঁড়াতে হবে। যারা সামনের কেল্লাগুলোয় মৃত্যুদূত হয়ে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। আমাদের সেই শত্রুদলের ব্যাপারে কথা বলাই কি উচিত নয়?'
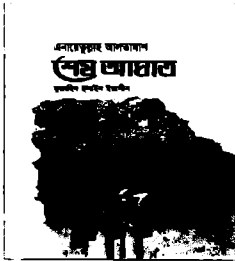
'তুমি আমার অন্তর থেকে অনেক বড় বোঝা নামিয়ে দিয়েছো হে আমার বন্ধু'। আমর (রা.) স্মিত হাস্যে বললেন, 'আমার কথার অর্থ হলো রোমীয় সেনাদের তাজাদম হওয়ার ও সামলে নেয়ার সুযোগ দেয়া যাবে না'।.....

'আমরা এখানে বসে সেনা সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকলে রোমীয়রা ধরে নিবে যে, আমরা আর অভিযান পরিচালনার মতো অবস্থায় নেই। আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং স্বল্প সংখ্যক হওয়াতে অধিক রোমীয় সেনাদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি'।.....

'আমরা এখানে বসে থাকলে এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, যে কোন সময় রোমীয়রা এসে বিলবীস অবরোধ করে নেবে। তখন আমাদের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ হয়ে যাবে'।...

'এটাও মনে রেখো, রোমী ফৌজের পিছু হটার জন্য পুরো মিসর পড়ে আছে। কিন্তু আমাদের পা এখান থেকে উপড়ে গেলে আমাদের আশ্রয় নেয়ার মতো আর কোন জায়গা থাকবে না'।........

'রোমীয় ফৌজের ওপর আমাদের সেনাদের ভয়-আতংক অব্যাহত রাখতে চাই আমি। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি এবং কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে পরবর্তী পদক্ষেপে পা বাড়াবো- আমাদের পক্ষের এতটুকু শিথিলতাও আমি ওদেরকে বুঝতে দিতে চাই না'।.....

'এ অবস্থায় সেনা সাহায্যের প্রত্যাশা করা কি উচিত?' আমরা তো এর কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না।' এক সালার জিজ্ঞেস করলো।

'সেনা সাহায্য ইনশাআল্লাহ আসছে।' আশ্বস্ত গলায় বললেন আমর (রা.), 'সেনা সাহায্য আসবে না– এধরনের চিন্তা মোটেও মনে স্থান দিয়ো না। তোমরা কি আমীরুল মুমিনীন সম্পর্কে জানো না? তিনি আমাদেরকে একলা ছেড়ে রাখবেন না'।...

'আমার ইচ্ছা ও ফায়সালা হলো, আমরা এগিয়ে গিয়ে উম্মেদানীনকে অবরোধ করবো। আল্লাহর তাওফীকে আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে এই কেল্লা জয় করবো'।...

'আল্লাহর সাহায্যে যদি আমরা সফল হতে পারি তাহলে উম্মেদানীনের তীরবর্তী সব জাহাজ ও নৌকা আমাদের হবে। তখন আর নীল দরিয়া পারাপারে আমাদের কোন সমস্যা থাকবে না'।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, আমার ইবনে আস (রা.) এর আল্লাহর সাহায্যের ওপর এমন অনঢ় আস্থা ছিলো যে, তিনি এর ভিত্তিতেই চূড়ান্ত ফায়সালা করতেন এবং এই ফায়সালার ওপর তিনি এতই অত্মবিশ্বাসী থাকতেন যে, এর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সেটা তিনি শুনতেন না।

সালার ও পদস্থ সেনাদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ সলা পরামর্শ চললো। তাদের কিছু পরামর্শ গ্রহণ করলেন আমর (রা.)। এবং কিছু প্রত্যাখ্যান করলেন। সিদ্ধান্ত হলো খুব দ্রুত এখান থেকে কোচ করা হবে।
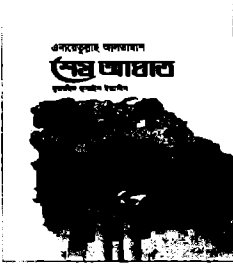
ওদিকে মুকাওকিস আগেই উম্মেদানীন ও ব্যবিলনে অনেকগুলো অতিরিক্ত সেনা ব্যাটালিয়ন পাঠিয়ে দিলেন। মুকাওকিস তো একসময় ভেবে ছিলেন, এই সামান্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্য রোমীয়দের পায়ের নিচেই পিষ্ট হয়ে যাবে।

ওদিকে আসফাকে আজম কীরাসও এখন তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। কীরাস আশ্বাস দিয়েছেন, যে কোন উপায়ে হোক বিনয়ামীনকে সন্তুষ্ট করে কিবতীদেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নিয়ে আসা হবে।

তারপরও মুকাওকিসের চিন্তা ভাবনা অনেক সতর্ক হয়ে গেলো। আগে যেখানে নিজেদের শক্তির প্রতি বেশ আত্মতৃপ্তি ছিলো সেখানে ভয় আর উৎকণ্ঠা জায়গা করে নিলো।

এজন্য কেল্লাবেষ্টিত শহর দু'টিকে আক্ষরিক অর্থেই দুর্ভেদ্য বানানোর জন্য একেবারে নতুন ও টগবগে বিশাল এক সেনাদল সেখানে মোতায়েন করলেন। উম্মেদানীনে অতিরিক্ত সেনা মোতায়েন করলেন ঠিকই; কিন্তু তার অধিক মনোযোগ ছিলো ব্যবিলনের প্রতি।

তিনি অনুভব করেছিলেন, ব্যবিলন হাত থেকে ছুটে গেলে মুসলমানদের থেকে মিসর বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে।

মুকাওকিসের প্লান হলো, মুসলমানরা যেদিক থেকেই হামলা করুক, ব্যবিলন থেকে কয়েক ব্যটালিয়ন সৈন্য বের হয়ে আচমকা মুসলমানদের ওপর পেছন থেকে হামলা করবে।

নওমুসলিম ফারুক থেকে আমর ইবনে আস (রা.) আগেই জানতে পেরেছেন সামনের প্রতিরোধ অবস্থা কেমন ভয়ংকর। এত কিছু জানার পরও এখন আমর ইবনে আসের (রা.) অভিযান সেই ব্যবিলনের দিকেই।

আমর ইবনে আস (রা.) মাঝখানে শুধু একটা দিন অপেক্ষা করলেন। তাও বিলবীস শহরের পুনর্গঠন কাজ ও অন্যান্য নাগরিক সুবিধা বহাল করার কাজে পুরোটা দিন কেটে গেলো।

এরপর দিন ফজর নামাযের পর আমর ইবনে আস (রা.) তার সেনাদল উম্মেদানীন অভিমুখে রওয়ানা করার হুকুম দিলেন। রওয়ানার আগে সেনাদলের উদ্দেশে খুব সংক্ষেপে তিনি বললেন,

'এটা আল্লাহর হুকুম যে, 'যখন তোমাদের শত্রু পালাতে থাকবে তখন তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের ঠিকানাও ধ্বংস করে দাও' ।....

'আমাদের সংখ্যা যতই কম হোক আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই সেনাসাহায্য আসছে। মদীনা থেকে পাঠানো সেনা সাহায্য সম্ভবত কিছুটা বিলম্বে পৌছবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাহায্য সর্ব মুহূর্তের জন্য তোমাদের সঙ্গী করে দিয়েছেন' ।...

'আমি তোমাদেরকে যে কী বিপদ সংকুল অভিযানে নিয়ে যাচ্ছি তা আমি জানি; কিন্তু সেখানে তোমরা আমার নয়, আল্লাহর হুকুমে লড়াই করবে' ।...

'মনে রেখো, ইসলামের সৈনিকরা! আমরা এখানে হেরে গেলে আর কোথাও আমাদের আশ্রয় মিলবে না। এখানকার মাটি, পাথর, গাছ-পালা ধুলিকনাও তোমাদের শত্রু। আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।'

মুকাওকিস ব্যবিলনে আগেই চলে এসেছিলেন। মুসলমানদের গতিবিধির নিয়মিত রিপোর্ট তার কাছে পৌছছিলো।

মুজাহিদরা উম্মেদানীনে যাওয়ার সময় একটা জিনিস মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলো না যে, পথের সামান্য সামান্য ব্যবধানে দু'একজন করে মুসাফির নির্বিকার হয়ে পথ চলছে।

এদেরকে দেখে এমন সন্দেহজনক লোকও মনে হচ্ছিল না যে, এরা মুকাওকিসের গুপ্তচর হতে পারে।

এখন এই অভিযানে মুজাহিদদের সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কম। বিলবীসের লড়াইয়ে কিছু শহীদ হয়েছে। কিছু হয়েছে মারাত্মক আহত। গুরুতর আহতরাও এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

কারো কারো যখম একটু গভীর ছিলো বলে তাদেরকে অভিযানে আসতে নিষেধ করা হয়। যখম শুকালে অভিযানে যোগ দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয় তাদেরকে। কিন্তু তারাও জিদ ধরে এক প্রকার জোরজবস্তি করে সেনাদলে যোগ দেয়।

সৈন্য সংখ্যা আরো কমে যাওয়ার কারণ হলো, বিলবীস শহর রক্ষার কাজে কিছু সৈন্য রেখে আসতে হয়েছে। এছাড়াও সরকারি ও নাগরিক ব্যবস্থাপনা দেখভালের জন্য এবং কিছু প্রশাসনিক কাজে অভিজ্ঞ কিছু মুজাহিদ ওখানে রয়ে যায়। তিন হাজার রোমীয় সৈন্য বন্দি হয়েছিলো বিলবীসের লড়াইয়ে। তাদের প্রহরার জন্যও আরো কিছু সৈন্য রেখে আসতে হলো।

দুদিনের মধ্যে মুসলিম সেনাদল উম্মেদানীন পৌঁছে গেলো। তারপর শহর অবরোধ করলো তারা। মুসলমানদের দুজন গুপ্তচর আগে থেকেই সে শহরে ছিলো। তারা অবরোধের আগেই শহর থেকে বেরিয়ে এলো।

কারণ, অবরোধের সময় শহরের ফটক বন্ধ থাকাতে তারা বের হতে পারতো না।

তারা সিপাহসালারকে জানালো, শহরে রসদ ও পানির স্বল্পতা রয়েছে। আর এগুলো বাইরে থেকে ভেতরে আসে।

আমর ইবনে আস (রা.)- এর জন্য এটা দারুন মূল্যবান তথ্য। তিনি রসদ আসার পথ বন্ধ করে দিলেন এবং পানির প্রবাহও মন্থর করে দিলেন।

উম্মেদানীন অবরোধ করার পর যে কোন সময় ব্যবিলন থেকে রোমীয় সৈন্য বের হয়ে অবরোধকারীদের ওপর হামলা করতে পারে এটা তো আমর ইবনে আস (রা.)- আগেই ভেবে রেখেছিলেন। অথচ তার স্বল্পসংখ্যক সৈন্য সফল কোন অবরোধের জন্যও যথেষ্ট ছিলো না।

তারপরও এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দিয়েই তাকে এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হলো যেনো হামলা করলে এরা মোকাবেলা করতে পারে।

এভাবে আমর ইবনে আস (রা.) কে দুই দিকেই দৃষ্টি রাখতে হচ্ছিলো।

নির্ভরযোগ্য সব ঐতিহাসিকই লিখেছেন, উম্মেদানীন অবরোধের সময় সারাটা সময় জুড়ে এ আশংকা ছিলো যে, মুকাওকিস ব্যবিলন থেকে কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করবেন। কিন্তু তিনি এটা করেননি।

অমুসলিম ঐতিহাসিক আলফ্রেড বাটলার লিখেছেন, এভাবে মুকাওকিসের আক্রমণাত্মক না হওয়ার কারণ ছিলো এই যে, তার সামনে সবসময় জ্বলজ্বল করছিলো আতরাবুনের পরিণতি।

বিলবীসের অবরোধের সময় আতরাবুনের মতো এমন বিখ্যাত জেনারেল হামলা করেও মারা পড়েছিলো। তাছাড়া নিজেদের সৈন্যদের মানসিক অবস্থার কথা অজানা ছিলো না মুকাওকিসের। রোমীয় সেনারা তো এটা ভেবে হতভম্ব হয়ে যেতো যে, এমন হাতে গোনা সৈন্য নিয়ে কি করে মুসলমানরা উম্মেদানীনের মতো এমন শক্তিশালী শহর অবরোধ করতে এলো?

উম্মেদানীনেও রোমীয়রা বিলবীসের মতো আক্রমণাত্মক-কৌশল অবলম্বন করে।

দু তিন দিন পর পর শহরের দু তিনটি দরজা খুলে যায় এবং কয়েক ইউনিট রোমীয় সেনা বের হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে। তবে জমে লড়াই করে কিছুক্ষণ পরই আবার শহরের ভেতর চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।
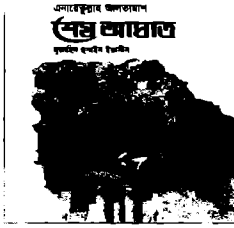
আমর ইবনে আস (রা.)ও রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তার সেনাদের বলে দেন, রোমীয়রা ভেতর থেকে এলে একেবারে মুখোমুখি লড়াইয়ে যাবে না। তাদের ওপর অনবরত তীর ছুড়তে থাকবে।

তার উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিলো। সেটা হলো, এসব খুচরা হামলায় যেন কোন মুসলমান সৈন্য হতাহত না হয়।

রোমীয়রা শহরের ভেতর থেকে বের হলেই মুজাহিদরা নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে তাদের ওপর মুষলধারে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। এতে দেখা যায় প্রতিবারই রোমীয় সওয়াররা তাদের দুই তিন জন আহত নিহত সৈন্য বাইরে রেখে ভেতরে ফিরে গেছে।

এক দিন এক আরবী ঘোড়সওয়ার এসে আমর ইবনে আস (রা.)-কে সংবাদ দিলো, সেনাসাহায্যের একটা অংশ দুই এক দিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। পুরো সেনা শিবিরে এ সংবাদ ছড়িয়ে দিলেন আমর (রা.)।

এতে সবার মধ্যে নতুন এক প্রাণের সঞ্চার হলো। সতেজতা ও উদ্দামতার দারুন এক আবাহ সবাইকে সিক্ত করলো।

দুদিন পর রোমীয় সেনারা যখন শহরের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে সেনা সাহায্যের প্রথম অংশটা ধীর কদমে এগিয়ে আসতে দেখলো, তাদের ওপর তখন হতাশার এক কালো ছায়া নেমে এলো। এরপর থেকে তারা শহরের বাইরে বের হয়ে হামলার পরিমাণ কমিয়ে দিল।

রোমীয়রা এসব হামলা করতে এসে আগেই তো মুসলিম তীরন্দাযদের দ্বারা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি অনেক ঘোড়াও মুজাহিদদের হাতে ছেড়ে আসতে হয়েছে।

এভাবে অবরোধের এক মাস কেটে গেলো। শহরের ভেতর রসদ ও পানির অবস্থা কি তাও জানা সম্ভব ছিলো না।

একদিন সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা,) তার সালারদের বললেন, পুরো বাহিনী নিয়ে একযোগে শহরের ওপর হামলা চালাতে হবে।

চারদিক সতর্ক চোখে না দেখে এধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় না। তীরন্দাযদেরকে এতটুকু দূরত্বে অবস্থান নিতে বলা হলো যেখান থেকে প্রাচীরের ওপরে থাকা রোমীয় সেনাদেরকে তীর দ্বারা ঘায়েল করা যায়। আর তারাও চোখের আড়ালে থাকতে পারে।

এর আগে সিপাহসালার ব্যবিলনের পথে গুপ্তচর বাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিক থেকে কোন রোমীয় দল আসতে দেখলে তারা সঙ্গে সঙ্গেই মুজাহিদ শিবিরে সংবাদ দিবে। এছাড়াও কয়েকটি ছোট ছোট গেরিলা দল পাঠিয়ে দিলেন আমর ইবনে আস (রা.)।

ব্যবিলন থেকে ফৌজ আসার সময় গুপ্ত হামলার মুখে পড়বে রোমীয়রা। এই গেরিলা দলে হাদীদ, মাসউদ, ফাহাদ এবং নওমুসলিম ফারুকও রইলো। এরা সবাই গেরিলা ও নৈশ হামলার ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলো।

যা হোক, আমর ইবনে আস (রা.) কেল্লার উপর হামলার হুকুম দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে শহরের দুতিনটি ফটক খুলে গেলো এবং রোমীয় ফৌজ পঙ্গপালের মতো বেরিয়ে আক্রমণে উদ্যত হলো।

পুরো ফৌজ তো একবারে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রতিটি ফটক দিয়ে দুতিনটি করে ঘোড় সওয়ার তীব্র বেগে বেরিয়ে আসছিলো। আমর ইবনে আস (রা.) এদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন।

এ হামলায় আমর ইবনে আস (রা.) সর্বাগ্রে রইলেন।
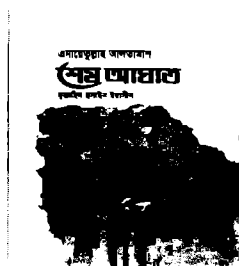
বের হয়ে পড়া রোমীয় সওয়ারদের তো মুজাহিদদের প্রথম হামলাতেই পিছু হটে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। এ অবস্থা দেখে ভেতর থেকে যে সব রোমীয় বাইরে আসতে উদ্যত হলো তারা ভেতরের দিকে ফিরে যেতে লাগলো।

মুজাহিদরা তাদেরকে দরজা বন্ধ করার সুযোগ দিলো না। তাদের পেছনে পেছনে শহরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ওরা ততক্ষণে নিশ্চিত মৃত্যু-মুখে চলে গিয়েছিলো। কারণ, সংখ্যায় তারা রোমীয়দের তুলনায় বিশগুণ কম। তাছাড়া মুজাহিদরা সবাই এক সঙ্গেও শহরে ঢুকতে পারছিলো না।

তীরন্দায মুজাহিদরা নিজেদের পজিশন সামলে নিলো এবং প্রাচীরের ওপরে থাকা রোমীয় ফৌজের ওপর তীরের ঝড়ো বর্ষণ শুরু করে দিলো। এ অবস্থায় প্রাচীরের সৈনিকদের নিচের দিকে তাকানোর বা মনোযোগ দেয়ার আর সুযোগ থাকলো না।

এ সুযোগে আমর ইবনে আস (রা.) স্বয়ং শহরের প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং কুড়াল নিয়ে দরজার গায়ে প্রথম আঘাতটি তিনিই করলেন। তারপর এক মুজাহিদ দৌড়ে এসে তার হাত থেকে কুড়ালটি নিয়ে নিলো।

ফটক ছিলো পুর কাঠের লোহার মতো শক্ত-মজবুত। কিন্তু মুসলিম সেনারা দেখতে দেখতে ফটক ভেঙ্গে ফেললো।

রোমীয়দের উপর আগ থেকেই যে আতংক বিস্তার করছিলো সেটা এখন মুসলমানদের পক্ষে কাজে দিলো। তারপর আবার এখন মুসলিম সেনারা যে দুঃসাহসিক কায়দায় হামলে পড়েছে এতে তাদের ওপর পূর্বের আতংক আরো দ্বিগুন হয়ে আছড়ে পড়লো। শহরের মধ্যে এমন হুলুস্থুল হৈ হুল্লোড় পড়ে গেলো যার বর্ণনা অসম্ভব।

ওদের মধ্যে আগ থেকেই একটা গুঞ্জন ছিলো, মুসলমানদের এমন অদৃশ্য শক্তি আছে যে, ওরা সংখ্যায় যত নগণ্যই হোক কয়েকগুণ বেশি শক্তিশালী দুশমনকেও নিমিষেই মাটিতে মিষিয়ে দেয়। রোমীয়রা এখন সেই দুঃসাহসিক বীরত্ব গাঁথা লড়াই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছে।

রোমীয় সেনারা সাহস ও মনোবল না হারিয়ে যদি ফটকগুলোর সামনে অনড় দাঁড়িয়ে থাকতো, তাহলে মুসলিম সেনাদেরকে সেখানে লাশের মিছিলে পরিণত করতে পারতো। কিন্তু ওরা হাত পা ছেড়ে একেবারে হতাশ হয়ে এক প্রকার বসেই পড়লো।

আমর ইবনে আস (রা.) হুকুম দিলেন, কোন সাধারণ নাগরিক নারী পুরুষের ওপর হাত উঠাবে না। তবে একজন সেনাকেও যেন জীবিত ছাড়া না হয়।

আসলে সিপাহসালার বন্দি হিসাবে কাউকে রাখতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, এতে বেশ কিছু মুজাহিদকে এদের পেছনে আটকে থাকতে হয়।

বেশ কিছু সময় ধরে অস্ত্রধারী রোমীয় সেনাদের একের পর এক খতম করা হলো। লড়াই শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকা রোমীয় সেনাদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করা হলো। আমার ইবনে আস (রা.) এর তাদের ওপর অনুগ্রহ হলো। সিপাহসালার হুকুম দিলেন ওদেরকে হত্যা না করে শুধু গ্রেপতার করতে।

কিছু মুসলিম সেনা শহরের বাইরে নিয়োজিত ছিলো। যারা ব্যবিলন থেকে রোমীয় সৈন্য দল হামলা করতে এলে তাদেরকে প্রতিরোধ করতো। আমর ইবনে আস (রা.) শহরের প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখলেন, না, তারা অক্ষতই আছে। পেছন থেকে কোন রোমীয় দল হামলা করতে আসেনি ওখানে।
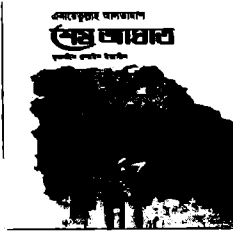
আলফ্রেড বাটলার লিখেছেন,

'এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মুসলমানরা যে হামলে পড়লো শহরের ওপর; এটাকে আত্মহনন প্রচেষ্টা বললেও ভুল হবে না। মুসলিম সেনাদের জন্য এটা এতই ভয়াবহ ছিলো যে, কিছু সৈন্য তো সামনে অগ্রসর হতে গিয়ে ঘাবড়ে গেলো'।

'সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)-কে অতি কঠোর ভূমিকায় নামতে হলো। পুরো সেনাদলে ঘুরে ফিরে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'সবাই সামনে এগোও।'

একজন সৈন্য বলেই ফেললো, আমরা তো লোহার তৈরী মানুষ নই।

আমর ইবনে আস (রা.) তাকে কঠিন ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল লিখেছেন, ইতিহাসে বাটলারের মন্তেব্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যকোন যুদ্ধে এমন হতে পারে। উম্মেদানীনের লড়াইয়ে আদৌ এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি।

এই সেনাদলে কিছু সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। আমর ইবনে আস (রা.) জানতেন তিনি তার সেনাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ছেড়ে দিচ্ছেন। এজন্য তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে এ কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করেন,

'আপনারা যেহেতু আমার সঙ্গে আছেন, তাই আল্লাহ তাআলা আপনাদের অংশগ্রহণের কল্যাণে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন।'

সাহাবায়ে কেরাম একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হামলার জন্য দৃপ্ত পায়ে সবার আগে এগিয়ে গেলেন দারুন ক্ষিপ্র কদমে।

এটা দেখে পুরো সেনাদলে নতুন উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়লো। এই উদ্দীপ্ত ও জোশদীপ্ত অদম্য লড়াকু হয়ে উঠার কারণে এমন অজেয় এক একটি করে দুর্গ মুসলিম সেনারা জয় করতে থাকে।

মুকাওকিস তখন ব্যবিলনে। ইতিহাসের অমোঘ কলম আর বিস্ময় চেপে রাখতে পারেনি যে, উম্মেদানীনে মুকাওকিসের সৈন্যরা পাইকারী দরে নিহত হচ্ছে, আর তিনি ব্যবিলনে এর চেয়ে কয়েকগুন সৈন্য নিয়ে বসে আছেন।

অথচ তার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ছিলো যে, উম্মেদানীনে হামলা হলেই ব্যবিলন থেকে কয়েক দল সেনা গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলে পড়বে।

মুকাওকিসের কাছে যখন উম্মেদানীনের খবর পৌঁছলো তখন তার ওপর স্তব্ধতা নেমে এলো। মুখ হা হয়ে গেলো। চোখ দুটো তার বেরিয়ে আসতে চাইলো কোটর ছেড়ে।

উম্মেদানীন মুসলমানরা ছিনিয়ে নিবে এটা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। আসলে তার চিন্তা ভাবনায় অনেক আগেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

তিনি যদি মনোবল ধরে রাখতেন এবং মাথা ঠান্ডা রেখে চিন্তা করতে পারতেন তাহলে তার কাছে এ পরিমাণ সৈন্য ছিলো যে, তিনি তখনই উম্মেদানীন অবরোধ করে নিতে পারতেন।

কেল্লা জয় হোক না হোক এতটুকু লাভ তো অবশ্যই হতো যে, বেশ কিছু মুসলিম সেনাকে কেল্লা বন্দি করে রাখতে পারতেন।

উম্মেদানীন থেকে কিছু সৈন্য ও কিছু শহরবাসী পালিয়ে যেতে পেরেছিলো। ব্যবিলন পৌঁছে তারা সেখানকার রোমীয় সেনাদেরকে মুসলিম সেনাদের এমন দুঃসাহসিক ও অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের কথা এমনভাবে জানালো যে, সবার মধ্যে আরো আতংক ছড়িয়ে পড়লো।

রোমীয়রা আরো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো তো এটা শুনে যে, মুসলমানরা একজন রোমীয় সৈন্যকে এবং অফিসারকেও জীবিত রাখেনি। পালিয়ে আসা কোন কোন সৈন্য তো একথাও বললো,

মুসলমানরা অদৃশ্য জিন ভূতের মতো অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় কেল্লাগুলোয় প্রবেশ করে...।
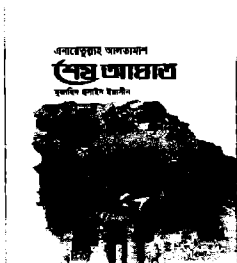
মুকাওকিসও উম্মেদানীন হারানোর আঘাত সয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিলেন। এর মধ্যে তার গুপ্তচর তাকে জানালো মুসলমানরা নীল দরিয়া পার হয়ে পিরামিড এলাকা অতিক্রম করে আরো এগিয়ে গেছে।...

এই পুরো এলাকা আদিগন্ত বিস্তৃত মরুর বালিয়াড়িতে ঢাকা।

মুসলমানরা নীল নদ পার হলো কি করে এই প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর পেলেন না সহসা। এটা তাকে হয়রান করে তুললো।

তারপর মুকাওকিস এই চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন, এরা যাচ্ছে কোথায়? মুকাওকিসের সঙ্গে তখন আতরাবুনের মতো আরেক বিখ্যাত জেনারেল থিয়োডর ছিলো।

'মুসলমানরা কি ইস্কান্দারিয়ায় হামলা করতে যাচ্ছে?'

এই প্রশ্ন নিয়ে দুজনে আলোচনার পর এ সিদ্ধান্তে একমত হলেন যে, মুসলিম সিপাহসালার এধরনের মারাত্মক বোকামি করবে না।

তখনই মুকাওকিস ওকীরাস গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। মুসলমানদের এখন অভিমুখ কোন দিকে এটা জেনে আসার জন্য।

এক দিনের মধ্যে জানা গেলো, মুসলমানদের গন্তব্য এখন ফিউম- এর দিকে।

ফিউম মরু কেন্দ্রিক এলাকা হলেও সেখানে প্রচুর সব্জি ও তরিতরকারি এবং গৃহপালিত পশু ছিলো। মুসলিম সেনাদের রসদ ও গোশতেরও প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন। সে হিসাবে ফিউম এর দিকে যাওয়াটাই ছিলো সবচেয়ে যুক্তি সম্মত।

উম্মেদানীন শহর সংলগ্ন যে একটি ছোট নৌবন্দর আছে, লড়াই চলাকালে সেখানে মাঝারি ধরনের অনেকগুলো পালতোলা জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিলো। লড়াই শেষ হওয়ার আগেই আমর ইবনে আস (রা.) ছোট একটি সেনাদল নৌবন্দরে পাঠিয়ে দিলেন। যাতে সেখান থেকে একটি জাহাজ তো দূরের কথা একটি নৌকাও পালিয়ে যেতে না পারে।

এভাবে পুরো নৌ ব্যাটালিয়ন মুসলমানদের দখলে চলে আসলো।

শহরের সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক করতে ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজে মাত্র দু তিনদিন সময় নিলেন আমর ইবনে আস (রা.)। এর মধ্যে সেনারা বিশ্রামও নিয়ে নিলো।

তারপর নির্জন রাতে একেবারে নিঃশব্দে পরবর্তী অভিযানের জন্য প্রস্তুতকৃত সেনাদল একে একে জাহাজগুলোয় চড়ে বসলো। ভোরের সূর্য উঠার আগেই নীল নদ পার হয়ে গেলো।

মুসলিম সেনাদল এরপর অগ্রসর হতে লাগলো ফিউম অভিমুখে। মুকাওকিস এ খবর পেয়ে শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য কয়েক ব্যাটালিয়ন সৈন্য সে এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন।

এই মরু এলাকা মোটেও সমতল না। কোথাও কোথাও উঁচু নিচু ও গভীর অগভীর অনেক উপত্যকাও রয়েছে। এসব জায়গায় বড় বড় সেনাবাহিনী অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে। মুকাওকিস তার সেনাদের শক্ত করে বলে দিলেন,

'এসব মরু এলাকায় মুসলমানাদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করবে না। দূর থেকে যতটুকু পার করবে। মনে রেখো, আরবের মুসলমানদের জন্ম মরুর কঠিন পাথরি জমিতে।.......

যেখানে মরুভূমি আছে সেখানেই ওরা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কয়েকগুন শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাই মরুর লড়াইয়ে আরবদের পরাজিত করা অসম্ভব ব্যাপার।'.....
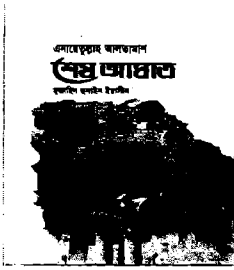
ফিউম এলাকায় যাওয়ার আগেই রসদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন আমর ইবনে আস (রা.)। তাই সেখানে পৌছেই বেদুঈন দলটিকে রসদ সংগ্রহের দায়িত্ব সপে দিলেন। বেদুঈনরা একাজে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলো।

বেদুঈন দলটি ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মরু বসতিগুলোর দিকে ছড়িয়ে পড়লো। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বসতিগুলো বিস্তৃত। এসব ছোট ছোট গ্রামে আনাজ তরকারিসহ ভেড়া, বকরি, গরু, দুম্বা উট এসব গৃহপালিত পশুর অভাব নেই।

আগে তো বেদুঈনরা গেরিলা পদ্ধতিতে নৈশ হামলা চালিয়ে রসদ সংগ্রহ করতো। তখন বেশ কিছু সাধারণ মানুষ আহত হতো। কখনো কখনো দু একজন নিহত হতো। কিন্তু এখন এরা চেষ্টা করে তাদের হাতে যেন কেউ নিহত তো দূরের কথা আহতও না হয়।

তারা বিভিন্ন বসতিতে গিয়ে ঘোষণা করতো, মুসলিম সেনাদের জন্য আনাজ তরকারি ও গোশত দরকার। তোমরা নিজেরা যদি এগুলো ব্যবস্থা করে না দাও তাহলে প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সর্বশেষ দানাটিও উঠিয়ে নেয়া হবে। একটি পশুও ছেড়ে যাওয়া হবে না।

রসদ সংগ্রহের সময় এই বেদুঈনরা সেসব গ্রাম্য লোক ও মরু বেদুঈনদেরকে নিশ্চয়তা দিতো যে, মুসলিম সেনাদেরই অবশেষে বিজয় হবে এবং মিসরের শাসন তাদের হাতে এসে যাবে। তোমাদের ভাগ্যই পাল্টে যাবে। তখন প্রত্যেককে তার প্রাপ্য হক বুঝিয়ে দেয়া হবে।......

এই মুসলমানরা রোমীয় বাদশাহদের মতো নয়। তারা কারো হক ছিনিয়ে নেয় না। মুসলমানরা প্রতিটি শস্যদানা ও প্রতিটি পশুর দাম পরিশোধ করে দেবে।

এভাবে বেদুঈনরা বিনা রক্তপাতে স্তুপের পর স্তুপ রসদ ও পালে পালে ভেরা বকরি মুসলিম শিবিরে পৌছে দিতে লাগলো।

যেসব এলাকা থেকে তারা এসব সংগ্রহ করতো সেসব এলাকায় কোথাও কোথাও তাদের মতোই মিসরীয় বেদুঈনরা থাকতো। তাদের দেখা-দেখি এরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তো।

এক এলাকার এক বেদুঈন দল মুসলিম সেনাদের রসদ সংগ্রাহক বেদুঈন দলকে একদিন গুরুত্বপূর্ণ এক সংবাদ দিলো।

'তোমরা যেহেতু আমাদের মতোই বেদুঈন তাই তোমাদেরকে সতর্ক করা জরুরী। এবং আমাদের কর্তব্য বলে মনে করছি।'.......

ফিউম এলাকার বেদুঈন গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ এক লোক বললো, '

'তোমরা যে এ বসতি পর্যন্ত এসে গেছো এর আগে আর যাবে না। সামনের বসতিগুলো রোমীয় ফৌজে ভরে গেছে। সংখ্যায় ওরা অনেক। তোমাদের এই কয়েকজনের দলকে তো ওরা ফু মেরেই উড়িয়ে দেবে।'

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)- কে এ সংবাদটি জানানো হলো। এ অঞ্চলের রোমীয় সেনাদের ব্যাপারে তো তিনি কিছুই জানতেন না। তিনি আশাও করেননি যে, রোমীয় সেনারা এখানেও চলে আসবে। এজন্য কোন গুপ্তচরও কোথাও নিয়োজিত করেননি।

তিনি এ সংবাদ শুনেই যেখানেই যে সেনারা নিয়োজিত ছিলো সবাইকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

এই রোমীয় সেনাদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাচ্ছিলেন না তিনি । কারণ, এটা উদ্দেশ্যহীন লড়াই। এখানে শক্তি ক্ষয় না করে এ শক্তি অন্য কোন কেল্লা- বেষ্টিত শহরে ব্যয় করলে অনেক বেশি লাভজনক হবে।

মুসলিম সেনাদল তারপর অস্থায়ী তাবু ফেললো এক জায়গায়। এই তাবুর পাশ দিয়ে তিনজন বেদুঈন যাচ্ছিলো। মুসলিম সেনাদলে তাদের মতোই কিছু বেদুঈন দেখে কৌতূহলী হয়ে সেখানে ওরা দাঁড়িয়ে পড়লো।

সেনাদলের বেদুঈনরা আগন্তুক বেদুঈনদের মেহমান হিসাবে নিজেদের তাবুতে নিয়ে গেলো। তাদেরকে খাতির যত্ন করলো।

এরা জিজ্ঞেস করলো, বেদুঈন হয়েও তারা এমন মুসলিম সেনাদলে কেন যোগ দিলো। উত্তরে তারা মুসলমানদের ব্যাপারে সবিস্তারে সবকিছু জানালো।

'একটি কথা মন দিয়ে শোন', অতিথি এক বেদুঈন বললো,

'সেনাদের একটি দল তোমাদের এদিকে আসছে। আমরা নিজেরা দেখেছি। ওরা সোজা পথে নয় বরং মরুভূমির গভীর উপত্যকায় লুকিয়ে ছাপিয়ে আসছে। মনে হয় তোমাদের সৈন্যদের ওপর আচমকা হামলা চালাবে'।

সেনাদলের বেদুঈনরা এদের একজনকে এক সালারের কাছে নিয়ে গেলো। সালারের কাছে সব বলে তারা নেতৃত্বে থাকা এক রোমীয় জেনারেলের নামও বললো। এই এলাকায় সেই জেনারেলের বেশ খ্যাতি রয়েছে। নাম হান্না। লোকেরা তাকে বেশ ভয় পায়।

আমর ইবনে আস (রা.) ওদের কাছ থেকে বিস্তারিত শোনার পর তখনই সেনাদলকে তাবু গুটিয়ে অন্য পথ ধরার নির্দেশ দিলেন।

তবে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য আলাদা করে রাখলেন। যে দিক দিয়ে রোমীয় সেনারা আসার কথা, সেদিকে কোন গোপন জায়গায় এরা ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

এ দলটি তিন-চার ভাগে ভাগ হয়ে পাহাড় টিলার পেছনে এবং গভীর উপত্যকার ভেতর লুকিয়ে বসে রইলো। রোমী ফৌজের এ দলটি মুজাহিদদের চেয়ে তিনগুন বেশি ছিলো।

সূর্যাস্তের এখনো কিছু সময় বাকি। এ সময় মুসলিম সেনাদের আসল ফাঁদে চলে এলো রোমীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর নেমে এলো আচমকা কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব।

রোমীয় জেনারেল হান্না তো কিছু বুঝেই উঠতে পারেনি। এর আগেই মারা পড়লো। তার দলের একজন রোমীয় সেনাকেও জীবিত রাখলো না মুসলিম সেনারা।

যারা মুসলিম সেনাদের অসচেতন অবস্থায় এসে গেরিলা হামলায় ধ্বংস করে দিতে বের হয়েছিলো অবশেষে সচেতন অবস্থায় মারা গেলো তারাই- ফিউম এর মরু ভূমিকে রক্তস্নাত করে।
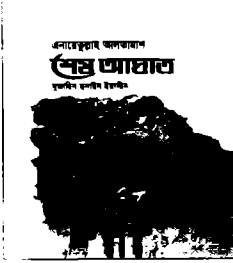
কাছের কোন বসতির এজেন্ট ব্যবিলনে গিয়ে মুকাওকিসকে জানালো, তার পাঠানো রোমীয় গেরিলা বাহিনী খতম হয়ে গেছে। জেনারেল হান্নাও বেঁচে নেই। মুকাওকিসের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো।

হেরাকল তো হান্নার মৃত্যু মোটেও মেনে নিতে পারবেন না। কারণ, হান্না অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আতরাবুনের মতোই দক্ষ এক জেনারেল ছিলো। বযনতিয়ায় যখন এ সংবাদ পৌছবে, হেরাকল তখন প্রথমেই জানতে চাইবেন এর জবাবে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

মুকাওকিস এসব ভেবে তখনই জবাবি হামলার জন্য শক্তিশালী একদল সেনা পাঠিয়ে দিলেন সেই ঘটনাস্থলে যেখানে হান্না ও তার বাহিনী মারা পড়েছে। তারা সেখানে পৌছে দেখলো, মুসলিম সৈন্য দল অনেক দূরে চলে গেছে।

এখন তারা নাগালের বাইরে চলে গেছে। তাই রোমীয়রা সেখান থেকে ফিরে এলো।

আসলে রোমীয়রা মরু এলাকায় মুসলিম সেনা দলের সঙ্গে লড়তে ভয় পেতো। তাদের সামনে শামের নির্মম অভিজ্ঞতা ছিলো। এই জেনারেল সে ভয়েই তার দলকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু মুকাওকিসকে গিয়ে বলে মুসলমানরা তাদেরকে দূর থেকে দেখেই পালিয়ে গেছে এবং নীল নদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

এদিকে আমর ইবনে আস(রা.)ও এদের সঙ্গে লড়াই করে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। কারণ, তার কাছে খবর পৌঁছে, সেনাসাহায্যের বাকি অংশ 'হাইলো বুলিস' নামক এলাকায় এসে তাবু ফেলেছে।

তিনি আশংকা করছিলেন এ দলটি না আবার তার সেনা দলের পিছু নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে এবং এই সুযোগে মুকাওকিস ব্যবিলন থেকে সেনা পাঠিয়ে তাদের ওপর হামলা করে বসে।

আর মুকাওকিস তো চাইবেনই, সেনাসাহায্যের দলটি যাতে মূল দলে যোগ দিতে না পারে।

যেসব পাল তোলা নৌকা ও ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে মুসলিম সেনারা নীলনদ পার হয়েছিলো। সেগুলোতেই আবার চড়ে বসলো পুরো সেনা বাহিনী। তারপর নিরাপদে 'হাইলো বুলিস'-এ সেনা সাহায্যের শিবিরে গিয়ে পৌঁছলো।

আগত এই সাহায্যকারী সেনাদলের সিপাহসালার ছিলেন যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)।

রণাঙ্গনীয় বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, ব্যবিলনে এত বিশাল সংখ্যক সৈন্য রেখেও এবং মোক্ষম সুযোগ পেয়েও সেনাদের ব্যবহার করেননি মুকাওকিস।

আলফ্রেড বাটলার লিখেছেন, মুসলমানরা দুইবার নীলনদ পারাপার করে। একবার উম্মেদানীন থেকে ফিউম এর দিকে। আরেকবার সেখান থেকে ফিরে আসে নীলনদের পূর্ব তীরের দিকে।

নদীতে থাকতেই মুকাওকিস মুসলিম সেনাদের ওপর তীর-বর্শা ছুড়ে হামলা করতে পারতেন। মুসলিম সেনাদের জন্য তখন জবাবী হামলার কোন পথই খোলা থাকতো না।

এমনকি মুসলমানরা যখন উম্মেদানীন ছেড়ে ফিউম চলে গেলো তখন তো উম্মেদানীনে নাম মাত্র সেনা ছিলো। তখন উম্মেদানীন আবরোধ করে চূড়ান্ত হামলা চালিয়ে শহর ছিনিয়ে নিতে পারতেন মুকাওকিস।

আসলে রোমীয়রা ব্যবিলনের চার দেয়ালে জোটবদ্ধ হয়ে থাকাটাই অনেক বেশি নিরাপদ মনে করেছে তখন। কিন্তু এতে যে মুসলিম সেনাদের মনোবল আরো বেড়ে গেছে সেদিকে তাদের কোন খেয়াল ছিলো না।

ঐদিকে হেরাকলের কাছে যখন তার আরেক প্রিয় জেনারেল হান্নার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি এতই বেদনাহত হয়ে উঠলেন যে, তার দু চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো।

তার হুকুম মতো জেনারেল হান্নার লাশও বযনতিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হলো। হান্নার লাশ দেখে তো হেরাকল ক্রোধে ফেটে পড়লেন। ক্রোধ-উম্মত্ত কণ্ঠে বললেন,

'আমি আজ শপথ করছি, মিসরকে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমি আমার সব যুদ্ধ শক্তি ব্যবহার করবো এবং মুসলমানদেরকে পায়ের তলায় পিষে অস্তিত্বহীন করে ছাড়বো'।
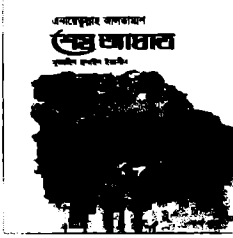
'হাইলো বুলিস' প্রাচীন পুরাকীর্তি ও এর ধ্বংসাবশেষ ভরা শহর। এখানকার কোন একটি স্থাপনা ও দালান কোঠাও অক্ষত নয়। আমর ইবনে আস (রা.) এখানে তাঁবু ফেললেন।

সাহায্যকারী সেনাদলও আগেই এখানে এসে সেনা শিবির স্থাপন করেছে।

'হাইলো বুলিস' গ্রিক শব্দ। কোন গ্রীক পণ্ডিত হাজার বছর আগে এই শহরের এই নাম রাখেন। প্রাচীনকালে এটা মিসরের অন্যতম প্রধান শহর হিসাবে গণ্য হতো।

এখন এখানে মরুর শিয়াল, সাপ, বিচ্ছু, উল্লু, বাঁদুর অন্যান্য ভয়ংকর পোকা মাকড়ের নিরাপদ বিচরণ ক্ষেত্র। এখানে কোন মানুষের বসতি তো দূরের কথা কোন জনমানব এর ধারে কাছেও যেতো না।

শত বছর পর সেখানে গিয়ে ডেরা ফেললো আরবের এই মুসলিম সেনাদল ও মিসরীয় বেদুঈনদের একটি দল।
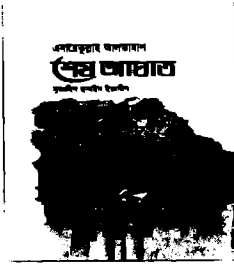
প্রথম রাতের কথা। পুরো সেনা শিবির গভীর ঘুমে অচেতন। কয়েকজন সৈন্য টহল প্রহরীর কাজ করছে। এর মধ্যে এক টহল প্রহরী একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষে সামান্য আলো দেখতে পেলো। এগুলোর ভেতর তো নিজেদের কারো থাকার কথা নয়। তাহলে কে ওখানে আলো জালালো?

টহল প্রহরীর মনে একবার প্রশ্ন জাগলো এ কোন গুপ্তচর নয় তো?

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের গুপ্তচররা বিভিন্ন ছদ্মবেশে শত্রুদলের ক্যাম্পের কাছে চলে যায়। টহল প্রহরী এটা সন্দেহ করে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখাটা জরুরী মনে করলো।

মরুর নির্মল চাঁদের আলোয় এই প্রাচীন ধ্বংসস্তুপকে একটু বেশিই ভৌতিক মনে হলো। টহল প্রহরী চার দিকে দেখে নিয়ে একটা পথ পেয়ে গেলো ভেতরে যাওয়ার।

ভগ্ন এক ছাদের নিচ দিয়ে সে আস্তে আস্তে ভেতরে গেলো। তার কাছে মনে হলো, ছাদের ওপর কেউ বসে ফিস ফিস করে কথা বলছে। কোন অশরীরী হতে পারে।

ভয়ের একটা শিহরণ বয়ে গেলো তার ভেতরে।

কিন্তু এক মুজাহিদের বিশ্ব জয় করার আসল ভিত্তিই তো সব ভয়কে জয় করা।

টহল প্রহরী তাই ভয়কে পাত্তা না দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। তাকে পথ দেখাচ্ছিলো ভেতর থেকে আসা আবছা আলো।

হঠাৎ কোন একটা কিছুর সঙ্গে সে হোচট খেলো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ংকর শো শো শব্দে যেন ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো। সে দেয়ালের গায়ে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালো।

এখন আর সে তার ভয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলো না। সে নিশ্চিত হয়ে গেলো এটা কোন ঝরো হাওয়া-টাওয়া কিছু নয়। অশরীরী কোন কিছুর কাণ্ড এটা। তারপর তার চোখ গেলো বাইরের দিকে।

চাঁদের আলোয় দেখলো। বিশাল বড় এক বাদুড়। ছাদ ও দেয়ালে তার বাসা। এটা উড়ে যাওয়ার সময় এমনভাবে ডানা ঝাপটা দিয়েছে যে, টহল প্রহরী মনে করেছে অশরিরীদের অশুভ স্পর্শে ঝড় তুফান মনে হয় শুরু হয়ে গেছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে আবার সে সামনে এগোলো। আলোর উৎস বের করতেই হবে এমন একটা জিদ চেপে বসলো তার মধ্যে।

এক জায়গায় দেখা গেলো ছাদের মাঝখানের অংশ নেই। সেখান দিয়ে চাঁদের আলো ভেতরে আসছে। কিন্তু আরো সামনে থেকে যে আলো আসছে সেটা চাঁদের আলোর মতো এতো উজ্জ্বল নয়।
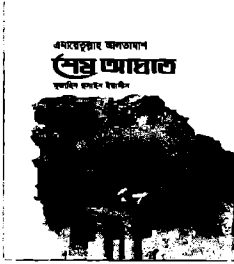
টহল প্রহরী একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলো কপাটবিহীন একটি দরজা। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলো, এটা একটা বড়সড় কামরা। কামরার দেয়ালগুলোর কারুকার্জ বলছে এটা কোন একসময় শাহী মহলের এক কামরা ছিলো। একাধিক বাদশাহর জীবন গত হয়েছে এ কামরায়।

দুর্বল হলদেটে আলোয় কামরার ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। কামরার এক কোনে একজন মানুষ হাতজোড় করে বিড় বিড় করছে। তার সামনে কুপির মতো একটা কিছুতে আলো জ্বলছে।

তার পাশে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র দেখা যাচ্ছে। লোকটির কাপড় মলিন। মাথা খোলা। সাদা চুলগুলো কাঁধে নেমে এসেছে। মাথার চূড়ায় কোন চুল নেই। কোন মসৃণ পাথরের মতো বৃত্তকার কোন বস্তু।

টহল প্রহরী সন্তর্পণে তার কাছে চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

'আমি জানতাম তোমরা আসবে। বৃদ্ধ বার্ধক্যজনিত কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি আরব থেকে আগত অতিথিদের অপেক্ষায় ছিলাম। ...তোমরা এসে গেছো।... তোমাদের আসা নিশ্চিত ছিলো।'

'আগে বলুন জনাব, আপনি কি জীবিত কেউ; না যারা দুনিয়া থেকে উঠে গেছে তাদের কারো আত্মা। আমি প্রেতাত্মার কথা বলছি না। আত্মা পবিত্রই হয়ে থাকে। আপনার চেহারা বলছে আপনার এই সত্তা সকল মন্দ থেকে পবিত্র।' টহল প্রহরী বললো।

'এখনো আমি জীবিত।' বৃদ্ধ সামান্য হেসে বললেন।

'দীর্ঘ দিন পর আমার মুখ কারো সঙ্গে কথা বলছে। আমিও কারো সঙ্গে কথা বলি না। আমার সঙ্গে কেউ কথা বলে না।'

'এখানে কি আরো কেউ আসে?'

'হাঁ, এখান থেকে কিছু দূরেই গ্রাম রয়েছে। সেখান থেকে মাঝে মধ্যে দুজন লোক এসে কিছু খাবার দাবার দিয়ে যায়।' বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন।

'তাহলে আপনি কেন ওদের সঙ্গে গিয়ে থাকেন না? এখানে কেন একলা পড়ে আছেন?'

'নিরিবিলি ইবাদতের জন্য রক্ত ও মাটির দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে এসে বসেছি। অনেকেই তো এসেছিলো। সবাই চলে গেছে। বিদায় হয়ে গেছে। এখন এলো তোমাদের সেনারা।'

'আমাদের সৈন্যরাও কি বিদায় নিয়ে চলে যাবে?'

'না, এই সেনাদল বিদায় নিয়ে চলে যেতে আসেনি। বরং তাদেরকে বিদায় করতে এসেছে যারা নিজেদেরকে মানুষের বাদশাহ ছাড়া অন্য কিছু মনে করে না। ফেরাউন নিজেকে খোদা ভেবে বসেছিলো'।......

...কোথায় সে আজ?... সবই তো বিদায় হয়ে গেছে।'

টহল মুজাহিদ দেয়ালের দিকে চোখ পড়তেই কেঁপে উঠলো।

'ঐ যে দেখুন সাপ! ওদিকে যাচ্ছে।' ভীত গলায় বললো সে।

'আমার সঙ্গে প্রতিদিনই সাক্ষাত হয়।' বৃদ্ধ নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, 'আমরা এক সঙ্গেই থাকি। সাপ সেসব মানুষকেই কেবল দংশন করে যারা মানুষরূপী সাপ হয়ে যায়'।.....

'এখানে আরো তিন চারটি সাপ রয়েছে। আমিও তাদেরকে এটা বুঝাতে পেরেছি যে, আমি মানুষ। আর মানুষ কাউকে দংশন করে না। প্রতিটি মানুষই নিজের মধ্যে সাপের বিষ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ...ওদেরকে ভালোবাসো, ওরাও ভালোবাসা দেবে।...এখন বলো, তোমার সেনা দলের সরদার কোথায়?'

'ওনার সঙ্গে কি দেখা করবেন?' টহল মুজাহিদ জিজ্ঞেস করলো এবং একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'উনার সঙ্গে আপনাকে তো দেখা করতেই হবে। আমাদের সেনা দলে সরদার নয়, সিপাহসালার থাকেন। আপনাকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাওয়াটা আমার দায়িত্ব'।........

'আমাদের সেনাদল যেহেতু এখানে অবস্থান করছেন তাই নিয়ম তো মেনে চলতেই হবে। যদিও কারো প্রতি আমরা সন্দেহ করি না ঠিক, কিন্তু সন্দেহ দূর করাটা তো জরুরি মনে করতেই পারি।'...

'আপনার মতো এমন বয়োবৃদ্ধ সম্মানিত মানুষের ওপর তো কোন ধরনের সন্দেহ করাটাও অন্যায়। কিন্তু এটাও সত্য, নিরীহ, নিষ্কর্মা লোকেরাও শত্রুর কান ও চোখ হয়ে থাকে।...'

'আপনি কি আমার সঙ্গে আমাদের সিপাহসালারের কাছে যাবেন?'

'আমার একটা কথা বুঝতে চেষ্টা করো বেটা!' বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার সিপাহসালার যদি হেরাকলের মতো দর্পী স্বভাবের হয় তাহলে তো সে তোমাদের হুকুম দিবে, ওই

বুড়োকে ধরে বেঁধে মাটিতে হেচড়িয়ে এখানে নিয়ে এসো। সে এখানে বসে কি করছে'।...

'আর যদি সে এমন এক মানব দরদী নেতা হয় যার প্রতীক্ষায় আমরা রয়েছি আটশত বছর ধরে- তাহলে সেই আমার কাছে আসবে।... যাও, ওকে গিয়ে বলো, আমি তারই অপেক্ষায় বসে আছি।'

বৃদ্ধের শেষের কথাগুলো এবং কথা বলার এমন সরল ভঙ্গিটুকু টহল মুজাহিদের মনের মধ্যে একটা পবিত্রতার স্পর্শ এনে দিলো।

মনের মধ্যে তার সন্দেহের কাটা তখনো রয়ে গেছে, কিন্তু এই পবিত্র স্পর্শ কাটার চোখা অংশটাকে অনেকটাই মুড়ে দিয়েছে।

বাকি রাতটা টহল মুজাহিদ তার ডিউটিতে কাটিয়ে দিলো। ফজরের ওয়াক্ত হলে একজন সালারকে পেয়ে গেলো। তাকে সেই বৃদ্ধের কথা জানালো। এর একটু পরই ফজরের আযান হলো।

পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষের এই মৃত শহরে আযানের জীবন্ত সুরধ্বনি এখানকার অগণিত আত্মাকে জাগিয়ে তুলছে যেন।

আযানের পর এক সালার আমর ইবনে আস (রা.)- কে রাত্রের টহল মুজাহিদের রিপোর্ট শোনালো। শত্রু দেশে সন্দেহের সামান্য গন্ধ পেলেও সেটা উপেক্ষা করা যায় না। তিনি রাতের ডিউটিরত মুজাহিদকে ডাকিয়ে এনে তার মুখে সব শুনতে চাইলেন।

সেই মুজাহিদ বৃদ্ধের প্রতিটি কথা শব্দে শব্দে শোনালো এবং তখন তার কি অনুভূতি হয়েছিলো সেটাও সিপাহসালারকে জানালো সে।

আমর ইবনে আস (রা.) যখন বৃদ্ধের সে কথা শুনলেন যে, 'তোমার সরদার ফেরাউন ও হেরাকলের মতো নিষ্ঠুর বাদশাহ না হলে সে নিজেই আমার কাছে চলে আসবে'— সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, আমাকে বৃদ্ধের কাছে নিয়ে চলো।

'আমাকে ওখানে নিয়ে চলো।' আমর (রা.) ডিউটি মুজাহিদকে বললেন এবং সালারকেও বললেন, 'ঐ বৃদ্ধের জন্য কিছু খাবার দাবারও নিয়ে নাও।'

কিছুক্ষণ পরই আমর (রা.) সাহায্যকারী সেনাদলের প্রধান যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)- কে নিয়ে সেই টহল মুজাহিদের সঙ্গে ধ্বংসাবশেষে প্রবেশ করলেন। দুজন সেনা দুধ, পানি ও কয়েক ধরনের খাবার নিয়ে পেছন পেছন গেলো।

তারা যখন বৃদ্ধের সেই কামরায় ঢুকলেন বৃদ্ধ তখন লাঠিতে ভর দিয়ে কামরার ভেতর পায়চারী করছেন। বড় কষ্টে পা মাটিতে ঘেষে হাটছিলেন।

সকালের স্নিগ্ধ আলো কপাটবিহীন জানালার ফাক গলে ভেতরে আসছে। তবুও ছোট প্রদীপটি জ্বলছে– বৃদ্ধ দলটাকে দেখে থেমে গেলেন।

'আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলা শান্তি বর্ষণ করুন। আমর ইবনে আস (রা.) হেসে বললেন, 'আপনি না বললেও আমি আপনার কাছে চলে আসতাম।'

'হ্যাঁ, তোমাকে বাদশাহ মনে হয় না।' বৃদ্ধ আমন্ত্রণের হাসি হেসে বললেন, 'মিসরের মাটি তোমার পদতলের অপেক্ষায় ছিলো– 'এসো তোমরা, আমার কাছে মাটিতে বসে পড়ো।'

বৃদ্ধ পা হেচড়ে নিজের আসনে গিয়ে বসে পড়লেন। তার কাছটায় পাথরি মেঝেতে আমর (রা.)সহ অন্যরা বসে পড়লেন।

'প্রথমে দয়া করে আপনার নিজের ব্যপারে আমাদের কিছু বলুন, আমর (রা.) বললেন মার্জিত কণ্ঠে,

'কবে থেকে আপনি এখানে পড়ে আছেন? কি করছেন এই পোড়া শহরে? কে আসে আপনার কাছে?'

'প্রথমে আমাকে সে সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে দাও। যিনি আমাকে বেঁচে থাকার জন্য এই নিয়ামতগুলো তোমার হাতে পাঠিয়েছেন।' বৃদ্ধ খাবারগুলো দেখিয়ে বললেন।

'তারপর তোমাকে এই শহরের উথান পতনের সামান্য কিছু ইতিহাস শোনাবো। এতে তোমরা এ শিক্ষা অবশ্যই পাবে যে, মানুষের দৃষ্টিতে অধরা এমন এক শক্তি আছে যিনি মানুষকে সাফল্যের উচ্চ শিখরে পৌছে দিয়ে আবার ব্যর্থতার আস্তকুড়ে নিক্ষেপ করেন'।...

'তবে সবাইকে নয়। রাতে তোমার এই সৈনিককে বলেছিলাম, 'সেই ফেরাউন কোথায়, যে নিজেকে খোদা বলে ঘোষণা দিয়েছিলো? শোন সিপাহসালার! তুমি যদি এই মাটিকে ভালোবাসো, সম্মান করো, তাহলে আকাশের উচ্চতায় পৌছতে পারবে। আর যদি বলো তুমি নিজেই আকাশে চড়ে বসবে তাহলে এই মাটির অতলে তুমি ও তোমার সব কৃতিত্ব হারিয়ে যাবে।'

'শুনেছি, আপনি এখানে বসে ইবাদত করেন। কার ইবাদত করেন আপনি?' আমর ইবনে আস বৃদ্ধের ধর্মবিশ্বাস জানতে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার নিজের; বৃদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি আমার নিজ সত্তার ইবাদত করি। হয়রান হয়ো না সিপাহসালার! তুমি তাকে খোদা কিংবা যা ইচ্ছা বলো বলতে পারো, তা আমার সত্তার মধ্যেই মিশে আছে'।......

'এর অর্থ এই নয় যে, সবাই আমাকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করবে। আমি আসলে আমার কথা বলছি। তুমি কি আমার এই ধর্মবিশ্বাসকে পছন্দ করবে যে, আমি কোন মূর্তির পূজা করি না। পূজা করি না জ্বলন্ত অগ্নির। খোদার সৃষ্টি কোন কিছুকে আমি খোদা বানিয়ে রাখিনি'।...

'তবে আমি সবসময়ে এই অভাব, শূন্যতা অনুভব করি যে, এখনো পর্যন্ত এমন কোন ধর্ম বিশ্বাস আমার সামনে আসেনি যে যুক্তি দিয়ে বলতে পারবে যে, তুমি ইবাদত করো ঐসত্তার! তবে এতটুকু জানি, ইবাদতের উপযুক্ত খোদা যিনিই হোন তিনি বান্দার দৃষ্টিতে ধরা পড়েন না। তাকে দৃষ্টিসীমার আওতায় আনাও অসম্ভব ব্যাপার।'
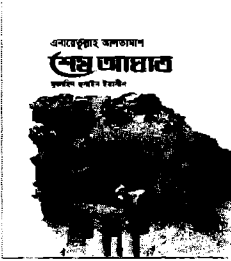
'আমার কাছে শুনে নিন তিনি কে? আমর ইবনে আস (রা.) রহস্যময় সে বৃদ্ধকে বললেন, আমাদের দৃষ্টি শক্তির উর্ধ্বে থাকা সেই খোদাই আমাদেরকে এই পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, যাও আমার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করে তাকে বলো, আমি আমার প্রত্যেক বান্দার অস্তিত্বে মিশে থাকি। আর এও জানিয়ে দাও, সব বাদশাহী আমারই। কোন বান্দার নয় এবং কোন বান্দা অপর বান্দার গোলাম নয়। কেউ কাউকে গোলাম বানাতে পারবে না।'

'এখন আমার বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে, আমি তোমার অপেক্ষাতেই বেঁচে ছিলাম। শুধু আমি নই। মিসরের এই জমিনও তোমার অপেক্ষায় ছিলো'।...

'কিন্তু এটা মনে করো না, তোমার ব্যক্তির অপেক্ষায় ছিলো কেউ। নিজেকে খোদার সামান্য একজন দূত মনে করো। তিনি যে পয়গাম দিয়ে মূসা আঃ-কে পাঠিয়েছেন তিনি সেটা নিয়ে ফেরাউনী জুলম অত্যাচারের যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন, নিজেকে সেই মুসার প্রতিনিধি মনে করো যে, মিসর আবার নাব্য ফেরাউনে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে।'

'আপনার বয়স কত হলো মান্যবর'?

'বয়স জেনে আর কি হবে। মাঝে মধ্যে মনে হয় – যেদিন দুনিয়ার অস্তিত্বমান হয়েছি সেদিন থেকেই এখানে আমার বিচরণ। দুনিয়া থেকে সেদিন বিদায় নেবো যেদিন দুনিয়ার বিধায় ঘণ্টা বেজে উঠবে'।...

'যতটকু মনে পড়ছে, বয়স আমার একশ বিশ পচিশের ওপরে হবে। কত বড় বড় শহর উপশহর, গ্রাম উজাড় হতে দেখেছি'।

আমর ইবনে আস রা.

'আমাদের বিশ্বাস হলো, অদৃশ্যের সব জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এছাড়া আর কেউ কিছু জানে না, কিন্তু মিসরে হাজার হাজার বছর ধরে যাদু ও গণক বিদ্যার চর্চা হয়ে এসেছে। এজন্য কেউ কেউ ভবিষ্যত বলতে পারে বলে দাবি করে। শতবর্ষী একজন মিসরীয় হিসাবে আপনিও কি এ দাবি করেন যে, আপনি ভবিষ্যত বলতে পারেন?'

'না, সিপাহসালার!' বৃদ্ধ জোর গলায় বললেন, 'আমার এমন কোন জ্ঞান বিদ্যার কথা জানা নেই। দুনিয়ার অনেক কিছুই দেখেছি। যা দেখেছি এবং আজো দেখতে পাচ্ছি, তাই বলতে পারি। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। পথভ্রষ্টকে দেখে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে, এ লোক এক দিন না একদিন ধ্বংসের অতলে হারিয়ে যাবে'।....

'আর যে পুণ্যবান, মানুষের প্রতি উদারপ্রাণ তার ব্যাপারে যে কেউ বলতে পারে- এ লোক সাফল্যের শীর্ষ দেশে পৌঁছতে যাচ্ছে... আমি জানি তুমি কেন এ কথা জিজ্ঞেস করেছো?...আমি আগেই তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি'।...

'তোমার এখানে আসা, এই পোড়া শহরে শিবির স্থাপন করা, আমার সঙ্গে এই মাটিতে বসাটারই প্রমাণ বহন করে যে, বিজয় তোমারই হবে।... যদি একে নিজের ব্যক্তিগত বিজয় মনে করে নিজেই এর কৃতিত্ব দাও এবং এর সুফল ভোগ করতে চেষ্টা করো তাহলে এই ভবিষ্যদ্বাণী উল্টে যেতে সময় লাগবে না।'

'এই শহরের ব্যাপারে তো এখনো কিছু বললেন না।' আমর (রা.) বললেন।

'আহ! স্মৃতির বিখ্যাত অলিগলি আজ কোথাও আলোকিত কোথাও অন্ধকার, কোথাও বাস্তব অবাস্তব দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে, 'এ শহর মর্যাদা ও গৌরবের এক বরণীয় স্মৃতিগাঁথা যেমন তেমনি শিক্ষা ও পাথেয় গ্রহণের এক প্রতীকও বটে'।...

'মনে হয় যেন ফেরাউন এ শহর আমার চোখের সামনে নির্মাণ করেছে। এই শহরের দালান কোঠা ও শাহী প্রসাদগুলোতে তার রাজকীয় ও শক্তিমত্তার সব সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছিলো দ্বিতীয় রেমিসিস ফেরাউন। এর নাম রেখেছিলো 'মদিনাতুশশামস' সূর্যের শহর- ঐশ্বর্যের শহর' ।...'

'এই শহরের যৌবন ও তার সাফল্যের গল্প-কথা আমার পূর্বপুরুষরা আমাকে শুয়েছিলো' ।...

'আমার বাপদাদারা ধর্মীয় নেতা ছিলো। উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও সেই নেতৃত্ব পেয়ে ছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস টলে যায়। তারপর কিছুকাল তো এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জীবন কাটে যে, আমি ইবাদত করলে কার ইবাদত করবো?...কোন আদর্শে আমার জীবন গড়ে তুলবো কেন করবো'?...

'এসব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। যাক, এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। আমি চাচ্ছিলাম তোমাকে এ শহরের গল্প বলতে। কতটুকু বলতে পারবো তা জানি না' ।...

'গ্রিকরা কবে এ দেশে এসেছিলো সেটা তোমাদের না জানলেও চলবে। শুধু এতটুকু জেনে রাখো, এ শহর ছিলো বিচিত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল। পৃথিবীর বিখ্যাত দার্শনিক আফলাতুন, এরিষ্টেটল, সক্রেটিস, এই শহরে এসে তাদের জ্ঞান তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তারা দর্শন ও পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষা এ শহর থেকেই নিয়ে গেছেন' ।....

'মজার ব্যাপার কি জানো? ফেরাউনের পতন যখন শুরু হলো এ শহরের উত্থান তখন শুরু হলো। ফেরাউনি দুঃশাসন যখন মুমূর্ষ অবস্থায় পড়লো, এশহরে তখন বিভিন্ন ধর্মের লোকের উপাসনালয় গড়ে উঠতে লাগলো' ।...

'অসংখ্য আকাশ ছোঁয়া মিনার আর চোখ ধাঁধাঁনো কারুকার্যখচিত গম্বুজে শহর তিলোত্তমা হয়ে উঠতে লাগলো। বিভিন্ন ধর্মের বড় বড় ব্যক্তিত্বরা এখনকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সারা মিসরে তার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন' ।...

'পারস্যের অগ্নিপূজকরা এখানে এসে তাদের বড় বড় অগ্নিশিখা বানিয়েছে। কিন্তু রোমীয়রা এসে তাদেরকে মিসর থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তারা সঙ্গে করে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে আসে' ।....

'মিসরীয়রা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের উপসনালয় ও অগ্নিশিখার স্থলে গড়ে উঠতে লাগলো গির্জার পর গির্জা।...'
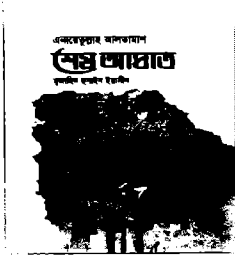
'এখান থেকেই এ শহরের ভাগ্য উল্টো পথে চলতে শুরু করলো। কারণ, এখানকার লোকদের কাছে যে ধর্মই ভালো লেগেছে সেটা তারা সাদরে গ্রহণ করেছে। কিন্তু রোমীয়রা শত শত বছর আগেই এখানে অস্ত্রের জোরে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটিয়েছে। যার পরিণতিতে এ শহর ক্রমেই তার জৌলুস হারাতে শুরু করলো'।...

'আজকের অবস্থা কি? তোমরা এটা মনে করছো যে, আমি এক পোড়া শহরের অন্ধকারে বসে আছি, বাইরের কোন খবর আমার কাছে আসছে না। মুহূর্তের মুহূর্তের খবরও আমার কাছে চলে আসে'।...

'আজ হেরাকল তার পূর্ব পুরুষদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি নিষ্ঠুর আর পৈশাচিকতা দেখিয়ে খ্রিস্টধর্মের পুরো অস্তিত্বটাই বিকৃত করে দিয়েছে'।...

'এক্ষেত্রে হেরাকল যে অমানুষিক নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছে, শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। হাজার হাজার মানুষ হেরাকলের বানানো ধর্ম গ্রহণ না করার অপরাধে মৃত্যুকুপে নিক্ষেপিত হয়েছে। রোমীয়রা শুধু এই অপরাধই করেনি; এরও অনেক আগে রোমীয়রা এখানে এসেই শহরের উপাসনালয়গুলো বিধ্বস্ত করতে শুরু করলো'।....

'বড় বড় সুন্দর মনোরম প্রতিমা, স্থাপত্য-শিল্প ওরা উঠিয়ে নিয়ে গেলো রোমে। তোমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, ওরা সুউচ্চ সুরম্য মিনারগুলোও উঠিয়ে নিয়ে গেলো। গম্বুজে খচিত মনি-মুক্তাগুলো খুলে নিলো'।...

'লক্ষ্য লক্ষ্য দুর্লভ গ্রন্থের স্তুপ ওরা দখল করে নিলো। কিছু জ্বালিয়ে দিলো, কিছু রোমে পাঠিয়ে দিলো। এখানকার যা কিছুই ভালো লাগলো তাই ওরা কেড়ে নিলো এবং রোম পাঠিয়ে দিলো'।....

'জ্ঞান বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যের এমন সমাহার করা ঐতিহ্যবাহী শহরটিকে রোমীয়রা এমন হাল করে ছাড়লো, যেমন মরা খেকো শিয়াল ও হিংস্র প্রাণীরা মৃতের লাশ নিয়ে করে থাকে।'...

'ওরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎসস্থল ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দিতে লাগলো। তখনই তো এ শহরের বাতিগুলো নিভে যেতে লাগলো। তখন জ্ঞান পিপাসুরা এখানে আসা ছেড়ে দিল। গ্রিকরা এশহরের নাম রেখেছিলো হাইলো বুলিস। আর

রোমীয়রা তা পাল্টে রাখলো, 'আইনুশশাসম'। লোকেরা এখন একে আয়নুশশামসের ধ্বংসস্তুপ বলে।...

'আজ দেখো, এ শহরের মর্চে পড়া দেয়াল, ভঙ্গুর ছাদ, উইপোকায় খাওয়া বাড়ি ঘরের দরজা জানালাগুলো নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে। আসলে আমি তোমাদেরকে এ শহর নয়, রাজা মহারাজাদের উত্থানপতনের কাহিনী শোনাচ্ছি'। .....

'উত্থানপতনের এই সার নির্যাস থেকে আমার এই উপলব্ধিই দৃঢ় হয়েছে যে, একটি লশকর আসছে। বিস্ময় জাগানো এক সেনাদল আসছে। প্রচণ্ড মরু ঝড়েরর মতো সবকিছু উৎখাত করতে করতে তারা আসছে। এক নয়া দুনিয়া তারা বিশ্ববাসীকে উপহার দেবে।'...

'উন্নতির শীর্ষচূড়ায় তারাই পৌছবে যারা এমন এক বিশ্বাস নিয়ে আসবে যা কোন মানুষের উদ্ভাবন নয় বরং তার সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি পুরা বিশ্বের কারিগর– মালিক। তোমার সেনারাও ঝড়ের প্রচণ্ডতা নিয়ে এখানে এসেছে। আমি সবকিছুই শুনেছি'।...

'এও জানি, রোমীয়দের বিশাল শক্তির মোকাবেলায় তোমাদের কাছে বলতে গেলে কোন শক্তিই নেই'।...

'তবে এও জানি, তোমাদের কাছে এমন এক অদৃশ্য শক্তি আছে যা রোমীয়দের যুদ্ধ শক্তিকে পদপিষ্ট করে তোমাদেরকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। আর হ্যাঁ, এটাও মনে রেখো, তুমি এখানে আসোনি। তোমাকে পাঠানো হয়েছে।'

'আমাদেরকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা।' আমর ইবনে আস (রা.) বললেন,

'আমরা দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের জন্য লড়াই করি না। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ও তার জয়গান সারা দুনিয়ায় বিস্তারের জন্য লড়াই করি। আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য– মানবজাতিকে মুক্তির মহাসড়কে উঠিয়ে দেয়া।'

'যাও, জয় তোমারই হবে।'

আমর ইবনে আস (রা.) ও যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সেখান থেকে উঠে পড়লেন।

সিপাহসালার হুকুম দিলেন, মুসলিম সেনাদল যতদিন এই পোড়া শহরে থাকবে এই বৃদ্ধ বুযুর্গের খাওয়া দাওয়া ও দেখভালের দায়িত্ব আমাদের।
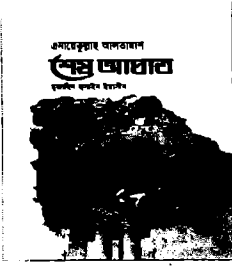
ব্যাবিলনে মুকাওকিস এখন নিজের চুল ছিড়ছেন। মুসলমানদেরকে প্রথমে মিসরে ঢোকার সুযোগ দিয়ে তারপর রোমীয়দের দ্বারা ঘেরাও করে খতম করে দেয়া হবে, এ পরিকল্পনা তো চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

আতরাবুনের মতো জেনারেল মারা গেছে। একের পর এক শহর হাত ছাড়া হয়ে গেছে। সর্বত্রই তারা পর্যদুস্ত হচ্ছে। তারপর হান্নার মতো আরেক জাদরেল জেনারেল মারা গেছে।

এমনকি এর আগে রোমে ও অন্যান্য রনাঙ্গণে যেসব তাজাদম সেনারা লড়াই করেনি এবার তাদের দু'চার ব্যাটালিয়নকে লড়াইয়ে নামিয়ে সবচেয়ে বড় ভুলটি করেছেন মুকাওকিস।

কারণ, তারা মুসলমানদের ব্যাপারে পুরো রোমীয় সেনা দলে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

এ কারণে লড়াইয়ের আগেই এখন মুকাওকিসের সেনারা পরাজয়কে সহজেই মেনে নিচ্ছে।

মুকাওকিসের ওপর আরেকটি আঘাত এসেছে হেরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে। একেরপর এক পরাজয়ের সব দায় দায়িত্ব ও দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন হেরাকল মুকাওকিসের ওপর।

মুকাওকিসের প্রশ্ন হলো, হেরাকল নিজে যখন রণাঙ্গন থেকে– শাম থেকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পালিয়েছেন, তখন কার ওপর তিনি দোষ চাপিয়েছিলেন?

এসব কারণে হেরাকলের বিরুদ্ধে মুকাওকিসের মন বিষিয়ে উঠেছে।

এদিকে কিছু দিন আগে মুকাওকিস ও সরকারি আসফাকে আজম মিলে কিবতী খ্রিস্টানের আসফাকে আজম বিনিয়ামীনের কাছে এক বিশেষ পয়গাম দিয়ে এক দুত পাঠান।

পয়গামে অনুরোধ করা হয়েছে, বিনিয়ামীন ও কিরাস মিলে মুসলমানদের কবল থেকে খ্রিস্ট জগতকে বাঁচাতে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে।

এখানে আসলে বিনিয়ামীনকে গ্রেফতার বা হয়রানী করা হবে না। বরং সসম্মানে বরণ করে নেয়া হবে। আর এই সাক্ষাতের খবর হেরাকল কখনো পাবেন না। কারণ, এর আসল উদ্দেশ্য, খ্রিস্ট ধর্মকে বাঁচানো এবং মুসলমানদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করা।

বিনিয়ামীন তো খ্রিস্ট ধর্মের জন্য তার জীবন যৌবন সব উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তার এক ভাই এর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। তাই বিনিয়ামীন গোপনে ব্যবিলন পৌঁছে গেলেন।

তাকে বড় আন্তরিকভাবে মুকাওসিক ও কিরাস সংবর্ধণা জানালেন।

মুকাওকিস বিনিয়ামীন ও কিরাসের জন্য রুদ্ধদার বৈঠকের ব্যবস্থা করে বললেন, তিনি নিজেও তাদের দুজনের আলোচনয় হস্তক্ষেপ করবেন না। মুকাওকিস ও কীরাসের আসল উদ্দেশ্য হলো, খ্রিস্টধর্মকে তারা যেন নিরাপদ করে তোলে। এই প্রস্তাব দিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

বিনিয়ামীন অধিক জোর দিলেন একথায় যে, হেরাকল যত দিন বেঁচে আছেন তত দিন তিনি তার মনগড়া সরকারী খ্রিস্টধর্ম থেকে সরে দাঁড়াবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ থেকে কাউকে রেহাইও দেবেন না।

কিরাস জবাবে বললেন, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, হেরাকলের সেই প্রভাব প্রতিপত্তি আর এখন নেই। মুকাওকিস এমনও বলেছেন, হেরাকল আবার কোথাও অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে তাকে মিসর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হবে।
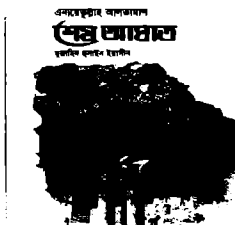
মুকাওকিস এই দুই প্রধান ধর্মীয় নেতাকে আলোচনায় বসিয়ে দিয়ে নিজে তার খাস কামরায় গিয়ে বসলেন জেনারেল থিয়োডরকে নিয়ে।

জেনারেল থিয়োডরকে তিনি তার বিশ্বস্ত এক জেনারেল হিসাবে জানেন। থিয়োডরই এখন সেনাপ্রধান। তাই জয় পরাজয়ের সব দায় দায়িত্ব তার ওপরও বর্তায়। কিন্তু মুকাওকিস ও থিয়োডর আর পরাজয়ের গ্লানি নিতে চান না।

'থিয়োডর!' মুকাওকিস বললেন, বিনিয়ামীন ও কিরাসকে আমি রুদ্ধদার বৈঠকে বসিয়ে দিয়েছি। তারা আলোচনা করে যে সিদ্ধান্তেই পৌঁছুক আমি কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যত দিন পর্যন্ত হেরাকল আমাদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরাবেন আমরা কোথাও কোন সাফল্য পাবো না'।...

'তারপর এক দিন মুসলমানরা সারা মিসর ছেয়ে যাবে। হেরাকল তখন এর ব্যর্থতার দায়ভার আমাদের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে নিজে আরাম কেদারায় বসে সুখে কান চুলকাবেন।'

'পরিস্থিতির সবটা আমার অজানা নয়,' থিয়োডর বললো, 'বলুন এর সমাধান কি? আমাদের করণীয়ই বা কি?'

'হেরাকলকে সরিয়ে দেয়া,' মুকাওকিস কানাঘুষার মতো করে বললেন, 'কিন্তু এখানে হেরাকলের অনুগত বিশাল শক্তির সেনা রয়েছে। এদের মাধ্যমে হেরাকল আমাদের দুজনকে বা আমাকেই মেরে ফেলবে। এজন্য সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হলো, হেরাকলকে আমরা দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো।'

জেনারেল থিয়োডর মাথা নিচু করে ফেললো। যেন গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। মুকাওকিস তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অবশেষে থিয়োডর মাথা উঠিয়ে আস্তে আস্তে মাথা ওপর নিচ করলো। যার অর্থ, সেও মুকাওকিসের সঙ্গে একমত।

'কাজটি যেমন ঝুঁকিপূর্ণ, তেমন কঠিনও।' থিয়োডর বললো, 'কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও তো নেই।...কিভাবে কি করা হবে এটা কি আমাকে বলবেন?'

'আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি! মুকাওকিস গলা নামিয়ে বললেন, 'দুজন লোক তৈরী করেছি। তাদের সঙ্গে এমন সুন্দরী ও চতুর একটি মেয়ে যাচ্ছে, হেরাকল এর আগে কখনো এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেননি। ....

'হেরাকলের কাছে আমি এই মেয়ে উপহার হিসাবে পাঠাচ্ছি। আমার দুজন বিশ্বস্ত লোক ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। এজন্য ওদেরকে বহু টাকা পয়সা দিয়েছি।'

'এই মেয়ের ওপর কি সম্পূর্ণ ভরসা করা যায়? মেয়েরা তো এমনিতেই দুর্বল মনের হয়। ওখানে গিয়ে না আবার ভয় পেয়ে যায়?'

'হত্যা তো আর তলোয়ার, খঞ্জর বা কোন অস্ত্র দিয়ে করা হবে না। মদে বিষ মিশিয়ে কাজ সারা হবে। এটা তো মেয়েটি সহজেই করতে পারবে। আমি মেয়েটিকে ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছি, হেরাকল কিভাবে মদ পান করেন এবং মদ পানের সময় কি কি করেন'।...

'সময় সুযোগ বুঝে মেয়েটি কিভাবে সামান্য বিষ মদের সুরাহীতে ঢেলে দেবে তাও বুঝিয়ে দিয়েছি আমি ওকে। আর বিষও এতোই শক্তিশালী যে, কয়েক ফোটাতেই কাজ শেষ করে দেবে।'

'তবে এ ব্যাপারে কঠিন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।' থিয়োডর বললো,

'সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো, যে দুজন লোক যাচ্ছে, তাদেরকে যেন কেউ চিনতে না পারে।'

'ওদেরকে চেনার প্রশ্নই উঠে না। ওরা একেবারে সাধারণ পোশাকে যাচ্ছে। মেয়েটিকেও গরিব কিষানের মেয়ের পোশাক পরানো হবে। আর তার মুখে থাকবে নেকাব।'

তারপর মুকাওকিস ও থিয়োডর বাইবেলের ওপর হাত রেখে শপথ করলো যে, তারা উভয়ে এই গোপন পরিকল্পনা গোপনই রাখবে। তারা একে অপরকে কখনো ধোকা দেবে না।

ওদিকে বিনিয়ামীন ও কিরাস খ্রিস্টবাদের স্বার্থে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একমত হয়ে দুজনে হাত মেলালেন।

মুকাওকিস সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। বিনিয়ামীন শুধু হেরাকলের দিক থেকে জামানত চাচ্ছিলেন। মুকাওকিস তাকে বললেন,

'আপনি চিন্তা করবেন না। হেরাকল আমাদের এ পদক্ষেপকে অবশ্যই স্বাগত জানাবেন। খ্রিস্টবাদের চেয়ে হেরাকলের কাছে তার সালতানাত অনেক বেশি প্রিয়। তার মিসর চাই। ধর্ম নয়।'

থিয়োডর ছাড়া আর কারো তো জানা নেই, মুকাওকিস কিসের ভিত্তিতে বিনিয়ামীনকে হেরাকলের ব্যাপারে এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। তাকে তো দুনিয়া থেকেই উঠিয়ে দেয়ার নীল নকশা করেছেন মুকাওকিস।

কিবতীরা যথাসম্ভব মিসরীয় সেনাদলে যোগ দেবে। যারা যোগ দিবে না তারাও মুসলমানদেরকে সামান্যতম সাহায্য করবে না- বিনিয়ামীন এ নিশ্চয়তা দিয়ে ব্যবিলন থেকে বিদায় নিয়ে তার শহরে ফিরে গেলেন।

'আয়নুশ শামস' পোড়া শহর এলাকাটি বেশ উঁচু এলাকা। প্রতীরক্ষার দিক দিয়ে জায়গাটি বেশ নিরাপদ। শত্রু আচমকা হামলা করে বসলে শহরের উচ্চাতা দারুন ফায়দা দেবে। এছাড়াও সেখানে পানির উৎস ছিলো অফুরন্ত। রসদের মজুদও আছে যথেষ্ট পরিমাণে।

গত লড়াইয়ে একটু বেশি পরিমাণে সৈন্য আহত হয়েছিলো। তারা এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। হয়ে যাবে দ্রুতই। সুস্থ হয়ে গেলেই পরবর্তী অভিযানে নেমে পড়বে তারা।

একদিন আমর ইবনে আস (রা.)– যুবায়ের (রা.)সহ অন্যান্য সালারদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন।

'প্রিয় বন্ধুরা!' আমর (রা.) সালারদের বললেন,

'এখন ব্যবিলনের কেল্লাবদ্ধ শহর আমাদের সামনে অপেক্ষমান। কিন্তু সেখানে যে রোমীয় সেনা রয়েছে তার কোন শেষ নেই। একে তো মুকাওকিস অসংখ্য সেনা সেখানে জমায়েত করেছেন আগ থেকেই। তারপর বিজিত বিভিন্ন কেল্লা থেকে পরাজিত সৈন্যরা পালিয়ে ব্যবিলনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে'।...

'এতো জানা কথা যে, ব্যবিলন শহর আমাদের অবরোধ করতে হবে।...কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি আমার দুআ কবুল করেন তাহলে রোমীয়রা অবশ্যই শহর ছেড়ে বাইরে এসে খোলা ময়দানে লড়াই করবে। দুআ করো বন্ধুরা আমার! আল্লাহ যেন এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, রোমীয়রা কেল্লার বাইরে চলে আসে।'

'আল্লাহ তাআলা তো আমাদেরকে কোথাও হতাশ করেননি,' যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) বললেন,

'রোমীয়রা বাইরে এসে লড়লে যদি সেটা আমাদের অনুকুলে হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা এ পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে দেবন।'

'এটাও মনে গেঁথে নাও বন্ধুরা!' আমর (রা.) বললেন, 'আমরা এখন মিসরের জয় বা পরাজয়ের চূড়ান্ত স্তরে পা দিয়ে ফেলেছি। এখন যদি আমরা কোথাও থেকে উৎখাত হই তাহলে ঠিকানা হবে পরকালে না হয় পালিয়ে শামে'।...

'আমি সবসময় আমার এ নীতির ওপর অটল থাকবো যে, কোথাও বসে শত্রুদলের অপেক্ষা না করা। সব সময় দুশমনের মাথার ওপর সওয়ার হয়ে থাকা। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই নীতি প্রতিটি রণাঙ্গনে আমাদেরকে সাফল্য এনে দিয়েছে।'
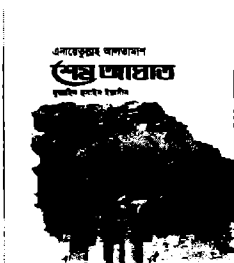
ওদিকে ব্যবিলনে মুকাওকিস ও থিয়োডর দু' তিনজন জেনারেল নিয়ে মুসলমানদেরকে পিছু ধাওয়া করার পরিকল্পনা আটছিলেন। মুকাওকিস বলছিলেন,

'আরবরা যদি এবার ব্যবিলনও নিয়ে নেয় তাহলে কোথাও আমরা পা জমিয়ে দাঁড়াতে পারবো না'।

আমর ইবনে আস (রা.) একবার তার সৈন্যদের বলেছিলেন,

'আমরা যদি কোথাও থেকে পিছু হটি তাহলে এই শত্রু দেশে কোথাও আমরা আশ্রয় পাবো না এবং পালানোরও জায়গা থাকবে না'।

একই কথা মুকাওকিসও বলছিলেন, তার জেনারেলদেরকে, আমরা যদি ব্যবিলন থেকে উৎখাত হই তাহলে সারা মিসরে কোথাও আমরা আশ্রয় পাবো না । এমনকি আমাদের ঘরের লোকেরাই আমাদেরকে কোথাও আশ্রয় দেবে না'।...

'আমার কথাটা সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে অনুরোধ করছি। থিয়োডর বললো,

'মুসলমানদের চাল আমি বুঝি গেছি। আফসোস হচ্ছে, আতরাবুনের মতো বিশ্ব বিখ্যাত জেনারেল এটা বুঝতে পারেননি।...

আরবদের সিপাহসালার প্রথম হামলা থেকেই এই নীতিতে অটল ছিলেন যে, দুশমনের সংখ্যা ও নিজেদের সংখ্যার দিকে মোটেও তাকাবে না এবং হামলা করতে মুহূর্তও বিলম্ব করবে না। এক জায়গায় বসে থাকবে না। আর দুশমনের ওপর এমনভাবে টুটে পড়বে, দুশমন যাতে সেই হামলা আকস্মিক মনে করে সামলে উঠতে না পারে।'...

'একারণেই আরবরা প্রতিটি রনাঙ্গনে আশাতীত সাফল্য পাচ্ছে। ওদিকে আমরা কি করি? কেল্লা বন্দি হয়ে দুশমনের অপেক্ষায় বসে থাকি। আর অবরোধ অবস্থায় আমাদের যুদ্ধ কৌশল হলো, দু' তিন ব্যাটিলিয়ন সৈন্য বাইরে বের হয়ে হামলা করে করে ভেতরে চলে যায়। আরবরা তো আমাদের এই চাল বুঝে গেছে। এ থেকে ওরা যে ফায়দা উঠিয়েছে তা তো আপনাদের সামনেই রয়েছে।'

'আমি চাই, আমরা কেল্লাবন্দি হয়ে লড়বো না' থিয়োডর বললো,

'আমরা আরবদেরকে এতটুকু সুযোগই দেবো না যে, ওরা এসে ব্যবিল অবরোধ করবে। তাদের সিপাহসালারের আরেকটি কৌশল হলো, দুশমনের মাথার ওপর সওয়ার হয়ে থাকো, যাতে ওরা এটা না বুঝে যে তার প্রতিপক্ষ মনোবল ভেঙ্গে পায়ের উপর বসে পড়েছে'।

'আমি চাই আপনিও এ কৌশল অবলম্বন করুন। আপনি সম্ভবত শুনেননি যে, মিসরের লোকেরা আমাদেরকে কাপুরুষ ও ভীতু বলছে। এখন তারা বলছে আমরা না কি নপুংসক। আমরা কেল্লার প্রাচীরে বসে নিজেদের প্রতিরোধ করছি।... তাই এখন আমাদের বাইরে গিয়ে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করা উচিত।'

মুকাওকিস হুকুম দিয়ে দিলেন, সৈন্যরা শহরের বাইরে গিয়ে খোলা ময়দানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবে। কোন দিকেই যেন কোন দুর্বলতা না থাকে।

আমর ইবনে আস (রা.)ও এই দুআই করছিলেন যে, রোমীয়রা শহরের বাইরে বের হয়ে যেন হামলার পরিকল্পনা করে।
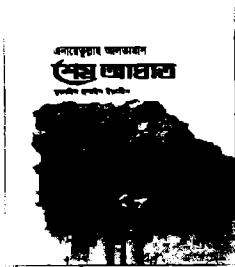
এর দুদিন পরই সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন,

'আগামীকাল ফজরের নামাযের পর ব্যবিলন অভিমুখে কোচ করা হবে। ব্যবিলন অবরোধ করা হবে'।

রোমীয়রা কেল্লার বাইরে এসে লড়বে– মুসলমানরা তো এটা আশাও করেনি।

যোহরের নামায শেষ হতেই ব্যবিলন থেকে এক গুপ্তচর এসে হাজির হলো। সে সিপাহসালারকে জানালো, রোমীয়রা এবার খোলা ময়দানে এসে লড়াই করবে।

খোলা ময়দানে রোমীয়দেরকে যুদ্ধের মহড়া দিতে দেখা গেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে গুপ্তচর জানতে পেরেছে, মুকাওকিস ও থিয়োডর এবার আর অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে না। ব্যবিলন থেকে দূরে এসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বে।

আমর (রা.) প্রথমেই সালারদেরকে ডেকে সুসংবাদ দেয়ার সুরে এ খবর জানালেন। সবাই বেশ খুশি হলো। তারা তো ধরেই নিয়েছিলো, রোমীয়দেরকে এরা খোলা ময়দানে কখনো পাবে না।

তারপর আমর (রা.) সে জায়গাটা নির্বাচন করলেন যেখানে রোমীয়দেরকে এনে লড়াই করতে বাধ্য করবেন। সালারদেরকে তিনি লড়াইয়ের কৌশল বুঝিয়ে দিলেন।

'রোমীয়রা যাতে আমাদের আগে কোন ময়দান নির্বাচন করে আবার আমাদেরকে সেখানে যেতে চ্যালেঞ্জ না করে বসে, তাই আমাদের নির্বাচিত ময়দানে পৌঁছতে হবে খুবই দ্রুত। রোমীয়রা তখন সেখানে আসতে বাধ্য হবে।' আমর (রা.) বললেন সালারদেরকে।

এশার নামাযের ইমামতির পর আমর ইবনে আস (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন,

'এই প্রথম রোমীয়রা খোলা ময়দানে আসছে। এই প্রথম তোমরাও তাদেরকে উন্মুক্ত রনাঙ্গণে পাচ্ছো। আমাদের চেয়ে অনেকগুন বেশি তাদের সংখ্যা। তোমরা কখনো সংখ্যার পরোয়া করোনি'।...

'এটা কি আমাদের ঈমান ও বিশ্বাস নয় যে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, যিনি এমন হাতে গোণা সৈন্য থাকার পরও আমাদেরকে নীল নদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন'?....

'আমি একটি কথা আগে আরো কয়েকবার বলেছি। আমাদের পা যদি কোন এক রনাঙ্গণ থেকে উপড়ে যায় তাহলে আমাদের কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবো না। তখন তো আমাদের নাম নিশানাই মুছে যাবে। মিসরে ইসলামের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল ফজরের পর আমরা রওয়ানা হবো।'

আমর ইবনে আস (রা.) সেনা বিন্যাসের পর আরেকটা কাজ করলেন, পাঁচশ পাঁচশ করে জানবায-আত্মত্যাগী বাহিনীর দুটি দল আলাদা করে রাখলেন।

এক দলের নেতৃত্ব দিলেন খারিজা ইবনে হাযফা (রা.)- এর হাতে এবং আরেক দলের দায়িত্ব দিলেন হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)- এর হাতে।

এঁরা উভয়েই শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ও দলের সালার ছিলেন।

'আয়নুশশামস' ও ব্যবিলনের মাঝামাঝি জায়গায় কিছু এলাকা পাহাড়ি। যেগুলোর মধ্যে বড় বড় প্রশস্ত গুহা রয়েছে। এই এলাকাকে 'বনুওয়ায়িল' বলে। এক দলকে বনুওয়ায়িল এলাকায় রওয়ানা করে দেয়া হলো।

আরেক দলকে উম্মে দানীনের কাছ ঘেষা পাহাড় সারিতে গিয়ে আত্মগোপন করে অবস্থান নিতে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

রাতে রাতেই এই দুই গুপ্ত বাহীনিকে পাঠিয়ে দেয়া হলো। যাতে শত্রুপক্ষ টের না পায়।

এখন যে এলাকাকে আব্বাসিয়া বলা হয় সেখানে মুসলিম সেনাদল পর দিন ফজরের পর কোচ করে।

সেখানে প্রস্থে দৈর্ঘ্যে মরু ভূমির মতো বিশাল এলাকা নিয়ে এক ময়দান রয়েছে। সেনাদলের আগে আগে বিভিন্ন ছদ্মবেশে কয়েকজন গুপ্তচরও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ও দিকে থিয়োডর তার গুপ্তচরের মাধ্যমে জানতে পারলো, মুসলিম সেনাদল আব্বাসিয়ার দিকে আসছে। থিয়োডর বেশ খুশি হয়ে তার সঙ্গী জেনারেলরেকে জানালো, সে মোটেও আশা করেনি, মুসলমানরা আয়নুশশামসের পোড়া এলাকা থেকে বেরিয়ে আসবে।

কারণ, সে ক্ষেত্রে মুসলমানরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকার সুবিধা কাজে লাগাতো। যেটা রোমীয়দের জন্য প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করতো। থিয়োডর তার সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিলো।

'সালতানাতে রোমের বীর বাহাদুররা!'

থিয়োডর অতি জোশদীপ্ত উঁচু আওয়াজে বললো, তার সেনাদলের উদ্দেশ্যে,

'তোমাদের দুশমন আজ পর্যন্ত তোমাদেরকে কেবল বুযদিল কাপুরুষ ও ভীতু মনে করে আসছে। অথচ তাদের সেনা সংখ্যা তোমাদের অর্ধেকও নয়'।..

'আজ যদি তোমরা এই ময়দান থেকে পিছু হটো তাহলে মনে রেখো, ধন-রত্ন সোনা জওহারের লক্ষ লক্ষ ভাণ্ডারে ভরা এই মিসর থেকে চির তরে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সালতানাতের রোমে তো নয়ই, রোম সাগরে গিয়েও তোমরা ঠাঁই পাবে না। তোমাদের ভাগ্যলিপিতে তখন মুসলমানদের গোলামি বা রোম সাগরে ডুবে মরার নিয়তি লিখে দেয়া হবে।...

'আজ সবা শপথ করো, এই মুষ্টিমেয় মুসলিমগুলোকে রক্তাক্ত করে শুকনো ধুলি বালিকে সিক্ত করে দেবে তোমরা।

পুরো সেনাবাহিনী ঈসা মসীহের নামে শ্লোগান মুখর হয়ে শপথ করলো। তাদের বিজয় হবে– না হয় প্রাণ যাবে।
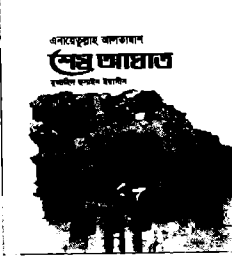
সূর্য যখন মাথার উপর উঠে এলো তখন দুই পক্ষের সেনা দল পরস্পর মুখোমুখি হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো।

আমর ইবনে আস (রা.) মধ্যভাগের সেনাদলে ঘোড়সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওদিকে থিয়োডরও তার সেনাদলের মধ্যেভাগে ঘোড়সওয়ার হয়ে প্রস্তুত।

আমর (রা.) এর কথায় তার এক মুহাফিজ সওয়ার সামনে অগ্রসর হয়ে উঁচু আওয়াজে রোমীয়দেরকে বললো,

'হামলার শুরু তোমরাই কর। যাতে পরে তোমাদের আফসোস না হয় যে, আরবরা আমাদেরকে সুযোগই দেয়নি'।

মুহাফিজ সওয়ার তার ঘোষণা শেষ করতে না করতেই থিয়োডর হামলার হুকুম দিয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমর ইবনে আস (রা.) এর পূর্ব নির্দেশ মতো পার্শ্বব্যুহের সৈন্যরা আরো অধিক ডানে ও বামে চলে গেলো।

সিপাহসালার দেখে নিয়েছেন, রোমীয়রা পুরো শক্তি সমবেত করে হামলে পড়ছে। আগ থেকেই তিনি এমনটা আশা করছিলেন। তাই সে অনুযায়ী তিনি তার সেনাদেরকে এ পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তার নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন।

মুসলমানদের দুই পার্শ্বব্যুহের দলগুলো যখন আরো অধিক তাদের আওতার বাইরে চলে গেলো তখন বাধ্য হয়েই রোমীয় সাওয়ারদেরও ছড়িয়ে পড়তে হলো। সিপাহসালার এটাই চাচ্ছিলেন।

আমার ইবনে আস (রা.) সামনের দিকে ধেয়ে আসা রোমীয়দের মুখামুখি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের নেতৃত্বাধীন ইউনিটগুলোকে বললেন,

'হামলা রুখো আর ধীরে ধীরে পিছু হটো। যাতে দুশমন আরো সামনে এগিয়ে আসে'।

সেখানকার জমি এমনিই মরুর মতো বালি মাটির। তাই দু'পক্ষের হাজার হাজার ছুটন্ত ঘোড়ার উৎক্ষিপ্ত ধূলি কনাগুলো মরু ঝড়ের অন্ধকার নামিয়ে দিলো। এই ধুলি ঝড় আর ধোয়াটে পরিবেশ সবাইকে গ্রাস করে নিলো। কখনো কখনো শত্রু-মিত্র চেনাই মুশকিল হয়ে উঠতে লাগলো।

মুজাহিদদের যে ইউনিটগুলো ডানে বামে ছড়িয়ে পড়েছিলো তাদের সালার তাদেরকে দুশমনের পার্শ্ববুহ্যে নিয়ে গেলো এবং পার্শ্বব্যূহ্য দিয়ে হামলা করলো। এতে রোমীয় সৈন্যরা অপ্রস্তুত অবস্থায় হামলার শিকার হয়ে দিশেহারা হয়ে গেলো।

মুসলিম সেনাদের পক্ষে আরেকটি ফায়দা হলো এই, রোমীয়দের দুই পার্শ্বব্যূহ্যের ইউনিটগুলোর চাপে সৈন্যরা ভিতরের দিকে এক জায়গায় সরে আসতে লাগলো। এতে তাদের দিক বদল ও পার্শ্ব বদল করে হামলা রুখবার যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা রইলো না।

তাদের ঘোড়াগুলো সামনে পেছনে ও ডানে বামে পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দিক বিদিকে হয়ে উঠতে লাগলো।

শত্রু সংখ্যা খুব বেশি হলে তাদেরকে এ ধরনের চাল দিয়ে তাদের সব পরিকল্পনা এলোমেলো করে দেয়া যায়। কিন্তু তারপরও শত্রু দল সংখ্যায় এত বেশি ছিলো যে, মুসলিম বাহিনীর ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার হতে দেখা গেলো।

কারণ, থিয়োডরও খুব বুদ্ধিদীপ্ত চাল চালছিলো। তার দিক নির্দেশনাগুলো বড় দ্রুত অন্য জেনারেলদের কাছে পৌছে যেতে লাগলো।

নিজের সেনাদলকে এভাবে এলোমেলো ও কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত দেখে থিয়োডর তাদেরকে পিছু হটিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিলো।

মনে হতে লাগলো, রোমীয়রা যে শপথ করেছিলো তা যেন আজ পূর্ণই হয়ে যাবে।

থিয়োডর সৈন্যদেরকে পিছু হটিয়ে যে পূর্ণ দমে হামলা করলো সেটা ক্রমেই সাফল্যের দিকে মোড় নিতে লাগলো।

প্রচণ্ড ধূলি উৎক্ষেপণের মধ্যেই সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে লাগলো। সে সময় মুজাহিদরা রোমীয় সেনাদলের ভেতরের দিকে সরে যেতে লাগলো। এই সময় তাদের পেছন থেকে কেয়ামত ভেঙ্গে পড়লো তাদের ওপর।

এটা ছিলো বনুওয়াইয়লের পর্বতগুলোয় লুকিয়ে থাকা বাছাইকৃত পাঁচশত আত্মত্যাগী মুজাহিদ। যারা সামান্য ইঙ্গিতের অপেক্ষা করছিলো।

সময় মতো আমর ইবনে আস (রা.) তাদের দিকে দূত ছুটিয়ে দিলেন যে, পয়গাম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ওরা রোমীয়দের পেছন থেকে হামলা করে।

রোমীয়রা মনে করলো এটা মুসলমানদের নতুন কোন সেনাদল, যারা পেছন থেকে হামলা করেছে। রোমীয়দের মধ্যে আগে যে ভয়-আতঙ্ক বিস্তার করছিলো এবং যেটা থিয়োডরের জ্বালাময়ী ভাষণ ও তাদের কঠিন সংকল্প এতক্ষণ যেটা চাপা দিয়ে রেখেছিলো সেটা আরো ভীষণ হয়ে তাদেরকে চেপে ধরলো।

রোমীয়রা এবার টলে উঠলো। দলে দলে সৈন্য পালাতে লাগলো উম্মেদানীনের দিকে। রোমীয়দের সারিবদ্ধতা ও সেনা বিন্যাস ভেঙ্গে পড়লো। তারা আতঙ্কিত ভেড়ার পালের মতো পালাতে লাগলো উম্মেদানীনের দিকে।

যেই ওরা উম্মেদানীনের পাহাড়ের কাছাকাছি দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাগুলোর গুহায়, খাঁজে, বিভিন্ন আড়ালে লুকিয়ে থাকা পাঁচশ আত্মত্যাগীর দ্বিতীয় দলটি তাদের ওপর টুটে পড়লো।

এখন তো রোমীয়দের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেলো, মুসলমানরা তিনটি সেনাবাহীন নিয়ে আক্রমণ করেছে।

ওরা এতই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো যে, কোন জেনারেল বা কমাণ্ডারের কথা শুনতে প্রস্তুত রইলো না তারা। প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে সব রকম চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু জানবায মুজাহিদরা তাদেরকে অঘোরে মারতে লাগলো।

খুব কম রোমীই এদিক দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলো।

এধরণের চাল চালতেন হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)। বিখ্যাত সব ঐতিহাসিকরাই একমত হয়েছেন, আমর ইবনে আস (রা.) রণকৌশল, ক্ষিপ্রতা, চরম বুদ্ধি ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়ার ব্যাপারে পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের (রা.) সমতুল্য। দুজনের অভিধানেই ভয়-ডর বলতে কোন শব্দ স্থান পায়নি কখনো।

পালিয়ে আসা অনেক রোমীয় সেনা ব্যবিলনের কেল্লাগুলোয় গিয়ে আশ্রয় নিলো। ব্যবিলনে অনেক রোমীয় সেনা রিজার্ভ রাখা ছিলো। তারা যখন শুনলো মুসলমানদের কাছে তারা কি চরমভাবে কচু কাটা হয়েছে তখন তো তারাও ব্যবিলন থেকে পালাতে শুরু করলো।

সেদিকে নীল দরিয়ার তীরে অসংখ্য নৌকা বাঁধা ছিলো। তারা নৌকা নিয়ে নদী পার হয়ে যেতে লাগলো।

মুকাওকিস ব্যবিলনে বসে তার সেনাদের এই করুন অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি নিজেকেই সামলে নিতে পারছিলেন না। তার সৈন্যদেরকে যে

তিনি পালাতে বাধা দেবেন সে বুদ্ধিবলও তিনি খুইয়ে ফেললেন। তার কাছে মনে হলো, কাউকে বাঁধা দিতে গেলেই তাকে হত্যা করা হবে।

আমর ইবনে আস (রা.) যদি তখন ব্যবিলন হামলা করতেন তাহলে হয়তো আরো সাফল্য পেতেন কিন্তু গোয়েন্দরা তাকে আগেই জানিয়ে রাখে, ব্যবিলনে তাজাদম বিশাল সংখ্যক সেনা প্রস্তুত রেখেই থিয়োডর খোলা ময়দানে বের হন। সম্ভাব্য পরিস্থিতি ও পরিণতি ভেবেই থিয়োডর ও মুকাওকিস এসতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কারণ, রোমীয়রা রনাঙ্গণ থেকে পিছু হটলে মুসলমনারাও ব্যবিলনের ওপরও চড়াও হতে পারে। এসম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য ব্যবিলনে মজুদ রাখেন।

আমর (রা.) অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন, ব্যবিলনের ওপর শক্তি ক্ষয় না করে যেসব রোমীয় সেনা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় খুঁজতে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া করে তাদের নিস্তার ও রেহাই দেয়া হবে না।

অনেক রোমীয় সেনা তো ইস্কান্দারিয়ায় পালিয়ে গেছে। মুসলিম সেনারা আরো দু একটি কেল্লা বিনা লড়াই ও বিনা রক্ত পাতে নিয়ে নিলো।

তবে মুসলমানদের বিজয় যেটা হয়েছে, সেটা হলো, পুরো রোমীয় বাহিনীতে এরকম এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এখন এই বাহিনী বেশ কিছু দিন লড়াইয়েরও যোগ্য থাকবে না।
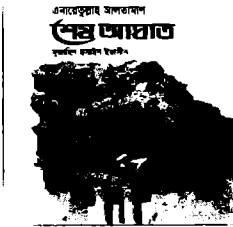
এখন হেরাকল মুকাওকিসকে মোটেও ক্ষমা করবেন না। শহর ও কেল্লা যদিও এখনো জয়ী হয়নি। কিন্তু মুসলমানরা খোলা ময়দানে যে জয় পেলো এতে নীল নদের উভয় প্রান্তে মুসলমানদের দখলে আসার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে।

অথচ মুকাওকিস সব সময় হেরাকলকে এ নিশ্চয়তা দিয়ে এসেছে, আরবের যাযাবরদেরকে নীলনদ পর্যন্ত পৌছতেই দেবেন না।

এদিকে আয়নুশশামস যুদ্ধে রোমীয় সেনারা যেভাবে ছিন্ন ভিন্ন ও বিশৃঙ্খল হয়ে পালিয়ে যায় এতে ফিউম এর পুরো এলাকা রোমীয় সেনা শূন্য হয়ে পড়ে। মিসরের একটি প্রদেশের মতো এই এলাকার পরিধি ও বিস্তৃত।

আমর ইবনে আস (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে পুরো এলকা নিজের দখলে নিয়ে নেন।

মুসলমানদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে শহরের বিভিন্ন দায় দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হলো। তারা এ এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করতে শুরু করে দিলো।

মুসলমানদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে এমন প্রভাব প্রতিপত্তি এত দিনে বিস্তার হয়ে গেছে যে, তারা কোন ধরনের টু শব্দ না করে ধার্যকৃত কর পরিশোধ করতে লাগলো। অবশ্য রোমীয়দের ধার্যকৃত করের চেয়ে তাদেরকে অনেক কম আদায় করতে হলো।

আমর ইবনে আস (রা.) দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব ও কর্মকর্তাদেরকে কঠিনভাবে নির্দেশ দেন, মানুষের অবস্থা ও সামার্থ্য দেখে কর আদায় করবে। কেউ যেন কোন ধরনের অভিযোগ করার সুযোগ না পায়।

মুকাওকিস জানতেন এই পরাজয়ের খবর শুনে হেরাকলের প্রতিক্রিয়া ভীষণ হবে। কিন্তু এখন আর হেরাকলকে নিয়ে মুকাওকিস এত ভীতু নন। কারণ, হেরাকলের ব্যাপারে তিনি চিরস্থায়ী এক ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

তাই তিনি এই পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে বযনতিয়ায় এক পত্রদূত পাঠিয়ে দিলেন।
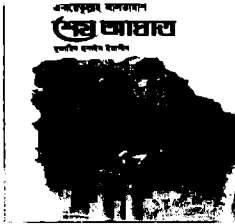
মুকাওকিসের পাঠানো সেই দুই লোক সেই মেয়েকে নিয়ে ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছলো। বযনতিয়ার জাহাজ ইস্কান্দারিয়া বন্দর থেকেই পাওয়া যায়। লোক দুজন খুব সাধারণ পোশাক পরে রেখেছে।

মেয়েটির পোশাকও খুব নিম্ন শ্রেণীর। তার মাথা ও চেহারা এমনভাবে ঢেকে রেখেছে, তার শুধু চোখই দেখা যাচ্ছে। এদের জাহাজ দুদিন পর রওয়ানা হবে।

ওরা একটা সরাইখানায় উঠলো। সরাইখানাটি নৌবন্দরের একেবারে কাছেই। জাহাজের জন্য অপেক্ষামান যাত্রীরাই এখানে অবস্থান করে। জাহাজ রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলে জাহাজের লোক এসে সরাইখানায় জানিয়ে যায় যে, অমুক সময় জাহাজ রওয়ানা হবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও ক্রুরা সরাইখানাতে খাবার দাবারের কাজ সারে।

বযনতিয়াগামী জাহাজ আর একদিন পর গন্তব্যে রওয়ানা দেবে। এর এক দিন আগে জাহাজের ক্যাপ্টেন সরাইখানায় এলো। এসময় ক্যাপ্টেন সরাইখানায় এলে সবাই বেরিয়ে আসে। খবর পেয়ে যাত্রীরা সব বেরিয়ে এলো।

ঘটনাক্রমে ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে দেখে ফেললো। তখন মেয়েটির মুখ নেকাবে আবৃত ছিলো না। এমন সুন্দরী মেয়ে দেখে ক্যাপ্টেন চমকে উঠলো। লোকজন ক্যাপ্টেনকে ঘিরে জিজ্ঞেস করছিলো জাহাজ কবে কখন ছাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই ক্যাপ্টেন আর তখন মেয়েটিকে কিছু বললো না।

জাহাজের ক্যাপ্টেনরা তখন নিজেদেরকে রাজা বাদশাহর মতো অতি ক্ষমতাবান মনে করতো। এদের অধিকাংশ হতো দুশ্চরিত্রের। মেয়েটির ওপর আসলে ক্যাপ্টেনের কুদৃষ্টি পড়লো।

ক্যাপ্টেন চলে যাওয়ার পর জাহাজ থেকে আরেকটি লোক এলো সরাইখানায়। জাহাজের যাত্রীদের মাঝখানে সে ঘুরতে ফিরতে লাগলো। এক সময় মেয়েটিকে দেখতে পেলো সেই দুই লোকের সঙ্গে। লোকটি ওদের সঙ্গে কৌশলে আলাপ জমিয়ে ফেললো।

কথায় কথায় লোকটি জানালো সে জাহাজের লোক এবং তাদের এই কমবয়সী মেয়েটি জাহাজে যেতে পারবে না। কারণ, এই জাহাজে কোন কমবয়সী মেয়ে যেতে পারবে না। পরবর্তী জাহাজে যেতে পারবে। সে জাহাজ ছাড়তে আরো এক মাস সময় লাগবে।

লোক দুজন বেশ চিন্তায় পড়লো। এরা যে গর্ভনর মুকাওকিসের লোক একথাও গোপনীয়তার খাতিরে বলতে পারছিলো না।

মুকাওকিস তাদেরকে বিশাল অঙ্কের টাকা পয়সা দিয়েছেন মেয়েটিকে হেরাকল পর্যন্ত পৌছে দিতে। একাজ ওরা যত তাড়াতাড়ি করবে তত তাড়াতাড়ি ওদের মুক্তি এবং আরো পুরস্কারস্বরূপ টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয়া।

এজন্যে ওরা মোটেও দেরি করতে চাচ্ছিলো না। উপায়ান্তর না দেখে লোক দুজন জাহাজের লোকটিকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করে। যাতে মেয়েটিকে জাহাজে ঠাই করে দেয়।

'অনেক কঠিন কাজরে ভাই;' জাহাজের লোকটি তার ঘুষের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বললো, 'ওকে পুরুষালী পোশাক তো পরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে; কিন্তু এমন দীর্ঘ সফরে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা বড় কঠিন কাজ হবে। ক্যাপ্টেন খুবই জালিমবাজ মানুষ। এই মেয়েকে দেখলে সমুদ্রে ফেলে দেবে।'

ওরা যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে এই মেয়েকে কেন জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না এবং এটা কার হুমুক বা কার আইন, এ চিন্তা তাদের মাথায় এলো না। তাদের মাথা তো মুকাওকিসের দেয়া কাড়ি কাড়ি টাকা খেয়ে ফেলেছে।

ওরা ঘুষের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিয়ে হাত জোড় করে অনুনয় করতে লাগলো, জাহাজে লুকিয়ে রাখার কাজটাও যেন সে করে।...

তারপর লোকটির কথায় মেয়েটিকে আড়ালে পুরুষদের পোশাক পরানো হলো। এবং এমন করে মাথা ও মুখের প্রায় সবটাই ঢেকে ফেললো যেমন মরু বা অন্যকোন সফরে মানুষ ধূলো বালি থেকে বাঁচার জন্য ঢেকে রাখে। লোকটি দেখে বললো হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।

'তবে আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলে দিচ্ছি। জাহাজের লোকটি বললো, 'আমি মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখতে সবরকম চেষ্টা করবো। কিন্তু ক্যাপ্টেন যদি কোনভাবে জেনে যায় বা মেয়েটিকে দেখে ফেলে তাহলে কিন্তু এর দায় দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না। তখন ক্যাপ্টেনকে রাজি করা বা তার শাস্তি থেকে বাঁচার কাজ তোমাদের।'
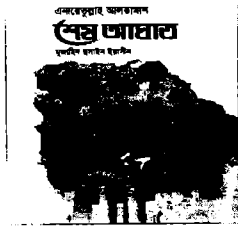
পর দিন যাত্রীরা জাহাজে উঠে পড়লো। সেই মেয়েটিকে নিয়ে লোক দুজনও উঠে পড়লো। জাহাজের লোকটি মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে গেলো যেখানে জাহাজের বিশাল পাল গুটিয়ে রাখা হয়। জায়গাটা একটু গভীর।

মেয়েটিকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে তার ওপর একটি পালের সামান্য কাপড় টেনে দিলো। বললো, এভাবেই নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।

'জাহাজ গন্তব্যে পৌঁছতে কত দিন লাগবে?' মেয়েটি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো'।

'সাধারণত দশ বার দিন লাগার কথা; লোকটি বললো, 'তবে এটা নির্ভর করছে বাতাসের ওপর। বাতাস যদি অনুকূলে ও তীব্র থাকে তাহলে জাহাজের গতিও তীব্র থাকবে। আর বাতাস যদি দুর্বল থাকে তাহলে পনের বিশ দিনও লেগে যেতে পারে। আর ঝড় তুফানের কবলে পড়লে তো জাহাজ কোথায় নিয়ে যাবে সে খোদাই জানেন।'

'আমি কি এত দিন এখানেই লুকিয়ে বসে থাকবো?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

'না; জাহাজের লোকটি বললো, 'তোমাকে তো চেনাই যাবে না। এজন্য সবসময় তোমার লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না। আমি তো তোমাকে একটা জায়াগা দেখিয়ে দিলাম, যদি লুকানোর মতো অবস্থায় পড়ো তাহলে এখানে এসে লুকিয়ে পড়বে।.....

দ্বিতীয় কথা হলো, ক্যাপ্টেন তো সবসময় আর বাইরে ঘুরে বেড়ায় না, দিনের বেলায় অনেক সময় ঘুমিয়ে নেয়। সে সময় তোমাকে আমি ছাদে পৌঁছে দেবো। নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারবে।'

মেয়েটিকে সেখানে বসিয়ে রেখে লোকটি সোজা ক্যাপ্টেনের কেবিনে চলে গেলো। তাকে জানালো মেয়েটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখে এসেছে। ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে তাকে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিলো।

জাহাজের নোঙ্গর উঠে গেলো। ক্রুরা জাহাজের পালগুলো খুলে দিলো। জাহাজ বন্দর থেকে সরে ধীরেধীরে খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সূর্য সমুদ্রের আরেক দিগন্তে যখন ডুবছিলো তখন জাহাজ থেকে কোথাও স্থলভাগের ছায়াও দেখা যাচ্ছিলো না। চার দিকেই সমুদ্রের অথৈ জলরাশি চোখে পড়ছিলো।

মেয়েটি এর মধ্যে তিনবার বাইরে বের হয়ে সমুদ্রের চোখজুড়ানো দৃশ্য উপভোগ করেছে। এটাই তার জীবনের প্রথম সমুদ্র ভ্রমণ। কয়েকবার তার সেই দুই লোকের সঙ্গেও দেখা করে এসেছে।

সর্বশেষ রাতের 'খাবার খেয়ে এসে তার জায়গায় শুয়ে পড়লো। এর মধ্যে সে লোকটিও একবার এসে তাকে নিশ্চয়তা দিয়ে গেছে। তার কোন ভয় নেই। এখানে নির্ভয়ে ঘুমুতে পারে।

জাহাজের যাত্রীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জাহাজের ডিউটি ক্রুরা জেগে আছে। ক্যাপ্টেন তখন তার কেবিন থেকে বেরোলো। সোজা চলে এলো মেয়েটি যেখানে লুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে সেখানে। এসেই মেয়েটির পায়ে হালকা খোঁচা মারলো।

হড়বড় করে উঠে বসলো মেয়েটি।

'কে তুমি? এখানে কেন শুয়ে আছো?' ক্যাপ্টেন খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো।

ক্যাপ্টেন মেয়েটির হাত ধরে দাঁড় করালো। তারপর তার মাথায় জাড়নো কাপড়টি এক ঝটকায় ফেলে দিলো। মেয়েটির মাথা ভর্তি চুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়লো। তার পোশাক যদি ও পুরুষালী; কিন্তু সে তো তার গলার স্বর পুরুষালী বানাতে পারতো না।

'আমাকে ধোকা দিচ্ছো?' ক্যাপ্টেন ক্রুদ্ধ হয়ে বললো এবং মেয়েটিকে টেনে হেচড়ে খোলা জায়গায় নিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'একা, না সঙ্গে কেউ আছে?'
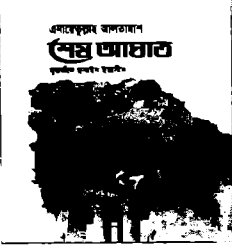
ক্যাপ্টেন তো জানতোই তার সঙ্গে দুজন লোক আছে। ভাব দেখালো এমন, যেন সে কিছুই জানে না।

মেয়েটি জানালো তার সঙ্গে দুজন লোক আছে। জাহাজের এক লোক যে তাকে ঘুষ খেয়ে এই পোশাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছে একথা বললো না মেয়েটি।

'আমি তোমাকে সমুদ্রে ফেলে দেবো।' ক্যাপ্টেন এক ঝটকায় মেয়েটিকে কাছে নিয়ে এলো।

মেয়েটি তো তার রূপ যৌবনের ব্যাপারে জানতো। জানতো পুরুষের দুর্বলতা কোনটি তাও। কীভাবে পুরুষকে রূপ দিয়ে ঘায়েল করতে হয় এ বয়সেই সে এ অভিজ্ঞতা ভালোই অর্জন করেছে। এখন তো এটাই তার আদর্শ ও পেশা-নেশা হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন তাকে ঝটকা দিয়ে কাছে নিয়ে যেতেই মেয়েটি ইচ্ছে করেই ক্যাপ্টেনের বুকে গিয়ে পড়লো। তারপর এক হাতে ক্যাপ্টেনের গলায় জড়িয়ে ধরলো।

'আমাকে আলোতে নিয়ে গিয়ে দেখো। এমন দামি জিনিস কোন পাগল বা ছাগলই নষ্ট করতে পারে।' মেয়েটি ফিস ফিস করে বললো।

ক্যাপ্টেন তো এসেছেই ওকে কেবিনে নিয়ে যেতে। মেয়েটিকে সে হাত ধরে কেবিনে নিয়ে গেলো। সরাইখানায় তো দূর থেকে দেখেছিলো শুধু মুখটি। এখন যখন তার খোলা চুল, মুখ, স্ফীত বুক এত কাছ থেকে দেখলো তখন ক্যাপ্টেন ভেতর ভেতর কেঁপে উঠলো।

ক্যাপ্টেন বুঝতে পারলো, এ মেয়ে শুধু দামীই নয়, কোন রাজা বাদশাহর হেরেমেই এ মেয়েকে শোভা পায়।

'দেখো মেয়ে!' ক্যাপ্টেন বললো, 'এটা মরার বয়স নয়। তোমার ব্যাপারে যত বিপদ আসুক আমি সামলে নেবো। এখন থেকে তুমি আমার এই কেবিনেই থাকবে। তোমার জন্য আমি শাহেনশাহে হেরাকলের আইন অমান্য করছি।'

ক্যাপ্টেন মদের বোতল বের করলো। নিজেও পান করলো। মেয়েটিকেও দিলো। নিঃসঙ্কোচে মেয়েটি মদ পান করতে লাগলো।...
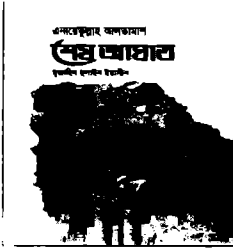
সকালে ক্যাপ্টেন মেয়ের সেই দুই সঙ্গীকে ডেকে এনে ধমকে বললো, ওরা তাকে ধোকা দিয়েছে। কিন্তু মেয়েটিকে তার এতই সাধা সিধে আর নিষ্পাপ মনে হয়েছে যে, তার প্রতি দয়া এসে গেছে। না হয় পরবর্তী বন্দরে তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতো এবং কঠিন শাস্তি দিতো এখন আর কোন অসুবিধা নেই। মেয়েটিকে সে নিজেই লুকিয়ে রাখবে।

লোক দুজন চুপচাপ থাকলো। ওদের এ নিয়ে মাথা ব্যাথা ছিলো না যে, মেয়েটি জাহাজে কোথায় থাকবে- না থাকবে।

তারপর তিন চার দিন হলো মেয়েটি ক্যাপ্টেনের কেবিনে আছে। এখন সে তার মেয়েলি পোশাকই পড়েছে। ক্যাপ্টেন এখন তাকে খুব উপাদেয় খাবার খাওয়ায়। তার সঙ্গে মেয়েটি এখন একেবারেই সহজ হয়ে গেছে। দুজনই এখন দারুন আমোদ ফূর্তিতে আছে।

একদিন মেয়েটি একটু বেশিই মদ গিলে ফেললো। মধ্যবয়স্ক ক্যাপ্টেন এমনিতেই বেশ হাসি খুশি মানুষ। ক্যাপ্টেন মদ খেয়ে মাতাল না হলেও মেয়েটি প্রায় মাতাল হয়ে পড়লো। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। ক্যাপ্টেন কথায় কথায় তার রূপ যৌবনের বেশ তারিফ করলো।

'তুমি তো শুধু আমার রূপই দেখেছো।' মেয়েটি নেশাকাতর গলায় বললো, 'যখন শুনবে হেরাকল কতল হয়ে গেছে তখন তুমি বুঝতে পারবে আমি শুধু সুন্দরীই নই, বরং যাকে ইচ্ছা তার প্রাণও নিয়ে নিতে পারি, সেটা কিসরায়ে রোম হেরাকলেরই হোক না কেন।'

ক্যাপ্টেন হো হো করে হেসে উঠলো। মনে করলো, মাতাল হয়ে এমনিই ঠাট্টা করছে। মেয়েটি তার হো হো হাসি শুনে গম্ভীর হয়ে গেলো।

'তুমি কি ভেবেছো?' মেয়েটি গ্রীবা বাকিয়ে বললো,' 'হেরাকলকে আমি আসলে বিষ খাওয়াতে যাচ্ছি। ঐ দু জন লোক আসলে আমার মুহাফিজ, দেহরক্ষী। আমি মিসরে ফিরে এলে তখন দেখে নিও আমি কত বড় ধনভাণ্ডারের মালিক বনে যাবো। মিসরের বর্তমান গর্ভনরই সেটা আমাকে দেবেন।'

এবার ক্যাপ্টেন একটু চিন্তায় পড়লো। ক্যাপ্টেনকেও নেশায় ধরেছে। কিন্তু এই মধ্য বয়সে এসে মদের নেশা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির ওপর এতটা প্রভাব ফেলতে পারে না।

তা ছাড়া সে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ এক মদ্যপায়ী লোক। মেয়েটি তো সে তুলনায় অনেক আনাড়ী। অল্প মদেই নেশাকাতর হয়ে যায় এবং সাধারণ বিবেক বুদ্ধি হারিয়ে বসে। এজন্য ভেতরের গোপন কথাও গর্বভরে ফাস করে দেয়।
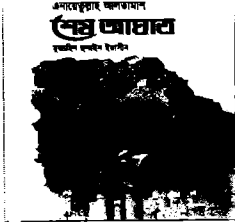
ক্যাপ্টেন অনুভব করলো, মেয়েটি নেশার ঘোরে কথাটি বললেও অতি সত্য ও গোপন কথাই বলছে, তাই এটা খুঁচিয়ে ভেতরের কথা সব বের করতে হবে।

'হেরাকলকে কেউ হত্যা করতে পারবে না।' ক্যাপ্টেন বললো তাকে উস্কে দেয়ার উদ্দেশ্যে, 'আমি নিজেই তো চাই, হেরাকলকে হত্যা করতে। কিন্তু আমার মধ্যে এত সাহস নেই যে, হেরাকলকে হত্যার জন্য তার দরবার পর্যন্ত পৌছবো।'

'আমি তো হেরাকলেরই কাছে যাচ্ছি' মেয়েটি মাদকীয় গলায় বললো, 'দেখবে কি করে তার দরবার পর্যন্ত পৌছে যাই।'

'কি করে পৌছবে?'

'তুমি তো আমাকে অতি গরিবের পোশাকে দেখেছো। আমার আসল পোশাক আমার মাল পত্রের ব্যাগে আছে।' সেটা দেখলে বুঝতে পারবে আমি কত উঁচু শ্রেণীর মেয়ে।

আমার সঙ্গের দুজন লোকও সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। এরা কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ নয়। এরা শাহেনশাহে মুকাওকিসের অতি কাছের ও বিশ্বস্ত লোক। আমরা এই পোশাকে এজন্য বের হয়েছি যাতে আমাদের প্রতি কারো নজর না পড়ে।'

'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না। হেরাকল পর্যন্ত পৌছবে কি করে?'

'খুব সহজে। এই দুজন আমাকে হেরাকলের কাছে 'তোহফা' হিসাবে পেশ করবে। মুকাওকিস হেরাকরের স্বভাবচরিত্র কেমন তা জানিয়ে দিয়েছেন। আমি তার শরাবে সামান্য বিষ ঢেলে দেবো।'

'বিষ আনবে কোত্থেকে?'

'বিষ তো সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মাল পত্রেই রাখা আছে বিষ।'

এই ক্যাপ্টেন একজন রোমী। হেরাকলের ভীষণভক্ত। ভক্ত না হলেও তার সামনে অনেক বড় পুরস্কারের ঝুলি দুলে উঠলো।

সে ফয়সালা করলো, এই মেয়েকে নিয়ে সে ঠিকই হেরাকলের কাছে যাবে এবং বলবে, মুকাওকিস তোমাকে বিষ দিতে এই মেয়েকে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়েছেন।

পর দিন সকালে সেই মেয়ের সঙ্গী দুজনকে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তিন চারজন ক্রু ধরে বেঁধে জাহাজের ছোট একটি কুঠুরীতে নিয়ে বন্দি করে রাখলো। মেয়েটি কিছুই জানতে পারলো না।

ক্যাপ্টেন একবার ভাবলো, মেয়েটিকেও বন্দি করে রাখবে। তারপর চিন্তা এলো, এরা তিনজন তো তাহলে হেরাকলের সামনে গিয়ে বলবে, ক্যাপ্টেন মিথ্যা বলছে। সে নিজেই তাদের মালপত্রে এই বিষ রেখে দিয়েছে।

কারণ, এই মেয়ে অর্থাৎ তাদের বোনের প্রতি তার কুদৃষ্টি পড়ে এবং তাকে তার কেবিনে রাখতে চায়। তারা এর প্রতিবাদ করার কারণে ক্যাপ্টেন এই ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে।

এখন মেয়েটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে হাত করে ফেলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তারপর থেকে ক্যাপ্টেন মেয়েটির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট ও আন্তরিকভাবে মিশতে শুরু করলো। মেয়েটির অনাড়ীপনার কারণে ক্যাপ্টেনের প্রতারণাই জয়ী হলো।

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই মেয়েটি ক্যাপ্টেনের এমন ভক্ত হয়ে গেলো যে, ক্রমেই তা হেরাকলের ভক্ততে রূপান্তরিত হয়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন মেয়েটিকে একথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলো যে, সে হেরাকলের কাছে সব কিছু স্বীকার করলে হেরাকল তাকে এতই ধন রত্ন দেবেন যে, মুকাওকিসের নামও ভুলে যাবে সে। তারপর সে চাইলে হেরাকল তাকে প্রিয় সম্রাজ্ঞী বানিয়ে নেবে।

ক্যাপ্টেন তাকে এমন সুন্দর-মনোরম এক স্বপ্ন দেখিয়েছে, মেয়েটি তার সামনে তার সব চতুরতা বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পন করলো, হ্যাঁ, সে হেরাকলের সবকিছু বলে দেবে।
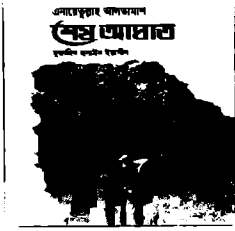
কোনরকম অ ঘটন বা ঝড়-তুফানের কবলে না পড়েই জাহাজ রোম সাগরের কেন্দ্রীয় বন্দরে গি য়ে পৌঁছলো। ক্যাপ্টেন নির্বাহী আইনের ক্ষমতাধারী লোক। সবাই নেমে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন দুচার জন স্থানীয় পুলিশ ডাকিয়ে এনে দুই বন্দিকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো। তারা তাদেরকে বযনতিয়া নিয়ে যাবে।

বন্দি দুজনের হাত পা শিকলে শক্ত করে বাঁধা। তারা দুজন কেঁদে কেঁদে ক্যাপ্টেনের কাছে মিনতি করতে লাগলো তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। তারা এই মেয়ের ব্যাপারে টু শব্দটি না করে এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের নির্দয় মন এতে গললো না।

চোখের ইশারায় ক্যাপ্টেন পুলিশদেরকে চলে যেতে নির্দেশ দিলো।

চার দিন পর ওরা বযনতিয়া পৌঁছলো। ক্যাপ্টেন সোজা হেরাকলের রাজ মহলে চলে গেলো। ভিতরে খবর পাঠালো অমুক জাহাজের ক্যাপ্টেন অতি জরুরি কাজে দেখা করতে এসেছে।

ভেতরে খবর পাঠানোর পরক্ষণেই জবাব এলো, কিছুক্ষণ আগে মিসর থেকে এক পত্রদূত এসেছে। পত্রদূত বিদায় নিলেই ক্যাপ্টেন ভেতরে যেতে পারবে। তবে যখন ক্যাপ্টেন ভেতরে যাবে তখন যেন খুব সাবধানে কথা বলে। কারণ, হেরাকল এই মাত্র আসা পত্রপাঠে দারুন রেগে আছেন।

'আয়নুশশামস' এর ময়দানে মুসলমানদের কাছে রোমীয়দের শোচনীয় পরাজয়ের খবর নিয়ে এসেছিলো মুকাওকিসের পত্রদূত। এটা পড়ে তো হেরাকল চরম অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন।

অনেক্ষণ পর ক্যাপ্টেনকে ভেতরে ডেকে পাঠালো। হেরাকল তাকে দেখেই গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করলেন,

'কি নিতে এসেছো?...তোমার জাহাজ ডুবে গেছে? তোমাকে নতুন আরেকটি জাহাজ বানিয়ে দেবো?'

'না কিসরায়ে রোম!' ক্যাপ্টেন বললো, হাতজোড় করে, 'আমি কিছু নিতে আসিনি। দিতে এসেছি। আমি সালতানাতে রোমকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচাতে এসেছি।'

'সালতানাতে রোমের ডুবতে আর কতটুকু বাকি আছে? ঠিক আছে, কি বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বলো।' হেরাকল গজবভড়া কণ্ঠে বললেন।

'শাহেনশাহে মিসর মুকাওসিক আপনার অতি সুন্দরী ও মূল্যবান এক মেয়েকে উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই মেয়ে আপনার মৃত্যুর মত আকর্ষণীয় এক ফেরেশতা হয়ে এসেছে। নিজের রূপ-যৌবন ও অতি মনোলোভা দেহের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্য বিষের পুড়িয়াও নিয়ে এসেছে।

হুকুম হলে সেই মেয়েকে ও তার সঙ্গে আসা লোক দুজনকে আপনার সামনে হাজির করা হবে।'

'এখনই হাজি করো।' হেরাকল হুকুম দিলেন।

ক্যাপ্টেন বাইরে গিয়ে মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে এলো। মেয়েটি এখন তার স্বাভাবিক পোশাক পড়ে আছে। হেরাকল তাকে দেখে অপলক তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কিসরায়ে রোমকে শোনাও, তোমাকে কে এবং কি কারণে পাঠিয়েছে?' ক্যাপ্টেন সে মেয়েকে বললো।

মেয়েটি হেরাকলকে বিস্তারিত সব শোনালো, মুকাওকিস কেন এবং কার সঙ্গে তাকে পাঠিয়েছে। বিনিময়ে কি দিয়েছে এবং কাজ শেষ হলে আরো কি দেবে সব জানালো মেয়েটি।

'সে লোক দুজনকেও হাজির করো।' হেরাকল হুকুম দিলেন।

পায়ে শিকল হাতে হাত কড়া অবস্থায় লোক দুজনকে সেখানে উপস্থিত করা হলো।

'তোমরা কি এই মেয়ের মুহাফিজ হয়ে এসেছিলে?' হেরাকল ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'যদি মিথ্যা বলো এবং আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করো তাহলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।'...

দুজনই মাথা নিচু করে সব কিছু স্বীকার করলো।

হেরাকল তো এমনিই ফেরাউনি মেজাযে সব সময় ক্রুদ্ধ থাকে। তারপর মুকাওকিসের পরাজয়ের খবর তাকে আগুনের গোলা বানিয়ে দিলো। আর এখন তো আরো নিষ্ঠুর-নর পিচাশের মতো মুখভঙ্গি করলো আক্রোশে ফেটে পড়ে।

'শাহেন শাহে রোম! সে দুই লোকের একজন বড় করুন সুরে বললো, 'আমরা তো মুকাওকিসের হুকুম টলাতে পারতাম না। আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি আমাদের জল্লাদের হাতে হাওলা করে দিতেন। এ দিকে আপনিও একই শাস্তি দেয়ার কথা বলছেন।

'আমরা আপনাদের হুকুমেই তো সবকিছু করি। আপনাদের হাতেই তো আমাদের জীবন-মরণ। আমরা এখন আমাদের প্রাণ ভিক্ষা ছাড়া আর কি চাইতে পারি। আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। ওয়াদা করছি আর কখনো আমরা মিসর ফিরে যাবো না। আপনার গোলাম হয়ে থাকবো।'
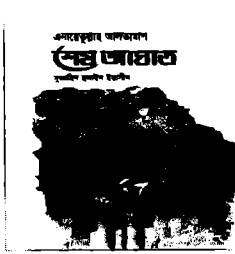
'তোমরা আমার প্রাণ নিতে এসেছিলে।' হেরাকল মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসি লুকিয়ে বললেন, 'আর আমি তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেবো? আমাকে বেকুব ঠাওরিয়েছো? আমি জানি, মোটা অঙ্কের টাকা বখশিষ পাওয়ার লোভে আমাকে বিষ খাওয়াতে এসেছিলে তোমরা?'

হেরাকল তালি বাজালেন। বাইরে থেকে কয়েকজন মুহাফিজ দৌড়ে এলো।

'এই লোকদুজনকে নিয়ে যাও। এই মেয়েটিকেও। ওদেরকে জল্লাদের কাছে হাওলা করে দাও। তারপর এদের লাশ দূরে কোথাও ফেলে দাও।' হেরাকল ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে হুকুম করলেন।

এ হুকুম শুনে মেয়েটি চিৎকার করে উঠলো। ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললো,

মেয়েটি তো ইচ্ছে করেই সব ফাঁস করে দিয়েছে। এজন্য আপনি অনেক বড় চক্রান্ত থেকে বেঁচে গেছেন। ওর প্রতি রহম করুন। ওকে ক্ষমা করে দিন।

'এই মেয়ে অতি সুন্দরী এক কালনাগিনী' হেরাকল চোখে মুখে অভিজ্ঞতার গভীর ঝলক মাখিয়ে বললেন, 'সে মুকাওকিসের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের বখশিশ নিয়ে আমাকে বিষ পান করানোর ওয়াদা করে এসেছিলো। তারপর তাকে ধোকা দিয়েছে'।

....

'আমার হেরেমে রাখার মতো সব যোগ্যতাই ওর মধ্যে আছে। কিন্তু সে যে কোন সময় আমাকেও ধোকা দিতে পারে...ওকে নিয়ে যাও।'

মুহূর্তের মধ্যে তিন মুহাফিজ এসে তিনজনকে ধরে টেনে হেচড়ে বাইরে নিয়ে গেলো। মেয়েটির করুন চিৎকার আর্তনাদ শোনা যেতে লাগলো। ক্রমশ সেটা দূরে সরতে সরতে এক সময় মিলিয়ে গেলো।

'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো।' হেরাকল বাঁকা চোখে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন বাঁচিয়েছো? কিসের লোভে?'

'কারণ, আমি আপনার বলতে গেলে একান্ত শিষ্য। অনেক কৌশল খাটিয়ে ঐ মেয়ের কাছ থেকে এই গোপন তথ্য উদ্ধার করি।' ক্যাপ্টেন বললো।

'আমি অবশ্যই তোমাকে আমার প্রাণ বঁচানোর মূল্য দেবো।' হেরাকল একথা বলে হাত তালি দিলেন।

এক লোক দৌড়ে এলে হেরাকল এক হাকিমকে নিয়ে আসতে বললেন। একটুপর হাকিম এসে হাজির হলো।

'ওকে আমার প্রাণ বাঁচানোর পুরস্কার দিয়ে দাও। তবে আমার এই প্রাণ বাঁচানোর নাটক যাতে কেউ না জানে সেই ব্যবস্থাটুকুও করো।' হেরাকল হেসে রহস্যময় কণ্ঠে বললেন।

হাকিমও ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। ক্যাপ্টেন কিছু বুঝলো না। সে তো বিশাল অঙ্কের পুরস্কার পাওয়ার লোভে বিভোর। হাকিম ক্যাপ্টেনকে তার পেছন পেছন আসতে বলে হাটা দিলো।

তারপর হাকিম ক্যাপ্টেনকেও জল্লাদের হাতে তুলে দিলো।

'আমার প্রাণ বাঁচানোর মূল্য হেরাকল এটাই দিলেন যে, জল্লাদের হাতে তুলে দিলেন। শুনে নাও হাকিম! হেরাকলকে বলো, তার প্রাণ নিতেও জল্লাদরা প্রস্তুত হচ্ছে।' জল্লাদের হাতে মৃত্যুর আগে ক্যাপ্টেন হাকিমকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললো।
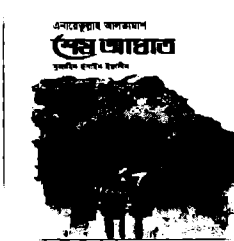
হেরাকলের মতো এমন ক্ষেপাটে ও রাজ্যহারা বাদশাহের বেলায় এটাই আশা করা যাচ্ছিলো যে, তিনি এখনই মিসরে হুকুম পাঠাবেন, মুকাওকিসকে পদচ্যুত করে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হোক। কিংবা মুকাওকিসকে এখনই বযনতিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হোক।

হেরাকরের মতো এমন ফেরাউন স্বভাবের বাদশাহর ব্যাপারে এ প্রত্যাশা কোনভাবেই করার কথা নয় যে, তিনি মুকাওকিসকে ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু রোমীয় এক ঐতিহাসিকের সূত্রে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনুল হাকাম লিখেছেন,

হেরাকল তারপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তিনি দু তিন জন উপদেষ্টা ও কয়েকজন জেনারেলকে ডেকে পুরো ঘটনা তাদেরকে শোনালেন। সবাই তো স্তব্ধ হয়ে গেলো।

'আমাকে এখন পরামর্শ দাও। আমার এখন কি করা উচিত?' হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন।

'এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুর চেয়ে কম আর কি হতে পারে?' এক উপদেষ্টা বললো।

অন্যরা সবাই একে সমর্থন করলো। তারপর একে একে প্রত্যেকে মুকাওকিসের বিরুদ্ধে বিষ ঢালতে শুরু করলো। তারপর সবাই একমত হয়ে পরামর্শ দিলো, মুকাওকিসকে এখানে ডাকিয়ে এনে হত্যা কার্যকরী করা হোক।

'না,' হেরাকল অপ্রত্যাশিত ভাবে বললেন,

'মৃত্যু তো কোন শাস্তি নয়। মরে গেলেই সব যন্ত্রণা শেষ। আমি ওকে জীবিত রাখবো এবং তাকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে দেশ থেকে বের করে দেবো। মৃতুর চেয়ে এ শাস্তি ভয়ঙ্কর। লাঞ্ছনা আর অপমান সয়ে মানুষ বেশিদিন বাঁচতে পারে না। ওকে আমি মিসরের বাদশাহ থেকে ভিখারি বানিয়ে দেবো।...

'যে লোকেরা দরবারে এসে তাকে সিজদা করতো তারা যেন তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।...

'আর এ অবস্থা তো সে নিজেই সৃষ্টি করছে। সে আরবদের হাতে মারা পড়বে। অথবা তাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবে। কিংবা সে নিজেই আমাকে এমন সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে যে, ওকে আমি দেশ থেকে বের করে দেবো।'...

'তোমরা তো দেখছোই, সে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করে নিচ্ছে। প্রায় অর্ধেক সেনা শেষ করে দিয়েছে। মুসলমানরা নীল নদের উভয় উপকূল দখল করে নিয়েছে। ওকে আমি এমনিতেই ক্ষমা করতে পারতাম না। তবে এখন এটা ওকে বুঝতে দেবো না যে, ও যে আমাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলো সেটা আমি জেনে গেছি।'

ও দিকে মুকাওকিস তো ব্যবিলন বসে হেরাকলের মৃত্যুর খবর শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন।

আর সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) তার সৈন্যদের নিয়ে মিসরের বিভিন্ন জায়গায় গেরিলা হামলা চালাচ্ছেন। তবে মুকাওকিসের একটা সফলতা অর্জিত হলো যে, বিনয়ামীনের ইঙ্গিতে কিবতী খ্রিস্টানরা রোমীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করেছে।
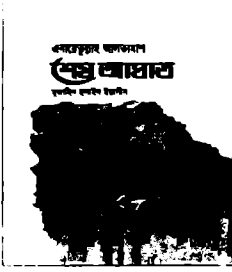
মুকাওকিস ও তার জেনারেল থিয়োডর ব্যবিলন কেল্লায় বসে হেরাকলের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। তাদের ধারণামতে এত দিনে ইতিবাচক নেতিবাচক যে কোন একটা সংবাদ পৌছে যাওয়ার কথা ছিলো। দিন যতই কেটে যেতে লাগলো তাদের অস্থিরতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগলো।

তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, অবস্থা অনুকূলে হলে হেরাকলের মৃত্যুর খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই মিসরে নিজেদের একক ক্ষমা গ্রহণের ঘোষণা দেবেন। এরা আসলে কিবতী বংশদ্ভূত খ্রিস্টান ছিলেন।

হেরাকলের নয়া খ্রিস্টধর্ম তারা প্রকাশ্যে এজন্য মেনে নিয়েছিলেন যে, মুকাওকিসকে হেরাকল মিসরে গর্ভনর বানিয়েছেন। আর থিয়োডর জেনারেল আতরাবুনের পরে প্রধান জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হবে।

এ ছাড়াও হেরাকল নিজেও জানতেন, মিসরের কিবতী খ্রিস্টানদের মধ্যে থিয়োডরের বেশ গ্রহণ যোগ্যতা রয়েছে। আবার মুকাওকিসের সঙ্গে থিয়োডরের বন্ধুত্ব রয়েছে। তাই এদের পেছনে কোন কারণ ছাড়া লেগে থাকাটা হেরাকল নিরাপদ মনে করতেন না।

অনেক দিন হয়ে গেলো, তারপরও কোন খবর এলো না। তাদের সন্দেহ হলো তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে।

'এটা ভুলে যাবেন না।' থিয়োডর বললো, 'যে মেয়েকে আমরা এমন ভয়াবহ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে পাঠিয়েছি সে কিন্তু আসলে এক বাজারি মেয়ে। আমার তো মনে হচ্ছে, হেরাকলের হেরেম তার পছন্দ হয়ে গেছে, আর মেয়েটিও অসম্ভব সুন্দরী ও কমবয়সী তাই হেরাকলও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন'।

মেয়েটি এই ধোকায়ও পড়ে থাকেত পারে যে, হেরাকল রোম ও মিসরের আজীবন বাদশাহ হয়ে থাকবেন। এজন্য হেরাকলের সাথে হাত মিলিয়েছে। আর নিজেকে মনে করছে সম্রাজ্ঞী।'

'এ সন্দেহ আমারও হয়। তবে এটাও মনে হয় যে, মেয়েটি কোন সুযোগই পায়নি। এর আগেই অন্য কিছু ঘটে গেছে।' মুকাওকিস বললেন।

দুজনে এ বিষয়ে আরো কিছু আলাপ আলোচনার পর ঠিক করলেন, কোন গুপ্তচর ইস্কান্দারিয়ায় পাঠাতে হবে। একটি মেয়ে দুজন লোকের সঙ্গে কোন জাহাজে এবং কবে বযনতিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো এটা ইস্কান্দারিয়ায় নৌবন্দরে গিয়ে বের করতে হবে।
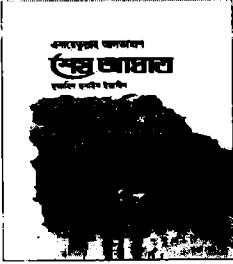
থিয়োডর জানালো, তার বিশ্বাস মেয়েটি কিছুই ফাঁস করেনি।...

যদি ফাঁসই করে দিতো তাহলে এত দিনে হেরাকলের কয়েদি হয়ে যেতো ওরা দুজন কিংবা তাদেরকে জল্লাদের কাছে হাওলা করে দেয়া হতো।

গুপ্তচর পাঠানো হবে এটা তো সিদ্ধান্ত হলো, কিন্তু কোন গুপ্তচর পাঠানো হবে যার ওপর বিশ্বাস রাখা যায়। এ নিয়ে আলোচনা চললো। এমন একজন গুপ্তচর দরকার, যে নাকি হেরাকলের অন্দরমহলের খবরাখবর যোগাড় করতে পারবে এবং সেখানে তার প্রভাব ও গ্রহণ যোগ্যতাও রয়েছে।

গুপ্তচরও তো কয়েক ধরনের আছে। সাধারণ গুপ্তচরদের দ্বারা সব কাজ হয় না। যেসব গুপ্তচরদের বড় বড় আমীর উমরা, জেনারেল এবং বাদশাহ পর্যন্ত হাত আছে; এখানে সে ধরনের গুপ্তচর দরকার।

মুকাওকিস ও থিয়োডর অনেক চিন্তা ভাবনার পর এক গোয়েন্দা অফিসারকে ঠিক করলেন। এও গোপনে কিবতী খ্রিস্টান। তাকে ডাকা হলো। আগেই ঠিক করে নেয়া হয়েছে তাকে কি বলা হবে।

তাকে বলা হলো কিছু দিন আগে হেরাকলকে উপঢৌকন হিসাবে একটি মেয়েকে দুজন লোকের মাধ্যমে বযনতিয়ায় পাঠানো হয়েছিলো। তাছাড়া হেরাকল কেন সেনা সাহায্য পাঠাচ্ছেন না এ পয়গামও সঙ্গে ছিলো। কিন্তু এখনো সে পক্ষ থেকে কোন খবর আসছে না।

গোয়েন্দা অফিসারের কাছে এটা কোন নতুন বিষয় ছিলো না। সে জানে হেরাকল মিসরে তার ব্যক্তিগত গুপ্তচর নিয়োজিত রেখেছেন। যারা মুকাওকিস ও তার প্রশাসনের ওপর সব সময় অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখে।

তাদের মনোভাব কখন কেমন থাকে তাও হেরাকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। তাই মুকাওকিস ও থিয়োডর যদি হেরাকলের মনোভাব জানার জন্য গুপ্তচর ব্যবহার করেন সেটাও আশ্চর্যের কিছু হবে না।

'আমরা যে কাজে মেয়েটিকে বযনতিয়ায় হেরাকলের কাছে পাঠিয়েছি সেটা না হলেও কোন আফসোস নেই।' মুকাওকিস গোয়েন্দা অফিসারকে বললেন, 'আশঙ্কার কথা হলো, মেয়েটি হেরাকলের ওখানে গিয়ে সেখানকার শাহী সাজ-সজ্জা দেখে না আবার সব কিছু ফাঁস করে দিয়েছে।...

'এত দিনে আমাদের লোক দুজনের ফিরে আসা উচিত ছিলো।'

গোয়েন্দা অফিসারকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হলো তাকে ইস্কান্দারিয়ায় গিয়ে কি করতে হবে এবং কখন বযনতিয়ায় যাবে এবং সেখানে গিয়ে কি করবে?

সেদিন সন্ধ্যাতেই গোয়েন্দা অফিসার ব্যবিলন থেকে ইস্কান্দারিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেলো।
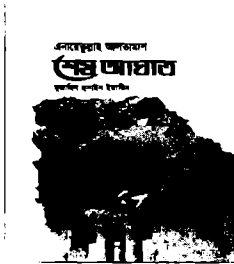
গোয়েন্দা অফিসার পালতোলা নৌযানে করে খুব দ্রুত ইস্কান্দারিয়ায় পৌঁছে গেলো। নীল নদের প্রবাহও তার অনুকূলে ছিলো।

ইস্কান্দারিয়ায় গিয়ে সেই জাহাজ যাত্রীদের সরাইখানায় গিয়ে উঠলো। সে সরাইখানার মালিক ও নওকরদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলো।

সে তো গোয়েন্দা বিভাগের খুব উচ্চাপদস্থ অফিসার এবং অভিজ্ঞ। কীভাবে কোন কথা বের করতে হবে এটা তার বেশ ভালো করেই জানা।

কৌশলে সে মালিক ও কর্মচারীদেরকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু সবার কাছ থেকে একটাই জবাব পাওয়া গেলো, সরাইখানায় কত মুসাফিরই তো আসা যাওয়া করে। যাদের কারো সঙ্গে নারী, শিশু থাকে। কেউ তো এজন্য বলতে পারবে না বিশেষ কোন মেয়ে বিশেষ কোন লোকের সঙ্গে এখানে এসে উঠেছে কি না।

গোয়েন্দা অফিসার তবুও দমবার পাত্র নয়। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে চতুর এক কর্মচারী পেয়ে গেলো। অফিসার তাকে সেই তিনজনের আকৃতি, গায়ের রং এবং পোশাকের কথাও বললো। কর্মচারটি বললো, যদি এই মেয়েই হয় তাহলে সে দেখেছে।

কর্মচারীটি বললো, পোশাক আশাকে তো এদেরকে সাধারণ লোক বলে মনে হচ্ছিলো, কিন্তু সরাইখানায় তারা যে কামরায় উঠলো সেটা ছিলো অভিজাত লোকদের কামরা। আমির শ্রেণীর লোকেরাই এধরনের কামরায় উঠে। এরা এই কামরা নেয়াতে সে একটু আশ্চর্য হলো। সেই তাদের কামরায় খাবার টাবার নিয়ে যেতো।

মেয়েটির মুখ নেকাবে আবৃত থাকতো সব সময়। একবার বেখেয়ালে হয়তো নেকাব ছাড়া বসা ছিলো। তার চোখ তার চেহারায় পড়তেই কর্মচারিটি চমকে উঠলো ভীষণ। কারণ, তার কাছে মনে হচ্ছে এমন সুন্দরী মেয়ে কোন মানব সন্তান হতে পারে না।

গোয়েন্দা অফিসার নিশ্চিত হয়ে গেলো, কর্মচারিটি মুকাওকিসের পাঠানো মেয়েটিকেই দেখেছে। এটা যখন নিশ্চিত হয়ে গেলো তখন কোন জাহাজে তারা বযনতিয়ায় গিয়েছে? জাহাজের ক্যাপ্টেন কে ? এসবও অল্প সময়েই সে বের করে ফেললো।

বযনতিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো অফিসার। বন্দরে এখন জাহাজ নেই। জাহাজ আসবে, প্রস্তুত হবে; মেলা সময়ের ব্যাপার। তাই সে বন্দরে অফিসে গিয়ে তার পরিচয় দিয়ে বললো, তাকে সরকারি কাজে দ্রুত বযনতিয়ায় যেতে হবে। তারা দ্রুত গতির পাল তোলা নৌযানের ব্যবস্থা করে দিলো।
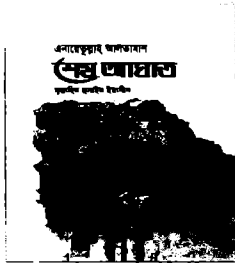
গোয়েন্দা অফিসার বযনতিয়া গিয়ে সেখানকার গোয়েন্দা অফিসে যোগাযোগ করলো। সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে তার ভালো জানা শোনা। তাদেরকে জানালো, মুসলমানদের দু তিনজন গুপ্তচর এখানে এসেছে। তাদেরকে ধরতে সে এখানে এসেছে।

সেখানকার অফিসারদের সঙ্গে এটা ওটা নিয়ে কথা বলছিলো। তারা মিসরের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। গোয়েন্দা অফিসার জানালো, শাহে হেরাকল কিবতী খ্রিস্টানদের ওপর যে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছেন এর পরিনাম এখন দেখা যাচ্ছে।

কিবতীরা না সেনাদের সাহায্য করছে, না দেশের প্রতিরক্ষার জন্য কিছু করছে। অথচ তাদের আসফাকে আজম বিনয়ামীন তাদেরকে বলে দিয়েছেন, ইসলামের এই জয় ঠেকানোর জন্য ওরা যেন নিজেদের ফৌজকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করে।

ওখানকার গোয়েন্দা সবাই রোমীয়। মিসর সালতানাত রোম থেকে বেদখল হয়ে যাওয়ার আশংকায় সবাই বেশ আক্রান্ত বলে জানালো। এপ্রসঙ্গে তারা হেরাকলের জুলম অত্যাচার ও নির্বিচারে মানুষ হত্যার কথাও তুললো।

কথায় কথায় একজন বললো, হেরাকল তো এক সময় সুন্দরী যুবতীদের প্রতি অনেক সদয় ছিলো। কিন্তু দেড় দুমাস আগে অতি সুন্দরী এক মেয়ে ও তার দুই সঙ্গীকে জল্লাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কেন এমন শাস্তি দিলেন এটা কেউ জানতে পারেনি।

মুকাওকিসের গোয়েন্দা অফিসার একথা শুনে চমকে উঠলো। তারপর নানা কৌশলে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলো, তাদের তিনজনকে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে নিয়ে এসেছিলো। দুজনের হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি ছিলো।

হেরাকল জাহাজের ক্যাপ্টেনকেও অনেক পুরস্কার দেয়ার নাম করে এক হাকিমকে ইঙ্গিতে তাকে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে বললেন। কিন্তু বেচারা ক্যাপ্টেন এমন কিছু কথা বলে যে, হাকিমের মন গলে যায়।

পরে হাকিম হেরাকলের কাছে গিয়ে সুপারিশ করে যে, তাকে মুক্তি দিতে এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়ে দিতে।

হাকিমের সুপারিশ হেরাকল গ্রহণ করেন এবং ক্যাপ্টেনকে মোটা অংকের পুরস্কার দিয়ে বিদায় করে দেন।

'হতে পারে, ওরা মুসলিম গুপ্তচর ছিলো' হেরাকলের এক গোয়েন্দা অফিসার বললো, 'আর এটাও হতের পারে, তুমি যে মুসলিম গোয়েন্দাদের খোঁজে এসেছো এরা তারাই ছিলো।'

'তোমার এই মতের সঙ্গে আমি এক মত নই।' আরেক অফিসার বললো, 'ওরা যদি গুপ্তচর হতো তাহলে হেরাকল তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিতেন। যাতে আমরা ওদের থেকে জেনে নিতে পারি ওরা এখানে এসে কি কি জানতে পেরেছে?'

মুকাওকিসের গোয়েন্দা অফিসারের আর কোন সন্দেহ রইলো না, এই সেই মেয়ে ও তার সঙ্গের লোক দুজন ছিলো যাদেরকে মুকাওকিস পাঠিয়েছিলেন। সে মিসরের দিকে ফিরতি পথ ধরলো।

ফিরেই মুকাওকিসকে পূর্ণ রিপোর্ট দিলো। মুকাওকিস ও থিয়োডরের হয়রানির সীমা রইলো না, হেরাকল কেন ওই তিনজনকে হত্যা করলো? ওদের চক্রান্ত যে ফাঁস হয়নি এটা তো নিশ্চিত। কারণ, চক্রান্ত ফাস হলে এত দিনে ওরাও কতল হয়ে যেতো।

মুকাওকিসের সামনে শুধু হেরাকলকে হত্যার চিন্তাই নয়, তার মন জুড়ে এখন রয়েছে আরবের মুসলমানরা।

যারা একের পর এক মিসরের কেল্লাবেষ্টিত শহরগুলো জয় করে নিচ্ছে।

আর এখন পুরো ফিউম অঞ্চলে তাদের শাসনকার্য শুরু করে দিয়েছে। সেখান থেকে তারা কর-খাজনা সব আদায় করে নিচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে মুকাওকিস আরো বেশি হয়রান হয়ে গেলেন যে, হেরাকল এখনো কেন সেনা সাহায্য পাঠাচ্ছেন না?...

শামের যুদ্ধে রোমীয়রা যখন সমানে মারা পড়ছিলো আর পিছু হঠছিলো তখন হেরাকল মিসর থেকে বিশাল সংখ্যক সেনা সাহায্য চেয়ে নেন। যার কমাণ্ডার ছিলো তারই ছেলে কস্তন্তীন।

অথচ এখন হেরাকল তার ছেলেকে বযনতিয়ায় বসিয়ে রেখেছেন। কেন?...মুকাওকিসের প্রশ্নের জবাব এই গোয়েন্দা অফিসারের কাছ থেকে পেয়ে যান।

গোয়েন্দা অফিসার তাকে জানায়, হেরাকলের শাহী মহলের ভিতরের কিছু ব্যাপার স্যাপার সে জেনে এসেছে। হেরাকল এখন পৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে এখন সিংসাহসন নিয়ে শীতল যুদ্ধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

হেরাকল তার ছেলে কস্তন্তীনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, কস্তন্তীন একজন জেনারেল এবং সেনাদলের নেতৃত্ব দেয়ার মতোও যোগ্যতা রাখে।

প্রায় সবাই নিশ্চিত, হেরাকলের পর কস্তন্তীনই তার সিংহাসনে বসছে। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্ধী আরেক দাবিদারও আছে।

এই দাবিদার হলো, হেরাকলের এক স্ত্রীর ছেলে। এ শুধু স্ত্রী নয় বরং তাকে সম্রাজ্ঞী বলা যায়। সালতানের রোমের ওপর তার হুকুম চলে। শুধু তাই নয়, হেরাকলের ওপরও তার কর্তৃত্ব রয়েছে। অতি চতুর এই মহিলা হেরাকলেরই স্ত্রী।
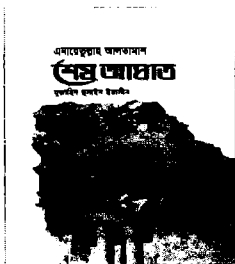
তার নাম মারতীনা। তার এক যুবক ছেলে রয়েছে। হারকিলিউনাস। মারতীনা তার এই ছেলেকে পরবর্তী কিসরা বানাতে চায়। কিন্তু হারকিলিউনাস কস্তন্তীনের মতো কোন সৈনিক নয়। সে শুধু একজন শাহজাদা। তার মা তাকে লড়াই থেকে বাঁচিয়ে রাখে। তা ছাড়া লড়াইয়ের মতো যোগ্যতাও তার নেই।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, হেরাকল মারতীনাকে এটকু ভয়ও পেতেন। এর কারণ সম্ভত, হেরাকলের এই প্রৌঢ়ত্ব এবং বড় বড় জেনারেলরা ছিলো মারতীনার হাতের মুঠোর পুতুল হওয়া। সে এদেরকে এমন ভোগ বিলাসে মত্ত থাকার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলো যে, তার মুঠোয় থাকতে তারা ব্যকুল হয়ে থাকতো।

হেরাকলের মতো নির্দয় বাদশাহর পক্ষে তার স্ত্রী মারতীনাকে হত্যা করিয়ে গায়েব করে দেয়া অতি সহজ ব্যাপার ছিলো। কিন্তু হেরাকল জানতেন, কোন না কোন দিক দিয়ে তার ওপর ঠিকই এর প্রতিশোধ নেয়া হবে। প্রতিশোধের ভয় তার ছেলে হারকিলিউনাসের পক্ষ থেকেও রয়েছে। তাই তিনি নীরব চোখে সব কিছু দেখে যাচ্ছেন। কারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হুসাইন হাইকাল ইউরোপীয় ও আরব ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন, মারতীনা হেরাকলকে বার্ধক্যের অজুহাতে শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু সে এতে সফল হতে পারেনি।

বিশেষ করে যখন মুসলমানরা মিসরে হামলা শুরু করলো তখন মারতীনা হেরাকলকে এ ব্যাপারে রাজি করতে চেষ্টা করে যে, কস্তন্তীনকে সেনাসাহায্য দিয়ে যেন দ্রুত মিসর পাঠিয়ে দেয়া হয়। না হয় মিসর হাত থেকে ছুটে যেতে পারে।

মারতীনা কস্তন্তীনের অনেক প্রশংসা করে বলে, মিসরকে আরবদের থেকে একমাত্র কস্তন্তীনই বাঁচাতে পারবে।

মারতীনা যতটা চতুর ছিলো হেরাকল ততটাই ধুরন্ধর ছিলেন। তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, মারতীনা কস্তন্তীনের যে বীরত্বের কাহিনী ফেঁদে বসেছে এর পেছনে আসল কারণ হলো, কস্তন্তীন যেন মিসর গিয়ে মুসলমানদের হাতে মারা পড়ে। হেরাকল মারতীনার এ প্রস্তাবকে এটা ওটা বলে এড়িয়ে গেলেন।

এপর মিসর থেকে যখন একের পর এক পরাজয়ের খবর আসতে লাগলো, তখন মারতীনা হেরাকলকে চাপ দিতে শুরু করলো। তিনি নিজে যেন ফৌজ নিয়ে মিসরে গিয়ে মুসলমানদের উচিত শিক্ষা দিয়ে আসেন। না হয় মুকাওকিস মিসর আরবদের হাতে তুলে দেবেন।

এখানেও যেন মারতীনা চাচ্ছে যে, কস্তন্তীন মারা না গেলেও কমপক্ষে হেরাকল যেন মারা যায়। আর তা না হলেও হেরাকল মিসরে গিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, মারতীনা সে সুযোগে সিংহাসনে বসে শাহেনশাহে রোম বলে দাবি করে বসবে।...হেরাকল এটাও এড়িয়ে যান।

মুকাওকিসের গোয়েন্দা অফিসার জানালো, হেরাকল তার এই রাণী থেকে সিংহাসন বাঁচাতে ও কস্তন্তীনকে তার স্থলাভিষিক্ত করতে না নিজে মিসর আসছেন, না কস্তন্তীনকে সৈন্য নিয়ে মিসর আসতে দিচ্ছেন।

এর অর্থ হলো, মিসরের সব দায় দায়িত্ব হেরাকল মুকাওকিসের ওপর ছেড়ে রেখেছেন।...

মুকাওকিস গোয়েন্দা অফিসারকে মোটা অঙ্কের বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দিলেন।
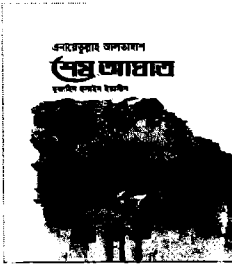
মুকাওকিস নিশ্চিত হয়ে গেলেন, হেরাকল তার সহযোগীতায় কিছুই করবেন না। তিনি তার জেনারেল থিয়োডরকে ডেকে এ বিষয়ে আলাপ করলেন। থিয়োডর তাকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বললো,

মিসরকে বাঁচানোর সব দায় দায়িত্ব এখন মুকাওকিসের। এখন হেরাকলের আশায় বসে থাকা ধোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপরও তারা এ বিষয়ে একমত হলো যে, হেরাকলকে মিসরের পরবর্তী অবস্থা নিয়মিতই জানানো হবে। তবে মিসর নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব কৌশলে লড়বে। হেরাকলের হুকুম মানবে না এক্ষেত্রে।

অবশ্য হেরাকলকেও এটা টের পেতে দেয়া হবে না যে, ইচ্ছে করেই তার হুকুম অমান্য করা হচ্ছে। তিনি কখনো এব্যাপারে জবাবদিহিতা চাইলে অজুহাত পেশ করা হবে যে, তার হুকুম যখন মিসর পৌঁছেছে তখন এখানকার অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে।

ব্যবিলনের আশপাশ ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মুকাওকিসের জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতি তার ঘুম হারাম করে দিয়েছে। আর হেরাকলের দিক থেকে তো তার বিপদ ছিলোই।

সেই মেয়ে ও তার দুই সঙ্গীকে যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ধরিয়ে দিয়েছে তার ব্যাপারে থিয়োডরকে নির্দেশ দিলেন। জাহাজের সেই ক্যাপ্টেনকে যেন যেভাবেই হোক অপহরণ করে এখানে নিয়ে আসে। কারণ, সঠিক খবর তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

থিয়োডর দুজন সাহসী ও অভিজ্ঞ সেনা অফিসারকে ঠিক করলো। সেই জাহাজ ও ক্যাপ্টেনের নাম বলে তাদেরকে থিয়োডর শক্ত করে বলে দিলো, 'ক্যাপ্টেনকে ইস্কান্দারিয়া থেকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যাতে কারো কোন সন্দেহ পর্যন্ত না হয় তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'।...

মুকাওকিস আবার ব্যবিলনে থাকা তার সেনাদলের প্রতি মনযোগ দিলেন। ব্যবিলনে সৈন্যের কোন কমতি নেই। কিন্তু তাদের ওপর মুকাওকিসের পূর্ণ ভরসা নেই। ব্যবিলনের লাগোয়া এলাকা ফিউম যেটা মুজাহিদদের দখলে রয়েছে সেখানকার রোমী সেনাদের কিছু ব্যবিলনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর বাকিরা নাকয়ুস কেল্লায় চলে যায়।

ফিউম এলাকা রোমী সেনা শূন্য থাকলেও মুকাওকিস আশায় রইলেন, সেখানকার কিবতী খ্রিস্টানরা মুসলমনাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং বিদ্রোহ করে

বসবে। এই এলাকায় কিবতী খ্রিস্টানের সংখ্যাই বেশি। এ দিকে মুসলিম সেনাদের সংখ্যা এত কম যে, আমর ইবনে আস (রা.) সুবিশাল বিজিত এলাকাগুলোতে হাতে গোনা কিছু সৈন্য রেখে আসেন।

বিজিত এলাকার সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা বহাল করা ও সঠিক নিরাপত্তা কায়েম করা এই সামান্য কিছু লোকের দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা.) এর এছাড়া উপায়ও ছিলো না।

এসময় যদি কিবতীরা বিদ্রোহ করে বসতো এবং খাযনা ইত্যাদি দিতে অস্বীকার করে বসতো তাহলে মুজাহিদরা মুহূর্তের জন্যও তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতো না। মুজাহিদদের পরিনাম হতো ভয়াবহ। কিন্তু তারপরও কেন তারা বিদ্রোহ করলো না?

তাদের আসফাকে আজম বিনিয়ামীন তো তাদের বলে দিয়েছিলেন, মুসলমানদেরকে রুখতে হবে এবং রোমী ফৌজকে সাহায্য করতে হবে।

এখানে সেই মহান সত্তার নামই উচ্চকিত হয়। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এমন অলৌকিক অনুগ্রহ তিনি তাদের ওপরই করেন যারা তার রাহে একনিষ্ঠভাবে নিজেদেরকে নিবেদন করে রেখেছে, যাদের অন্তরে মানব জাতির ভালোবাসা রয়েছে। এসব এলাকা যখন নামমাত্র লড়াইয়ের পর বিজয় হয় তখন রোমীয় সেনাদের শেষ সৈন্যটিও পালিয়ে যায়। তখন শহর ও এলাকার লোকদের মধ্যেও ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা পালানোর পথ খুঁজতে থাকে।

লোকে জানে, বিজয়ী দল বিজিত এলাকার লোকদের ওপর কোন রহম করে না। লুটপাট, হত্যা, ধর্ষন নির্বিবাধে করে যায়। যুবতী মেয়েদেরকে নিজেদের ভোগ্য পণ্য মনে করে।

কিন্তু মুসলিম বিজয়ী সেনারা সেখানকার লোকদেরকে বিস্মিত করে তোলে। সেখানে মুজাহিদদের স্ত্রীরাও অনেক বড় ভূমিকা রাখে। তারা অতি কঠিন পরিবেশকে ঘরোয়া পরিবেশের রূপ দেয়। যা বড় বড় সেনাদলের পক্ষেও এতটা করা সম্ভব ছিলো না।
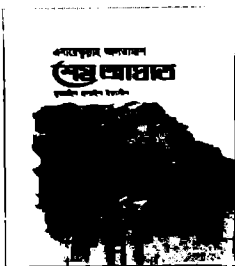
মুজাহিদরা বিজিত এলাকার বসতি ও ঘর বাড়িতে গিয়ে গিয়ে পরিবারের লোকদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতো যে, তারা যাতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে না যায়। এবং এমন নিশ্চিন্তে যার যার ঘরে অবস্থান করে যেন কিছুই হয়নি।

মুসলিম সেনারা কারো ঘরের দিকে চোখ উঠিয়ে তাকায়নি। বাড়ির আশে পাশে শুধুই ঘোষণা দিয়ে বেড়িয়েছে যে, কাউকে যেন অযথা পেরেশান করা না হয়। নারীরা বাইরে এসে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারবে। বিজয়ী মুসলমানদেরকে যেন তাদের ভাই ও মুহাফেজ মনে করে।

ঐতিহাসিক ইবনুল হাসান ও তুঘরি 'আয়নুজুমুয যাহিরা' গ্রন্থে লিখেছেন,

'মুকাওকিসের সব আশা ভরসা মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে ফিউম এর লোকজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বরং তাদেরকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নেয়। এলাকার নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে এ আওয়াজ ও উঠে যে, জয় অবশেষে ইসলামেরই হবে। তাদেরই বিজয় মেনে নাও।

কিবতীদের পক্ষ থেকে এমন কথাও শোনা যেতে লাগলো যে, হেরাকলের হিংস্রতা আজ থেকে খতম হয়ে গেলো। আজ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ শুরু হলো।

এভাবে ওরা মুসলিম সেনাদের অনুরাগী হয়ে উঠলো। কেন?...সাধারণ মানুষের ধন সম্পদ, সোনা-রূপা, অর্থ কড়ি, সুন্দরী যুবতী, নারীদের প্রতি মুসলিম সেনাদের সামান্যতম আগ্রহও ছিলো না। তারা মানুষের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠার দিকে সবার আগে মনযোগী হয়।

মুসলিম সেনাদলে যে মিসরীয় বেদুইন দল যোগ দিয়েছিলো তাদের পক্ষ থেকে আশঙ্কজনক কোন কিছু ঘটনার অবশ্য সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তাদেরও কেউ কারো সঙ্গে আপত্তিজনক আচরণ করেনি। কারণ, তারা গনিমতের মালের পুরো অংশই পেতো।

তাদেরকে অতি শক্ত করে বলে দেয়া হয়, হেরাকলের মতো এমন শক্তিশালী বাদশাহ মিসরে আসতে কেন ভয় পান? তার কেন একেরপর এক পরাজয় স্বীকার করতে হচ্ছে? কারণ, তিনি নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষের ওপর জুলুমের হাত উঠিয়ে রাখতেন।...

এসব কথায় এমন সরল যুক্তি ছিলো যে, তা বেদুইনদের হৃদয়মূলে বসে যায়।
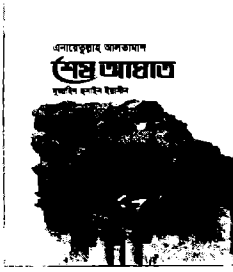
এখন আমর ইবনে আস (রা.) এর গন্তব্য কেল্লা ব্যবিলন। ব্যবিলন দুর্গ। এই কেল্লা জয় করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। একে তো সৈন্য সংখ্যা অতি নগন্য। তারপর আবার কেল্লার অবস্থান ও গঠন কাঠামো এতই মজবুত আর অজেয় যে, তা বিশ্ব শক্তিকেও যেন রুখে দেবে।

তারপরও তিনি তার সালারদের বললেন,

'এই কেল্লা জয় করা যতই অসম্ভব হোক তা আমাদের অবশ্যই অবরোধ করতে হবে। এতে কমপক্ষে কেল্লার ভেতরের সেনাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে। আর আমরা যে একে অজেয় মনে করছি না সেটাও রোমীয়রা বুঝতে পারবে'।

ব্যবিলনের মতো এমন কেল্লার বিরুদ্ধে এর চেয়ে বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়ার দরকার ছিলো না আমর ইবনে আস (রা.) এর। আজো ব্যবিলনের কেল্লা সেই ভুবনজয়ী দর্পী মনোভাব নিয়ে অজয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য পুরো কেল্লাটি নয়, কেল্লার অবকাঠামোটুকুই এখন দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় প্রাচীর, সুউচ্চ বুরুজ এখনো অক্ষত আছে কালের সাক্ষী হয়ে।

সেখানে গিয়ে একটু কল্পনা করে দেখুন সেসব শহীদানদের কথা। দেখবেন তাদের অদৃশ্য শব্দের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছেন। অবশ্য এই আত্মিক গুঞ্জন তারাই শুনতে পাবে যাদের অন্তরাত্মা সদা সজাগ থাকে। যাদের হৃদয় রাজ্যে রাজত্ব করছেন মহান আল্লাহ।

আজ তো সেখানে হেরাকল বা ফেরাউনের রাজত্ব নেই, কিন্তু মুসলমান হয়েও সেখানকার শাসকদের মধ্যে ফেরাউনি একনায়কতন্ত্রী স্বভাব রয়ে গেছে। যারা স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর নাম নেয়, আল্লাহর পথে সংগ্রামের কথা বলে; তাদেরকে ধর্মান্ধ, জঙ্গি, সন্ত্রাসী বলে বলির পাঠা বানানো হচ্ছে।

সেখানকার দুর্ভাগা শাসকরা আজ আল্লাহর নাম ভুলে গিয়ে ইসরাইল আর আমেরিকাকে তাদের প্রভু বলে ধ্যান-জ্ঞান করছে।

ব্যবিলনের কেল্লার অবস্থান ও নির্মাণ কাঠামোটাই এমন যে, এর ধারে কাছে যাওয়া কোন শত্রুদলের পক্ষে অতি দুরহ কাজ। কেল্লার চার পাশের প্রাচীরগুলো ষাট হাত দীর্ঘ এবং অতি মসৃণ তার প্রাচীরগাত্র। আর চওড়া আঠারো হাত। এমন কোন খাঁজ বা অমসৃণ জায়গা নেই যেখানে ছুড়ে মারা আংটা বা ফলক গেঁথে যাবে।

প্রাচীরের ওপরের অসংখ্য বুরুজগুলো শুধু আকাশ সমান উঁচুই নয়, পাহাড়ের মতো মজবুতও। এগুলোর ওপর উঠে দাঁড়ালে দিগন্ত বিস্তৃত নীলের জলরাশির অপরূপ দৃশ্য মন জুড়িয়ে দেয়।

কেল্লার এক দিক দিয়ে নীল নদ এমনভাবে বয়ে গেছে যে, সেদিকে প্রাচীর খাড়া হয়ে নীলনদে নেমে গেছে। মূল ফটকের একটা নদীর দিকে খোলা যেতো। ফটকের পুরোটাই অতি মোটা লোহার তৈরি। সেখানে সব সময় নৌকার বিশাল একটা পাল প্রস্তুত হয়ে থাকে। এর একোবারে সামনের দিক থেকে নীল নদ হঠাৎ অনেক চওড়া হয়ে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

এভাবে নদী হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে বিস্তৃত হওয়াতে নদীর মাঝখানে শুকনো চর জেগে উঠেছে। সেটিও ে শ মজবুত। ওখানে একটি কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছে।

এই কেল্লার ন ম রওজা। এখানে সব সময় সশস্ত্র সেনাদল প্রস্তুত থাকে। প্রয়োজনে ডাক পড়লেই এরা নৌকাযোগে ব্যবিলনে পৌঁছে যায়।

ব্যবিলন কেল্লার ভেতর অসংখ্য কূপ রয়েছে। এতো বেশি কূপ রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এই কেল্লা অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও পানির কোন অভাব হবে না। প্রাচীর ঘেষে রয়েছে শস্যক্ষেত্র ও ফলের বাগানের আদিগন্ত বিস্তৃতধারা।

কেল্লার অবস্থানকে দুর্ভেদ্য করার জন্য শস্য ক্ষেত্র ও বাগানের আশে পাশে অনেক বড় ও খুব চওড়া পরিখা খনন করা হয়েছে। এর গভীরতাও অনেক। যে কারণে নদীর পানির প্রবাহ সবসময় এখানে থাকে।

নদীর দিকের ফটক ছাড়াও সৈন্যদের জন্য বড় আরেকটি ফটক আছে। সেটার মধ্যে মোটা রশি ও শিকলের মাধ্যমে এমন চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, তাতে সব সময় একাধিক ব্রিজ ঝুলানো থাকে।

প্রয়োজনের সময় সেগুলো টেনে টেনে পরিখার ওপর রেখে দেয়া হয়। এটা দিয়ে সৈন্যরা তখন পরিখা অতিক্রম করে। সৈন্যরা পরিখা অতিক্রমের পর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজ উঠিয়ে ফেলা হয়। তখন আর শত্রুদল পরিখা পার হতে পারে না।
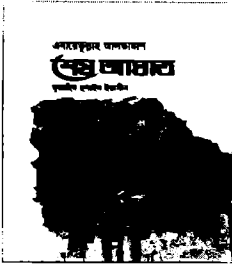
ব্যবিলন অবরোধ করলো মুসলিম সেনারা।

এর কয়েকদিন পরই মুকাওকিসকে জানানো হলো, জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন তাদের চলাচল নদীপথে। মুকাওকিস ক্যাপ্টেনকে সামনে হাজির করার হুকুম দিলেন।

'বাঁচার ইচ্ছা থাকলে সত্য বলো'; মুকাওকিস ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'তুমি একটি মেয়ে ও দুজন লোককে বযনতিয়া নিয়ে তাদেরকে হেরাকলের হাতে সোপর্দ করেছিলে। তাদেরকে তুমি এভাবে হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়ে কেন গ্রেফতার করালে?'

ক্যাপ্টেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তার মুখে কোন কথা জুড়ালো না। সে ফ্যাস ফ্যাস করে তাকিয়ে রইলো মুকাওকিসের দিকে।

'আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো না' মুকাওকিস বললেন, 'তবে তোমার এত বড় জাহাজে আগুন লাগিয়ে দেবো। তারপর তোমার হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে ছেড়ে দেবো। তুমি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াবে।

ক্যাপ্টেন বুঝে গেলো এখানে আর মিথ্যাচার বা ধোকা দেয়া চলবে না। সাধারণ কোন বিচারকের এজলাস নয় এটা। এটা মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের দরবার।

তিনি বিনা অপরাধেই তাকে হত্যা করতে পারেন। আর সে তো অনেক বড় অপরাধী। সে মুকাওকিসের পায়ে মাথা ঠুকে দিলো। তারপর পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিলো। এটাও বললো, সে এসব করেছে মোটা অঙ্কের বখশিশ পাওয়ার লোভে। তা ছাড়া সে হেরাকলের অতি ভক্তও।

মুকাওকিস যখন এটা জানতে পারলেন, হেরাকল সব কিছু জেনে ফেলেছেন তখন তার হয়রানির সীমা রইলো না যে, হেরাকল কেন তার বিরুদ্ধে কোন পদেক্ষপ নিলেন না। সেখানে থিয়োডরও ছিলো। সেও খুব বিস্মিত হলো।

ক্যাপ্টেনের ভাগ্য নির্ধারনের জন্য মুকাওকিস ক্যাপ্টেনকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর থিয়োডরের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ক্যাপ্টেন যেহেতু সত্য কথা বলেছে তাই তাকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিলেন।

'না, থিয়োডর বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিলে এবং জীবিত রাখলে এখান থেকে বের হয়ে সবার আগে সে যে কাজ করবে সেটা হলো, সে সোজা বযনতিয়ায় চলে যাবে

এবং হেরাকলকে বলবে আমরা সবকিছু তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। এরপর তো হেরাকল আমাদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু একটা করবেনই। আমাদের অজান্তেই আমরা খতম হয়ে যাবো।...

এই ক্যাপ্টেনের জীবিত থাকা মানে আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু।'

মুকাওকিস হুকুম দিলেন, ক্যাপ্টেনকে জল্লাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। ক্যাপ্টেনকে আর ভেতরে আনা হলো না। একটু পর বাইরে থেকে ক্যাপ্টেনের চরম আর্তনাদ শোনা যেতে লাগলো। সে আওয়াজ ক্রমেই মিলিয়ে গেলো দূরে যেতে যেতে।
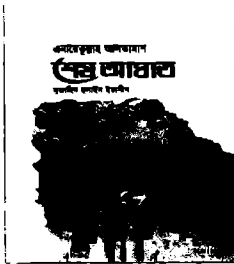
অবরুদ্ধ ব্যবিলনে এক মুজাহিদ গুপ্তচর ছিলো। ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলো। শহরের কোন সরকারী কাজ পড়লো মধ্য নদীতে অবস্থিত রওজা কেল্লায়। কাজটি সৈন্যদেরও নয়।

তাই শহরবাসীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে সেই মুসলিম গোয়েন্দাও নিজের নাম পেশ করলো এবং তাদের সঙ্গে রওজায় নৌকাযোগে চলে গেলো।

রাতের অন্ধকারে সেই মুজাহিদ গোয়েন্দা লুকিয়ে ছাপিয়ে কেল্লা থেকে বেরিয়ে নদীতে নেমে পড়লো। নদী তখন উত্তাল ঢেউ দিচ্ছে। এছাড়াও নদী ওখান দিয়ে বেশ চওড়া। সাতরিয়ে এতখানি জায়গা পাড়ি দেয়া বড় বড় সাতারুর পক্ষেও কঠিন কাজ।

গোয়েন্দা মুজাহিদ নদীর সঙ্গে মরনপন যুদ্ধ করে ঢেউ ভেঙ্গে নদীর এপারে চলে এলো। তখনই তার সব শক্তি ও দম নিঃশেষ হওয়ার যোগাড় হলো। তারপর আবার নদীর তীর ধরে সাতরাতে সাতরাতে সেখানে চলে গেলো যেখানে মুজাহিদরা ছাউনি ফেলে ব্যবিলন অবরোধ করে রেখেছে।

সেখানে পৌছে কিছুক্ষণ অচেতন হয়ে পড়েছিলো। তারপর জ্ঞান ফিরে আসলে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে চলে গেলো।

সিপাহসালারকে কেল্লার ভেতর কত হাজার সৈন্য আছে এবং সৈন্যদেরকে মুকাওকিস সমাবেশ করে কি বলেছেন তাও জানালো গোয়েন্দা মুজাহিদ।

মুকাওকিস জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়ার পর তার সৈন্যদেরকে বলেন,

নদী এখন উত্তাল হতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে নদী আরো উন্মত্ত হয়ে উঠবে। এটা প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত চলবে। এমন উম্মাদ হয়ে উঠবে যে, কেউ এতে নামারও সাহস করবে না।

এতে লাভ এই হবে যে, নদীর দিক থেকে কেল্লা একেবারে নিরাপদ থাকবে। আর অন্য দিকের পরিখাগুলো পানিতে এত টুইটুম্বর থাকবে যে, আরবের এই মুসলমানরা তাও টপকাতে সাহস করবে না।

নদী স্বভাবিক হয়ে আসতে আসতে ততদিনে ইস্কান্দারিয়া থেকে অতিরিক্ত সেনাদলও চলে আসবে। আর অবরোধ দীর্ঘ হওয়ায় মুসলমানদের মনোবলও ভেঙ্গে যাবে বা মনোবলে চিড় ধরবে। তখন তাদেরকে সহজেই হটানো যাবে।

মুকাওকিস তার সৈন্যদেরকে বিশাল অঙ্কের বখশিষ বরাদ্দের লোভও দেখিয়েছেন।

তিনি সৈন্যদের সঙ্গে ওয়াদা করেছেন, মুসলমানদের পিছু হটাতে পারলে প্রত্যেক সৈন্যকে তিন মাসের বেতন পরিমাণ টাকা বোনাস দেয়া হবে। আর যারা সেরকম বীরত্ব প্রদর্শন করবে তাদেরকে তো বখশিশ আর পুরস্কারে ভরিয়ে দেয়া হবে।

এসব খবর কিছু কিছু আমর ইবনে আস (রা.) আগেই জানতেন। কিছু নতুন কথাও জানতে পারলেন গোয়েন্দা মুজাহিদের কথায়।

সব শুনে আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, নদী যত দিন উম্মত্ত থাকবে তত দিন কেল্লার সেনারাও কোথাও থেকে কোন সাহায্য পাবে না। তাই এসময় কেল্লার ভিতরের লোকদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে হবে। তারপর কেল্লার ওপর যথারীতি হামলা চালানো হবে।

মুসলিম সেনাদেরকে এ তথ্যগুলো জানিয়ে সবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন,

'দীন ইসলামের ঝাণ্ডাধারীরা! এই পরিখা এর চেয়ে অধিক চওড়া আর আরো অধিক গভীর হলেও তোমাদর চলার পথ কেউ রুখতে পারবে না। রোমীয়রা দাবি করে, এই কেল্লা এতই মজবুত, কেউ এটা জয় করতে পারবে না।...

ইসলামের বীর সেনানীরা! দুনিয়ার কোন কেল্লা-দুর্গ তোমাদের ঈমানের চেয়ে এবং তোমাদের জযবা-মনোবলের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্তিশালী নয়। আল্লাহ তাআলার সেই মহাবাণীকে সবসময় স্মরণে রেখো, তোমরা চেষ্টা করো, সফলতা আর শুভ পরিনাম দানকারী আমি। আমার পথে হরকত করো তোমরা, তা বরকতময় করার মালিক তো আমি।'

কয়েক দিনের মধ্যে নীল নদের পানি বেড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে বাড়লো এর উম্মত্ততা। কেল্লার পার্শ্ব-ঘেরা পরিখাগুলোও পানিতে ভরে উঠলো। কেল্লার প্রাচীর থেকে এবার মুজাহিদদের অবস্থান লক্ষ্য করে মিনযানীক দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো।

এর জবাবে মুসলিম সেনারাও মিনজানিক দ্বারা কেল্লার ভেতর পাথর বর্ষণ শুরু করে দিলো। যেসব ধনুক দ্বারা দূরদুরান্ত পর্যন্ত তীর পৌঁছে যায় সেসব ধনুকও তৈরি করে নিলো মুজাহিদরা।

এসব ধনুক দিয়ে প্রাচীরের ওপর দাঁড়ানো রোমীয় সেনাদের তীরবিদ্ধ করা হতে লাগলো। এভাবেই উভয় পক্ষের তীর আর পাথর বর্ষণ চলতে লাগলো।

কেল্লার প্রাচীর থেকে ছুটে আসা পাথর তো মুজাহিদদের সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারলো না। কিন্তু মুজাহিদদের মিনজানিক দ্বারা নিক্ষেপিত পাথরগুলো শহরের ভেতরে গিয়ে পড়তো এবং সেগুলো শহরে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিতো।

শহরবাসীর সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ ছিলো এটা যে, এত বড় বড় পাথর যদি তাদের ছাদের ওপর আছড়ে পড়ে তাহলে তো ছাদ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেবে। রোমীয় সেনাদের মনোবল তো এমনিই টলমলে ছিলো।

এবার শহরবাসীর সন্ত্রস্ত অবস্থা তাদের ওপরও প্রভাব ফেললো। তাদের মনোবল আরো দুর্বল হতে লাগলো।

প্রায় পৌনে দুই মাসের মাথায় নীল নদের উন্মত্ততা অনেকটাই কমে এলো।
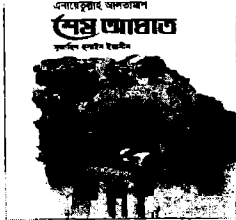
৬৪০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের প্রথম হপ্তার কথা। মুকাওকিস তার সৈন্যদের ও শহরবাসীদের মনোবলের অবস্থার জরিপ চালালেন। এতে তার সন্দেহ হতে লাগলো, মুসলমানরা যদি তাদের নিজস্ব কৌশলে কেল্লার ওপর একবার অতর্কিত হামল করে বসে তাহলে হয়তো তার সৈন্যরা তাদের বিরুদ্ধে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে শহরের লোকদের মধ্যেও এমন দিশেহারা ভাব ও দিকবিদিক হয়ে এমন হুলুস্থুল পড়ে যাবে যে, নিজেদের সৈন্যদের জন্যও তারা বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে।

মুকাওকিসের আগেই এধরনের প্রস্তাব মনে এসেছিলো এবং এখনো আবার আসলো যে, মুসলমানদেরকে কোন কিছুর বিনিময়ে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বা মিসর ত্যাগ করতে রাজি করানো।

তিনি এক গোপন বৈঠক ডাকলেন, এতে জেনারেল থিয়োডরসহ আরেক বিখ্যাত জেনারেল জারেজও রইলো। জেনারেল থিয়োডের পরেই জেনারেল জারেজের অবস্থান।

'ধৈর্য নিয়ে আমার কথাগুলো শুনে আমাকে পরামর্শ দাও।' মুকাওকিস তাদেরকে বললেন, 'নিজেদের সেনাদের অবস্থা তো দেখছো, শহরের লোকদের মনোভাবও আচ করতে পারছো।....

'আমরা আবার সেনা সাহায্যের আশা নিয়ে বসে আছি। কিন্তু ভেবে দেখো, আমাদের সৈন্য সংখ্যাও তো কম নয়। যথেষ্টেরও বেশি আছে। আমরা তবুও অতিরিক্ত সৈন্যের আশায় পথ চেয়ে আছি।'...

'আর অতিরিক্ত সৈন্য তখনই আমাদের কাজে আসবে যখন ওরা মুসলমানদের পেছন দিক থেকে আচমকা হামলা করবে। নীলের দুই তীরই মুসলমানদের দখলে'।...

এরা যদি পরিখাও অতিক্রম করতে চায় তাহলে আমার মনে হয় সেটাও তারা পারবে। ওদের যে জযবা, মনোবল, ধৈর্য ও স্থিরতা সে সম্পর্কে তোমরা আমার চেয়ে কি কম জানো?'...

'লক্ষ্য করে দেখো, এই মুসলমানরা কত দ্রুত মিসরে ঢুকে দূরদুরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাদের এই গতি আমাদের সৈন্যদের মধ্যে কি তোমরা কল্পনাও করতে পারবে? তাই আমি চাই বিনা লড়াইয়ে অবরোধ উঠিয়ে তাদেরকে মানিয়ে নিতে। এজন্য আবরদের সঙ্গে আরেকবার যদি সন্ধির আলোচনা করা হয় এবং তাদেরকে যদি বলা হয় তোমরা তোমাদের যা চাওয়ার তা নিয়ে মিসর থেকে চলে যাও তাহলে কি সেটা অমূলক হবে?'

মুকাওকিস তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিগুলো এমন আকষণীয় করে উপস্থাপন করলেন যে, দুই জেনারেল ও সেখানে উপস্থিত আরো দুই উপদেষ্টা এক সঙ্গে মত দিলো, এ প্রস্তাব যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করা হোক।

'আমি শুধু একটি পরামর্শ দেবো, থিয়োডর বললো, 'এই বৈঠক ও এর মধ্যে আলোচিত উচ্চারিত প্রতিটি কথা যেন শক্তভাবে গোপন রাখা হয়। ব্যারাকের সেনাদের এটাও জানা চলবে না যে, আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। না হয় ওরা সন্ধি-সমঝোতার আশায় হাত পা ছেড়ে বসে পড়বে।'

'আমার মনে হয় এটা বাস্তবায়ন আপনার নেতৃত্বেই হওয়া উচিত। কারণ ব্যক্তিগতভাবেও আপনি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। জেনারেল জারেজ মুকাওকিসকে পরামর্শ দিলো।

মুকাওকিস এ পরামর্শ গ্রহণ করে নিলেন।

সেদিনের এই রুদ্ধদার বৈঠকের কথা তো গোপন রাখা গেলো। কিন্তু ইতিহাসের দূর অনুসন্ধান থেকে তা আর গোপন রাখা যায়নি। অনেক ঐতিহাসিকই এ ঘটনা

সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন।...এই গোপন বৈঠকে একটি চিঠিও মুকাওকিসের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হয় মুসলিম সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর নামে।

পর দিন রাতের অন্ধকারে মুকাওকিস ব্যবিলনের কেল্লা থেকে নদীর পথে বেরিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে রইলেন সেই দুই জেনারেল ও দুই উপদেষ্টা।

নদীর মধ্যবর্তী দীপে অবস্থিত রওজা দুর্গে গিয়ে নামলেন নৌকা থেকে। সেই কেল্লায় অনেক বড় একটি গির্জা আছে। গির্জায় একজন পাদ্রীও আছেন।
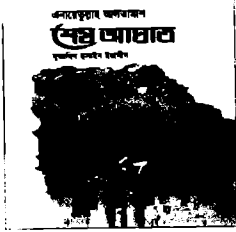
মাঝ রাতের দিকে পাদ্রীকে ঘুম থেকে জাগানো হলো। পাদ্রী হড় বড় করে ঘুম থেকে উঠে তার সামনে মিসর বাদশাহ ও দুই জেনারেলকে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন। এঁরা কেন এখানে এসেছে?

মুকাওকিস পাদ্রীকে চিঠিটি দিয়ে বললেন, 'আগামীকাল সকালে তিন চার জন বিশ্বস্ত লোক নেবেন। তারপর নৌকায় করে মুসলিম সিপাহসালারের কাছে চলে যাবেন'।

'এই পুরো ব্যাপারটা কঠিনভাবে গোপন রাখতে হবে।' মুকাওকিস বললেন, পাদ্রীকে, 'কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়, আমি মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে কোন ধরনের পয়গাম পাঠিয়েছি।'

মুকাওকিসের চিঠিতে লেখা ছিলো,

'তোমরা আমাদের দেশে এমনভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসেছো যেন এ দেশটি তোমাদের। এদেশের কোন শাসক নেই। কোন রক্ষক নেই। আর এখানকার লোকজন ভেড়া বকরির মতো।....

'তোমরা আমাদের ওপর অন্যায়ভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছো। এতে দুপক্ষের যে রক্তপাত হয়েছে এর দায় দায়িত্ব সব তোমাদের সিপাহসালারের এবং এটা অনেক বড় অপরাধ।'...

'আমাদের দেশে তোমরা অনেক দিন ধরে উৎপাত করে বেড়াচ্ছো। যেটা আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের একাংশের সেনাবাহিনীর তুলনায়ও তোমরা মুষ্টিমেয় নও। এখন আমি তোমদের সুযোগ করে দিচ্ছি তোমরা এখান থেকেই ফিরে

যাও। না হয় তোমাদের একজন সৈন্যও প্রাণ নিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারবে না।'...

'তোমরা ভাবছো একেরপর এক বিজয় অর্জন করে সারা বিশ্ব জয় করে ফেলবে। কিন্তু এটা বুঝছো না কেন যে, এসব বিজয় তোমাদের মাথাটাই খারাপ করে দিয়েছে।....

'তোমাদের এতটুকু উপলব্ধির যোগ্যতা নেই যে, এ মুহূর্তেই তোমরা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছো? নীল নদ তোমাদের ঘিরে রয়েছে। মনে করো নীলনদও তোমাদের দুশমন।'...

'তোমাদের এই ছোট দলটি আমার এই বিশাল বাহিনীর পায়ের তলায় পিষে মরার আগে আরেকটি সুযোগ তোমাদেরকে দিচ্ছি। নিজেদের কোন দূত বা প্রতিনিধি আমার কাছে পাঠাও। যারা আমার সঙ্গে সন্ধি সমঝোত নিয়ে কথা বলতে পারবে। এতে হয়তা রক্তপাত বন্ধ হওয়ার নতুন কোন উপায় বেরিয়ে আসতে পারে'।

'তোমরাও ধ্বংসের হাত থেকে বেরিযে আসতে পারবে। এর বিনিময়ে তোমরা যা চাইবে তাই আমরা দেবো। তোমাদের সবার জন্য এটা নিশ্চিত মঙ্গল বয়ে আনবে। এখন আমি তোমার কোন পত্রদূত বা প্রতিনিধি দলের অপেক্ষায় থাকবো।'

চিঠির ভাষা মোটেও আবেদন বা অনুরোধমূলক নয়; সরাসরি হুমকির ভাষায় চিঠি লেখান মুকাওকিস।

একদিকে মুকাওকিস মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে তার ভাষা ও মনোভঙ্গি আক্রমণাত্মক। কেন এই দ্বৈত মনোভাব তার ব্যাখ্যা ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায়নি।
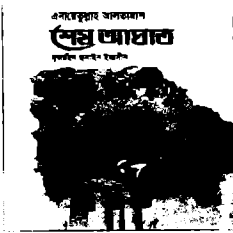
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আন্তর্জাতিক বিশ্বে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিদের কাছে চিঠি পাঠান, তখন প্রায় কেউ সে চিঠি সাদরে গ্রহণ করেনি।

ইরানের তদানিন্তন বাদশাহ তো চিঠিটি টুকরো টুকরো করে দরবারময় ছড়িয়ে দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও পৈশাচিক কাজটি করেন।

একারণেই মুসলমানরা পরবর্তীতে ইরান এবং রোম পদানত করে।

মুকাওকিসের কাছেও এরকম একটি পত্র আসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। মুকাওকিস অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে চিঠিটি গ্রহণ করেন।

পত্রদূত হযরত হাতিব (রা.) কে রীতিমতো স্বাগত জানিয়ে তার আতিথ্যে গ্রহণ করেন। তার পাশে বসিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করেন।

চিঠি পড়ে এর জবাবও লিখেন। ইসলাম ও তার নবীর সত্যতা স্বীকার করেন। পত্রদূতের সঙ্গে সুন্দরী দুজন বাদী ও উন্নত জাতের একটি খচ্চরও উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দাসির একজনকে বিয়ে করেন। তিনি হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা.)। তার গর্ভে জন্ম নেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র সন্তান ইবরাহীম (রা.)।

শুরুতেই মুকাওকিসের ইসলামের প্রতি যে অগাধ শ্রদ্ধা ছিলো পরবর্তীতে সেটা সম্ভবত আর থাকেনি। তবে ইসলাম যে বিশ্বময় বিজয় লাভ করবে এই খোদায়ী সত্যতার কথাও তিনি ভুলতে পারেননি। একারণে তিনি মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে আশু পরাজয় এড়াতে চাচ্ছিলেন।

আবার এত বড় সেনা শক্তি থাকতে নগন্য সংখ্যক কিছু লোকের সঙ্গে সন্ধি করতে হচ্ছে এটা তাকে ভারসাম্যহীন করে তুলছিলো। তাই তার মনোভঙ্গি এমন আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।
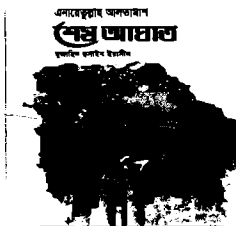
মুকাওকিস আশা করছিলেন তার পাঠানো পাদ্রীর প্রতিনিধি দলটি সন্ধ্যার আগেই জবাব নিয়ে ফিরে আসবে।

ওরা লম্বা কোন সফরে যায়নি। শুধু নদী পার হয়ে ওপারে যাওয়া। কিন্তু দলটি সেদিন এলো না।

মুকাওকিস বললেন, মুসলমানরা কি তাহলে দলটিকে বন্দি করেছে, না হত্যা করেছে? কিন্তু মুসলমানরা তো এধরনের কাজ করতে পারে না কখনো।

দুই দিন পর প্রতিনিধি দল ফিরে এলো। মুকাওকিস প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, এই দুদিন ওরা ওখানে কি করেছে?

'ওরা আমাদেরকে পূর্ণ সম্মান দিয়ে ওখানে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন।' পাদ্রী বললেন, আমি এতটুকু বুঝতে পেরেছি, মুসলমানরা দুই দিন আমাদের ওখানে এভাবে আটকে রেখেছে একারণে, যাতে আমরা নিজ চোখে তাদের মনোবল ও কঠিন সংকল্প দেখে আসি। আমরাও কৌতুহল বশতঃ তাদের সেনাদের দেখে এসেছি। তাদের অবস্থান, চলা ফেরা, অভ্যাস ও বৈশিষ্টগুলো দেখে এসেছি। আমরা সবাই মুসলমানদেরকে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখেছি।'

মুকাওকিস এব্যাপারে আর কোন কথা শুনতে চাইলেন না। তিনি সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর জবাব শুনতে চাচ্ছিলেন। পাদ্রী মুকাওকিসের হাতে আমর ইবনে আস (রা.) এর লিখিত জবাব দিয়ে সেটি পড়তে অনুরোধ করলেন।

আমর ইবনে আস (রা.) লিখেছেন,

'আমি এর আগে আরেকবার মিসরের বাদশাহকে জানিয়ে দিয়েছি। আমরা পূর্বে যে শর্তগুলো উল্লেখ করেছিলাম একমাত্র সে শর্তেই আমাদের সন্ধি হতে পারে। এই শর্তগুলো যেহেতু আমার নিজের পক্ষ থেকে নয় বরং ইসলামের পক্ষ থেকে আরোপকৃত, তাই এতে আমি কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন, যোগ বিয়োগ কিছুই করতে পারবো না।'...

'আকেরবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, যেকোন তিনটি শর্তের যে কোন একটি মেনে নিলেই সন্ধি-সমঝোতা হতে পারে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও তখন তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে। তোমদের ও আমাদের একই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।....

'এটা না মানলে দ্বিতীয় উপায়টি হলো, আমাদের আনুগত্য গ্রহণ করে নাও এবং আমাদের নির্ধারণ করা জিযিয়া-কর আদায় করো।'...

'এটাও মনপুত: না হলে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করতে পারবো না। বরং আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো এবং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন আল্লাহ তাআলা। সবচেয়ে উত্তম ও কল্যাণকর ফায়সালাকারী একমাত্র আল্লাহ। যার মহান বাণী আমরা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। যা শুনলে ও মানলে তোমরা দুনিয়ার অপদস্থতা থেকেও বাঁচবে। পরকালেও এর সুফল পাবে।'
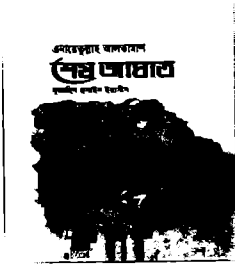
মুকাওকিস আমর ইবনে আস (রা.) এর এই জবাবী পয়গাম সবার সামনেই পড়লেন। তার চেহারায় বিস্ময়, আর হতাশার মিশ্র ছাপ ফুটে ওঠলো।

'তোমরা সবাই কি বুঝতে পারছো না, এটা সে লোকের জবাব যে সন্ধির ব্যাপারে এর চেয়ে ভালো কোন কথাই বলতে পারে না?' মুকাওকিস অনেকটা তিক্ত কণ্ঠে বললেন,

'একটু লক্ষ করে দেখো তো, এ লোক কেমন ভাষায় চিঠিটি লিখেছে? এতো এমন এক বিজয়ী পুরুষের পয়গাম যে আমাদের ওপর অনায়াসে হুকুম জারি করছে। এই আরবদের অহঙ্কার অহমিকা দেখো। ধন-সম্পদ, সোনা জহরত এসবের মূল্য যেন এরা বুঝেই না।'

মুকাওকিস প্রতিনিধি দলটির দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণপর জিজ্ঞেস করলেন, ওরা যে দুদিন মুসলমানদের ওখানে ছিলো, মুসলমানরা কি এভাবেই অহমিকা আর হুমকি দিয়ে কথা বলেছে?

'না, ফরমাওয়ারে মিসর!' প্রতিনিধি দলের প্রধান পাদ্রী বললেন, 'মুসলমানদেরকে আমি সমষ্টিগতভাবে এই প্রথম দেখেছি। আমি বলবো এমন এক জাতিকে আমি দেখে এসেছি যারা জীবনের চেয়ে অনেক বেশি মৃত্যুকে পছন্দ করে, গর্ব অহঙ্কারের চেয়ে বিনয় ও উদারতাকে অধিক চর্চা করে।...... তাদের চাল চলন, জীবন যাপন, আদর্শ ও চরিত্রে দাপট বা উগ্রতার লেশ মাত্রও নেই।'...

'তাদের মধ্যে সম্ভবত এমন একজনও নেই যাদের মধ্যে এই দুনিয়া ও এর মাটির প্রতি সামান্যতম আগ্রহ আছে। ওরা এক সঙ্গে বসে খাবার খায় এবং বসে সরাসরি মাটিতে।.....

'তাদের মধ্যে উচ্চপদস্থ আর অধীনস্ত, সালার ও সিপাহীর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক নেই। না আচরণগত না অবস্থানগত। সবাই তো একধরনের খাবার গ্রহণ করে। পোশাকও সবার একই মানের। খাবারের পর সবাই এক সঙ্গে মিলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।'...

'আমি মুসলমানদেরকে এই প্রথমবার এক সঙ্গে ইবাদত করতে দেখেছি। এটাকে তারা সালাত-নামায বলে। সিপাহ্‌সালার ইমামতি করেন। অন্যরা তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

এর আগে অবশ্য সবাই ওযু করে পবিত্র হয়ে নেয়। নামাযে ইমাম যা করে অন্যরা তাই করে। এক সঙ্গে সবাই রুকুতে যায়। সিজদায় যায় এক সঙ্গে এবং এক সঙ্গে উঠেও সবাই। ওদের এই অনড় নিয়মতান্ত্রিকতা ও অনিন্দিত শৃঙ্খলা দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।'...

'কী আশ্চর্য! নামাযে সালার, কমাণ্ডার, জেনারেল আর সাধারণ সৈনিক এক সঙ্গে দাঁড়ায়। সালার, কমাণ্ডার, জেনারেল, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে আর সাধারণ সৈনিকরা পেছনের সারিতে দাঁড়াবে এ ধরণের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সামনের সারিতে যে কেউ দাঁড়াতে পারে। সবার জন্য সব অবস্থান উন্মুক্ত।'

আগ থেকেই তো মুসলমানদের প্রতি মুকাওকিস প্রভাবান্বিত ছিলেন। তিনি একজন পাদ্রীর মুখে যখন মুসলমানদের ব্যাপারে এমন উচ্চাস ভরা গুণাগুণ শুনলেন তখন তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি মাথা উঠালেন। সবার দিকে পালা করে তাকালেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

মুকাওকিস আর যাই হোক তিনিই তো মিসরের বাদশাহ। না জানি তিনি কি হুকুম দেন এ চিন্তাটাও সবার মধ্যে রয়েছে। তিনি যখন কথা বললেন, সবাই দারুন হয়রান হয়ে উঠলো।

'শপথ সেই খোদার যার নামে শপথ করা হয়।' মুকাওকিস যেন তার অজান্তেই বলতে লাগলেন,

'এই মুসলমানরা যদি কোন পাহাড়কেও তার জায়গায় থেকে হটানোর সংকল্প করে তাও তারা হটাতে পারবে। আমি এ সত্য স্বীকার করছি, যুদ্ধের ময়দানে তাদের মোকাবেলা করে সফল হওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে যেসব গুণ-বৈশিষ্ট আছে আমাদের মধ্যে তা নেই।'...

'এই বাস্তবতার ওপর চিন্তাভাবনা করে দেখো ভাইয়েরা আমার। সন্ধি চুক্তি করার সময় এখনই। কারণ, ওরা এখন নীলনদের যে ঘেড়াওয়ের মধ্যে রয়েছে কয়েক দিনের মধ্যেই ওরা এই সাময়িক প্রতিকূল অবস্থান থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন সন্ধিচুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়বে। ওরা সন্ধির আলোচনায় বসতেই রাজি হবে না।'

সবাই দেখলো মুকাওকিস সন্ধির ওপরই জোর দিচ্ছেন। তিনি মিসরের শাসনকর্তা। অন্য কোন অভিপ্রায়ও যদি তিনি ব্যক্ত করতেন তাও প্রত্যাখ্যান বা বিরোধিতা করার সাহস কারো হতো না। তিনি সবার পরামর্শ চাইলেন।

'এখনো এর সুযোগ রয়েছে' উপস্থিতিদের একজন বললো, 'আপনি মুসলিম সিপাহসালারকে লিখেছিলেন, তিনি যেন আলোচনার জন্য কোন প্রতিনিধিদল পাঠান। এর তো কোন জবাব তিনি দেননি। এখন কি এটা ভালো হয় না যে, মুসলিম সেনাপ্রধানের কাছে আরেকটি পয়গাম পাঠানো যাতে তিনি কোন প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য পাঠান?'

সবাই পরামর্শ সমর্থন করলো, মুকাওকিস তখনই এমর্মে পয়গাম লেখালেন,

'আপনি আপনার প্রতিনিধি দল পাঠালেন না। পাঠাবেন কিনা এব্যাপারেও কিছু বললেন না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য শিগগিরই আপনার প্রতিনিধি দল পাঠান। আমি অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছি'।
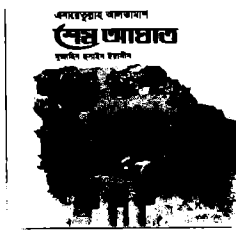
মুকাওকিসের এপয়গাম সাধারণ এক পত্রদূত আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি পত্রদূতকে বাইরের এক তাবুতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সালারদেরকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন।

তাদের সবাইকে মুকাওকিসের পয়গাম পড়ে শোনালেন।

'আগে এটা ভেবে দেখো, এলোক সন্ধির পেছনে পড়লো কেন?' আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, 'আমার মতে মুকাওকিস এটা অনুভব করতে পেরেছেন, তার সৈন্যরা মনোবল ও মানসিক দিক দিয়ে লড়াইয়ের উপযুক্ত নয়। আরেকটা ব্যাপার হলো মুকাওকিস সন্ধির কথা বলে ধোকা দিয়ে সময় ক্ষেপন করছেন।

'আর সময় ক্ষেপনের কারণ হলো, এসময়ের মধ্যে সেনাসাহায্য পৌঁছে যাবে। আমাকে পরামর্শ দাও, আমি কি আমাদের প্রতিনিধি দল তার কাছে পাঠাবো, না সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবো তার পত্রদূতকে? কোন শর্তের ব্যাপারে আমি নরম হতে পারবো না। এটা আমার এখতিয়ারের বাইরে।'

'সময়-সুযোগ আমাদেরও দরকার।' এক সালার বললেন, 'নীলনদের উম্মত্ততা তো কমে গেছে। কিন্তু পানি যা প্লাবনের আকারে নদীর বাইরে বয়ে গেছে তা এখনো চলে যায়নি। আমরা এক প্রকার পানির ঘেরাওয়ের মধ্যে রয়েছি। মুকাওকিসের এ হুমকিটা অমূলকও নয়'।

'প্লাবনের পানি নেমে যাওয়া বা একেবারে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। না হয়, এ সময় লড়াই বাঁধলে আমরা ভাসমান অবস্থায় লড়তে পারবো না। এমনকি কর্দমাক্ত মাটিও আমাদের লড়াইয়ের জন্য ভীষণ প্রতিকূল ক্ষেত্র।'

'এ বিষয়টাও চিন্তা করে দেখুন, মাননায়ী সিপাহসালার!' আরেক সালার বললেন, এটাও তো আল্লাহর হুকুম যে, শত্রুদল সন্ধির জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে তাকে পূর্ণ সুযোগ দাও এবং সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করে নাও। শর্ত হলো, তোমাদের আরো প্রকৃত শর্ত দুশমনের মেনে নিতে হবে।'

আলোচনা শেষে আমর ইবনে আস (রা.) দশ জনের এক প্রতিনিধি দল মুকাওকিসের সঙ্গে সন্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য নির্বাচন করেন। এর নেতৃত্বে দেয়া হয় প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) কে। তিনি হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর সঙ্গে আসা সেনাদলের একাংশের সালার।

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) দৈহিক অবয়ব খর্বকায়। বর্ণ কালো। তবে বুক ও কাধ বেশ চওড়া। শারীরিক গঠন বেশ মজবুত।

আমর ইবনে আস (রা.) মুকাওকিসের পয়গামের জবাব দিয়ে পত্রদূতকে বিদায় করে দিলেন। জবাবে বলা হয়, তার এক প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য মুকাওকিসের কাছে আসছে।

তারপর আমর (রা.) প্রতিনিধি দলের সব সদস্যকে ডাকলেন। তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিলেন। কি বলতে হবে এবং কোন কোন শর্ত আরোপ করা হবে সেটা উবাদা (রা.) কে বলে দিলেন। উবাদা (রা.) কে সিপাহসালার শক্ত করে বলে দিলেন, খবরদার, কোন শর্তে যেন সামান্যতম শৈথল্য প্রদর্শন না করা হয়।

পর দিন প্রতিনিধি দল মুকাওকিসের কাছে পৌঁছে গেলো। সেখানে মুকাওকিসের উপদেষ্ঠা ও জেনারেলরাও ছিলো। উবাদা ইবনে সামিত (রা.) কথা বলা শুরু করলেন। কিন্তু মুকাওকিস তার দিকে অত্যন্ত হীন চোখে তাকালেন।

'এমন কালো ও খর্বকায় একটি লোককে আমার সামনে কেন আনা হলো?' মুকাওকিস নাক ছিটকে মুখ কুচকে বললেন, 'তাকে নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। অন্য কেউ কথা বলো আমার সঙ্গে।'

উবাদা (রা.) এর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। প্রতিনিধি দলের একজন বললো, প্রতিনিধি দলের সবার নেতা হিসাবে তাকে পাঠিয়েছেন সিপাহসালার। ইনিই কথা বলবেন। তাঁর প্রতি আমাদের সবার শতভাগ আস্থা আছে।

মুকাওকিস কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রতিনিধি দলের সবাই এক সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। তারা মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, উবাদা ইবনে সামিত (রা.) তাদের নেতা। তার উপস্থিতিতে অন্য কেউ কথা বলবে না। মুকাওকিস একেবারেই চুপসে গেলেন।

ঐতিহাসিক বাটলার লিখেছেন,

মুকাওকিস এভাবে অভদ্র ভাষায় কথা বলার লোক ছিলেন না। কিন্তু তিনি খুবই অসৌজন্যমূলক কথা বলে ফেললেন। আসলে তিনি চাচ্ছিলেন প্রতিনিধি দলের লোকদের মধ্যে কোন এক ছুতোয় বিরোধ সৃষ্টি করতে। সম্ভবত এটাও দেখতে চাচ্ছিলেন, মুসলমানদের মধ্যে কতটা শৃঙ্খলাবোধ আছে এবং এরা তাদের সিপাহসালারের হুকুম শতভাগ পালন করেন কিনা।
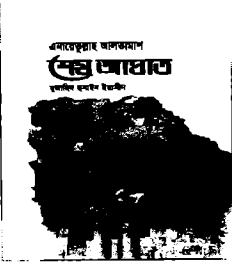
অবশেষে মুকাওকিস সম্মতি জানালেন, উবাদা ইবনে সামিত (রা.) ই তার সঙ্গে কথা বলবেন।

'ফরওয়ারে মিসর!' উবাদা ইবনে সামিত (রা.) মুকাওকিসের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন,

'আমরা মুসলমান এবং ইসলামের সব বিধি বিধানের অনুসারী। ইসলাম কাউকে কারো বর্ণ বা পোশাক দেখে সম্মানিত বা অসম্মানিত কিংবা ছোট বড় ভাববার অনুমতি দেয় না। এই দুনিয়ার জাকজমক ও সাজ-সজ্জার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'...

'আমাদের আত্মিক সম্পর্ক বা সব আগ্রহ পরকালের সঙ্গে। আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা আমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে। কোন লোভ বা ধনভাণ্ডারের পাহাড়ও আমাদেরকে এ পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না'।...

'যা হোক, আপনি আমাদেরকে আসতে বলেছেন, তাই আপনার কাছে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। প্রথমে আপনার বক্তব্য বা দাবি-দাওয়া পেশ করুন।'

'আমি আমার দাবিনামা তোমাদের সিপাহসালারের কাছে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি।' মুকাওকিস বললেন, 'তোমাকেও বলে দিচ্ছি এবং তোমার কর্তব্য হলো তোমাদের সিপাহসালারের মাথায় আমার কথাগুলো গেঁথে দেয়া'।...

'তোমরা এই আত্মতুষ্ঠিতে ভুগছো যে, রোমের ফৌজ এখানে যা আছে তাই। যাদেরকে তোমরা প্রতিটি ময়দানে পরাজিত করে এসেছো। আমাদের কাছে শুধু এই ব্যবিলনের কেল্লাগুলোতে এত বেশি ফৌজ রয়েছে এবং তারা এত শক্তিশালীও তার এমন বিশাল সংখ্যাক ফৌজ ধেয়ে আসছে যে, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না।'...

'তোমরা সংখ্যায় খুবই নগন্য। তা ছাড়া আমি জানি তোমরা বিভিন্ন কারণে দুশ্চিন্তায়ও অস্থির। আর কিছু দিন গেলে তোমরা তোমাদের সেনাদের স্বাভাবিক চাহিদাও পূরণ করতে পারবে না। তোমরা এর যোগ্যই থাকবে না। আমি যে বার বার তোমাদের এই সেনাবাহিনীর ব্যাপারে নানান দুর্বলতার বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছি, তা শুধু এজন্য যে, তোমাদের এই হাতে গোনা সৈন্যদের ওপর আমার রহম এসে গেছে।'

'তোমাদের এই সেনারা আমার সেনাবাহিনীর হাতে কচুকাটা হয়ে খতম হয়ে গেলে আমার বড় আফসোস হবে। কারণ, আমি একে পাপ মনে করি। আমি তখনই খুশি হবো যখন তোমরা আমার সঙ্গে সন্ধি করে নেবে।

'আমি তোমাদের প্রত্যেক সৈন্যকে দুই দীনার ও সালারকে একশ দীনার এবং খলীফাকে এক হাজার দীনার দেবো। আমার কাছ থেকে এটা উসুল করে মিসর থেকে চলে যাও। রোমীয় ফৌজের ক্রোধ ও গজব থেকে বাঁচো'।

ঐতিহাসিকরা কিছু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, মুকাওকিস এক দিকে মুসলমানদের ব্যাপারে প্রশংসা করতেন এবং তাদের সন্ধির ব্যাপারে ছিলেন প্রায় ব্যাকুল।

কিন্তু কোন মুসলমান তার সামনে এলে হুমকি ধমকি ও উগ্র ভাষায় কথা বলতেন। হয়তো এটা তার ভারসাম্যহীন ভাবনা ছিলো যে, মুসলমানরা কোন লোভের মুখে না পড়লে ভয় দেখালে নিশ্চয় মিসর ছেড়ে দেবে।

যা হোক উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হিসাব করে দেখলেন, মিসর ছাড়ার বিনিময়ে মুকাওকিস ত্রিশ হাজার দীনার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

এর চেয়ে বেশি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি সেটা গ্রহণ করতে পারবো না।' উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বললেন, 'আমি সিপাহসালারের স্পষ্ট হুকুম নিয়ে এসেছি। আপনার হুমকি-ধমকিতে আমাদের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। আমাদের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। আমরা কখনো এটার গুরুত্ব দিই না যে আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত আর দুশমনের সৈন্য সংখ্যা আমাদের চেয়ে কত বেশি।'...

'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুসংবাদে দিয়েছেন, 'অধিকাংশ সময়ই এটা ঘটেছে, ছোট ছোট দল আল্লাহর হুকুমে অনেক বড় বড় দলের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীল ও স্থির বিশ্বাসী লোকদের সঙ্গেই থাকেন।'...

'আপনি আমাদের সেনাবাহিনীর যে, অভাব অনটন ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের কথা বলেছেন তা আমাদের জন্য অর্থহীন ব্যাপার। আমরা দুনিয়ার জীবনের স্বচ্ছলতা আর অসচ্ছলতার পরোয়া করি না। কারণ, আমাদের পার্থিব অপার্থিব সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত'।

'আমাদের সিপাহসালার আমাদের আমিরও। তিনি পরিষ্কার ভাষায় আপনাকে বলে দিয়েছেন, আমাদের শর্ত তিনটি। এর মধ্যে যেটা ইচ্ছে সেটা আপনারা মেনে নিন। এছাড়া অধিক কথা-বার্তা অর্থহীন ও সময় ক্ষেপণ মাত্র।'...

'এসব আলোচনা বৈঠক থেকে অবশেষে কোন কিছুই বেরিয়ে আসে না। আমাকে আমার আমীর, আমার আমীরকে আমীরুল মুমিনীন এবং আমীরুল মুমিনীনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলে দিয়েছেন, তা আপনার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।'...

'আপনারা ইসলাম গ্রহণ করে নিন এবং এখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে দিন। আমরা আরবে ফিরে যাবো। আর না হয় জিযিয়া-ভূমি ও নিরাপত্তার কর আদায় করুন। আমরা পুরো মিসরবাসীকে আমাদের হেফাযতে নিয়ে নেবো। সবার সমান নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো। এদুটি প্রস্তাব যদি মেনে না নেন তবে তো আমাদের ও আপনাদের মধ্যে ফায়সালা করবে তলোয়ারই।'

আলাপ আলো৷ না কিছু দূর এগিয়ে চললো। মুকাওকিস উবাদা ইবনে সামিতকে আরো কিছু লোভ৲ায় প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু উবাদা (রা.) সে সব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, শুধু তারই নয়, তার সিপাহসালার এবং খলীফা আমীরুল মুমিনীনের এতটুকু অধিকার নেই যে, ইসলামের এসব শর্তের ব্যাপারে সামান্যতম কাটছাট করবেন।

মুকাওকিস তার উপদেষ্টা ও জেনারেলদের সঙ্গে আলোচনা করে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের কোন শর্তটি পছন্দের বা মেনে নেয়ার মতো।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো, না তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, না তারা জিযিয়া কর দিতে প্রস্তুত।

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) আর কথা না বাড়িয়ে তার প্রতিনিধি দল নিয়ে চলে গেলেন।
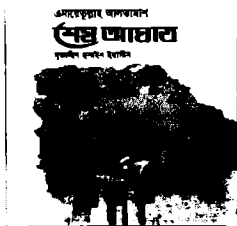
মুসলিম প্রতিনিধি দল চলে যাওয়ার পর মুকাওকিস তার উপদেষ্টা ও জেনারেলদেরকে নিয়ে আরেক দফা আলোচনায় বসলেন।

'আমি আবারো বলছি, মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের সন্ধিচুক্তি হওয়া উচিত।' মুকাওকিস সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'তোমরা তো দেখেছোই এরা কোন লোভ, মোহতেও পা দিচ্ছে না, আবার হুমকি ধমকিকেও পাত্তা দিচ্ছে না।'

'তাদের আরোপিত কোন শর্তটি আপনি মেনে নিতে চান? জেনারেল জারেজ মুকাওকিসকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে পারবো না।' মুকাওকিস বললেন, 'আমি আমার মতামত জানাবো। তোমরা সবাই এটা ভালো করে ভেবে দেখবে। আজ আমি তোমাদেরকে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, এই মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে টিকে থাকা তোমাদর পক্ষে সম্ভব নয়।'...

'এর তিক্ত অভিজ্ঞতা তোমাদের তো হয়েছে। তাই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার অবাস্তব চিন্তা ভাবনা মাথা থেকে বের করে দাও। ইসলাম তো গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু এর পরের শর্তটি মেনে নাও।'

'ফরমাওয়ারে মিসর!' এক উপদেষ্টা সবিনয়ে বললো, 'আপনার কথার অর্থ হলো, আমরা জিযিয়া দিতে রাজি হয়ে যাবো, তারপর মুসলমানদের গোলাম হয়ে জীবন অতিবাহিত করবো?'

'যে গোলামির কথা বলছো সেটা এতটুকুই হবে যে, তোমরা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেবে।' মুকাওকিস বললেন, 'কিন্তু মুসলমানরা কখনো তোমাদেরকে গোলাম মনে করবে না। তোমাদের প্রাপ্য অধিকার-সম্মান শতভাগ প্রতিষ্ঠা করবে।'

'কিন্তু তোমরা যদি লড়াই চালিয়ে যাও, মুসলমানদের ওপর আঘাত করো তাহলে কি তাদের পাল্টা আঘাত সইতে পারবে? মুসলমানরা নিশ্চিত তোমাদেরকে পরাজিত করবে। তখন তোমাদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত অসম্মানজনক হবে। তখন না তোমাদের জান হেফাযতে থাকবে না মাল হেফাযতে থাকবে। তখন তোমরা মুসলমানদের আসল গোলামে পরিণত হবে।'

'এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।' জেনারেল থিয়োডর বললো এবং এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো।

থিয়োডরকে উঠতে দেখে অন্য সবাই উঠে দাঁড়ালো। তারপর সবাই মুকাওকিসকে সেখানে একলা রেখে বেরিয়ে গেলো।

মুকাওকিস তাদেরকে আটাকোনোর চেষ্টা করলেন না। তিনি বুঝে গেলেন, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টার ব্যাপারে এখন আর তার সঙ্গী কেউ নেই।

জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলো, এখন তলোয়ারই সবকিছুর ফয়সালা করবে। অগত্যা মুকাওকিসকে তাদের সঙ্গ দিতে হলো। না হয় তার বিরুদ্ধে সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। কিবতী খ্রিস্টান সম্প্রদায় তো আগ থেকেই বিদ্রোহের জন্য মওকা খুঁজছে।

জেনারেলরা তাদের অধীনস্ত কমাণ্ডাদেরকে ডেকে বললো, যুদ্ধ অবশ্যই হবে এবং অবরোধের ওপর হামলা করা হবে। জেনারেলরা আর কোন কথাই গোপন করলো না। কমাণ্ডারদেরকে বলে দিলো,

এখন আর এই যুদ্ধকে আগের মতো শুধু দুটি দলের লড়াই যেন মনে না করা হয়, যেমন আগে মনে করা হতো যে, মুসলমানরা হামলে পড়লেই আমাদের ফৌজ পালাতে শুরু করতো।

'এটা মাথায় রেখো তোমরা!' জেনারেলরা তাদের অধীনস্ত কমাণ্ডার ও কর্মকর্তাদেরকে বলতে লাগলো, 'আমাদের বাদশাহ মুকাওকিস আমাদেরকে মুসলমানদের গোলাম বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করার সওদা করে নিয়েছেন তিনি।'

জেনারেল কমাণ্ডারদেরকে আরো কিছু কথা বলে উস্কে দিলো এবং বললো, 'তোমাদের যার যার দলের সৈন্যদের বলো, তোমরা যুদ্ধবন্ধি হয়ে গেছো। তোমরা ভেড়া-বকরির মতো মুসলমানদের গোলাম হয়ে যাবে। তোমাদেরকে মানুষের কাতার থেকে ছুড়ে মেরে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে।তারপর তোমরা তাদের জন্তুপালের মতো হয়ে যাবে। আর মুসলমানরা তোমাদের যুবতী মেয়ে ও সুন্দরী স্ত্রীদের সঙ্গে কি ব্যবহার করবে তা তো জানোই'।

কমাণ্ডাররা এসব কথা বলে যার যার ইউনিটের সৈন্যদের উত্তেজিত করে তুললো। এসব কথা সাধারণ সৈন্যদেরকে এমনভাবে উস্কে দিলো যে, যারা এক সময় মুসলমানদের নাম শুনলে ভয়ে কেঁপে উঠতো এবং তাদের আনুগত্য মেনে নেয়ার কথাও বলতো, সেই তারাই মুসলমানদের বেপরোয়া দুশমন হয়ে গেলো। কমাণ্ডারদেরকে চড়া গলায় বললো, মুসলমাদের সঙ্গে তারা সমানে সমানে লড়াই চালিয়ে যাবে।
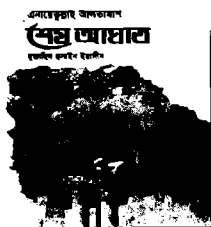
মুসলিম প্রতিনিধি দল চলে যাওয়ার পর মুকাওকিস তার বিশ্বস্ত এক লোক দিয়ে আরেকটি পয়গাম পাঠালেন আমার ইবনে আস (রা.) এর কাছে। পয়গামে তিনি চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য এক মাস সময় চেয়েছেন।

এতে আমর (রা.) এর এই সন্দেহই সত্য হলো যে, মুকাওকিস আসলে কিছু সময় হাসিল করতে চাচ্ছেন, যাতে তার অতিরিক্ত তাজাদম সৈন্য এ সময়ের মধ্যে ব্যবিলনে পৌছে যায়।

ব্যবিলনে যে রোমী ফৌজ রয়েছে তাতে অতিরিক্ত সৈন্যের কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মুকাওকিস সেনা সাহায্যের জন্য ব্যাকুল ছিলেন এ কারণে যে, ইস্কান্দারিয়া থেকে যে সৈন্যদল আসবে তারা তাজাদম তো হবেই এবং মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে এরা

কোন লড়াইতেও নামেনি। বযনতিয়া থেকে তো কোন সেনাদল আসার সম্ভাবনা ছিলোই না।

এ দিকে হেরাকলের নিয়োগকৃত আসফাকে আজম কীরাস তখন ব্যবিলনেই ছিলেন। তিনিও ইতিমধ্যে হেরাকলের বিরোধী দলে চলে গেছেন। কিন্তু মুসলানদের ব্যাপারে তিনি তীব্র বিদ্বেষী এবং কঠোর আপোষহীন।

আরেক আসফাকে আজম বিনিয়ামীনকেও তার দলে ভিড়িয়ে ব্যবিলন দুর্গগুলোয় যেসব কিবতী সৈন্য ছিলো তাদেরকে এমনভাবে উস্কে দিলেন যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা আগুন তপ্ত হয়ে উঠলো।

পুরো শহর যেন আচমকা গভীর থেকে জেগে উঠেছে। সৈন্যদের মতো শহরবাসীও তীর, ধনুক, বর্শা, তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের জন্য দৌড় ঝাপ শুরু করে দিলো। মনে হতে লাগলো এদের সামনে অসংখ্য পাহাড়সারি পড়লেও প্লাবনের মতো কোথাও হারিয়ে যাবে।

মুকাওকিস এখন তার মহলে বসে প্রায় নীরব দিন কাটাচ্ছেন। কখনো বাইরে বের হয়ে শহরের এই রণ-উত্তাপ দেখেন। কখনো মহলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শহরবাসী ও সৈন্যদের কাধে কাধ মিলিয়ে রণ-প্রস্তুতি দেখতে থাকেন।

'মিসরের মহামান্য বাদশাহ।' একদিন কীরাস মুকাওকিসের কাছে এসে বললেন, 'এখন তো আমরা মুসলমানদের নাম নিশানাও মুছে দেবো।'

'আসফাকে আজম কিরাস!' মুকাওকিস বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না এই ফৌজ ও শহরের লোকেরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে?'

'না, এমন ধারণা মনে স্থান দেবেন না;' কিরাস বললেন, 'আমি জানি আপনি সন্ধি চান। আর একথা শুনেই ওরা এমনভাবে জেগে উঠেছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে জান বাজি রেখে লড়ার শপথ করেছে। তাদের এই রণ-প্রস্তুতি আপনার বিরুদ্ধে নয়। তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখবেন না।'...

'আমাদের বিজয়ের জন্য এবং মুসলমানদের নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা চলছে। হতাশ হবেন না ফরমাওয়ারে মিসর।'

জবাবে মুকাওকিস কিছুই বললেন না। না উৎসাহমূলক কিছু বললেন, না নিরুৎসাহমূলক কিছু বললেন। তার ঠোঁটে ফুটে উঠলো ক্ষীণ হাসি। সে হাসিতে আনন্দের কোন লেস মাত্র ছিলো না। তাবে সুক্ষ্ম বিদ্রূপ ছিলো।

কেল্লার ভেতরের রোমীয় ফৌজ নিজেদের অধিক সংখ্যা ও শহরবাসীর জঙ্গি প্রস্তুতির ভরসায় দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তাদের আরেকটি ভরসা ছিলো নীলনদের মধ্যস্থিত রওজা কেল্লা থেকেও প্রয়োজনে সেনারা এসে যোগ দেবে। এতে তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।
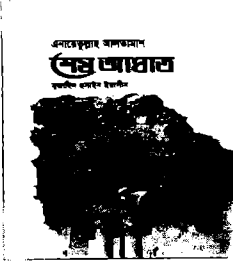
এক রাতের কথা। কেল্লার বাইরের দুনিয়া তখন নিদ্রাতুর স্বপ্নে বিভোর। এসময় রোমীয় সেনারা অতি নিঃশব্দে কেল্লা থেকে বের হলো। কিছু বের হলো নদীর দিক দিয়ে এবং নৌকায় চড়ে মুসলমানদের অবরোধ স্থলে এসে পৌঁছে গেলো।

আরেক দল অন্য ফটক দিয়ে বের হলো এবং পরিখার ওপর পাটাতন রেখে খুব সন্তর্পণে পরিখা পেরিয়ে গেলো।

রোমীয়রা এমন গোপনীয়তা রক্ষা করে এই তৎপরতা চালালো যে, মুসলমাারা তাদের সামান্যতম নড়া চড়াও টের পেলো না। দুজন মুজাহিদ প্রহরায় ছিলো এরাও রইলো বেখবর।

মুসলিম সেনাদের ওপর আচমকা কেয়ামত ভেঙ্গে পড়লো। রোমীয়দের এ হামলা যেমন আচমকা হলো তেমনি হলো অতি তীব্র।...

মনে হচ্ছিলো মুজাহিদরা জেগে উঠারও সুযোগ পাবে না। রোমীয়রা তাদেরকে চির নিদ্রায় শুইয়ে দেবে।

কিন্তু মুজাহিদরা আকাশ মাটি ও রাতের এই অন্ধকারকে এবং তারপর ইতিহাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে হামলা হতেই তারা শুধু জেগেই উঠলো না বরং এমনভাবে সামলে উঠলো যেন আগ থেকেই তারা প্রস্তুত ছিলো।

দেখতে দেখতে মশালগুলো জ্বলে উঠলো এবং তারা রাতকে দিন বানিয়ে ফেললো।

এটা আসলে সিপাহসালারের কৃতিত্ব। তিনি তার সালার ও সৈন্যদেরকে বলে রেখেছেন, এটা শত্রু দেশ। এখানে মুহূর্তের জন্যও অসর্তক হবে না। আর ঘুমুবেও এমনভাবে যেন একটি চোখ খোলা থাকে। ঘোড়া ও অস্ত্র এমনভাবে প্রস্তুত রাখবে যেন এখনই হামলা হবে।

মুসলিম সেনাদের আসল প্রাণ ছিলো এটাই যে, সিপাহসালারের হুকুমকে তারা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক আত্মা থেকে উৎসারিত হুকুম বলে মনে করতো এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে আল্লাহর নির্ঘাত শাস্তির যোগ্য বলে মনে করতো।

হামলাকারী রোমীয়রা সর্বপ্রথম যে ধাক্কাটা খেলো সেটা হলো, মুসলমানরা এমনভাবে জেগে উঠে তাদের বিরুদ্ধে রুকে দাঁড়ালো, যেন তারা জানতো যে, চোরাগুপ্তা এক হামলা আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় জেনারেলরা এই ভুলটাও করলো যে, বহু সংখ্যক শহরবাসী যারা স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধা হিসেবে দলে যোগ দিয়েছিলো তাদেরকেও নৈশ হামলায় পাঠিয়ে দিলো।

ওরা তীর তলোয়ার বর্শা তো ভালোই চালাতে পারতো। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে সুশৃঙ্খল হয়ে লড়াইয়ের যোগ্যতা তাদের ছিলো না। ওরা বরং নিজেদের সৈন্যদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো।

মুসলমানরা যখন পূর্ণ সজাগ হয়ে ক্রোধ ও আক্রোশ নিয়ে তাদের হামলা রুখে দিলো তখন সবার আগে রোমীয় স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো।

আমর ইবনে আস (রা.) সালারদেরকে আগেই পলে পলে মনে গেঁথে দিয়েছেন, অতর্কিত হামলা হলে সৈন্যদেরকে কেমন পজিশন ও বিন্যাসে নিয়ে লড়াতে হবে।

এজন্য রোমীয়রা হামলা করেই নিশ্চিত হয়ে যায়, মুসলমানরা আগ থেকেই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিলো। মশালগুলো যে এত দ্রুত জ্বলে উঠলো এটাও তাদেরকে আরো বিস্মিত করে তুললো।

মুসলমানদের এই ক্ষিপ্র তৎপরতা রোমীয়দের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো। আর এটাই তাদের জন্য বিপদ হয়ে উঠলো।

রোমীয়রা যেমনটা আশা করেছিলো যে, ঘুমের মধ্যে মুসলমানদের হামলা করে মুহূর্তের মধ্যেই কচুকাটা করে ফেলবে এবং তারা কোন প্রতিরোধই করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবে তারা দেখলো, শুধু প্রতিরোধই না, মুহূর্তের মধ্যে মুসলমানরা তাদের আসল রণ কৌশলে রুখে দাঁড়িয়ে গেছে।

এ অবস্থাটাই তাদেরকে বেসামাল করে তুললো। তাদের এই বেসামাল অবস্থা থেকে মুসলিম সেনারা পুরোপুরি ফায়দা উঠালো। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদেরকে উল্টো প্রতিরোধমূলক লড়াইয়ে নেমে যেতে বাধ্য করলো।

আমর ইবনে আস (রা.) তার সৈন্যদেরকে বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন। দুশমন কেল্লা থেকে বাইরে বেরিয়ে হামলা করলে কোন পদ্ধতিতে লড়তে হবে এবং কেমন চাল চালতে হবে।

দুশমন বাইরে হামলা করলেই এক ইউনিট সৈন্য দুশমনের পেছন দিকে চলে যেতে চেষ্টা করবে যাতে খোলা ফটক দিয়ে কেল্লায় ঢুকে পড়া যায়। আর কেল্লার ফটক যদি আগেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বাইরে থাকা শত্রু সেনাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে শেষ সৈন্যটিকে খতম করে ফেলা।

এধরনের লড়াই ও শত্রুদলের পেছন দিকে চলে যাওয়ার অভাবিত চাল গ্রহণের ব্যাপারে মুজাহিদদের বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে– অসংখ্য লড়াইয়ের ময়দানে।

এখন মুজাহিদরা যখন দেখতে পেলো, ব্যবিলনের কেল্লাগুলো থেকে পরিখার ওপর সেতু লাগিয়ে রোমীয় সেনারা বেরিয়ে এসেছে তখন মুসলমানরা সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হলো না।

মুসলমানরা রোমীয়দের পেছনে গিয়ে সেতুগুলো দখলে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। সিপাহসালার আগেই এক সালারকে তার ইউনিট নিয়ে একাজে নিযুক্ত করে দিয়েছেন।

ধীরে ধীরে তারা সফলও হলো। কিছুক্ষণ পর রোমীয়রা দেখলো মুসলমানরা তাদের পেছন দিক থেকে আসছে। এতে তাদের বেগতিক অবস্থা আরো বেড়ে গেলো।
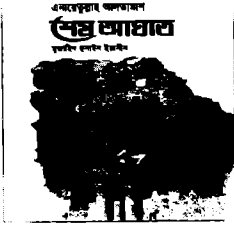
এখন লড়াইয়ের চেয়ে রোমীয়দের কাছে জান বাঁচানোটাই প্রধান হয়ে উঠলো। তারা পরিখা পেরিয়ে কেল্লায় ফিরে যেতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মুসলিম সেনারা তাদেরকে এত সহজে ফিরে যেতে দিলো না।

পরিখার এক আধটা সেতুর ওপর তখনো মুসলমানদের কব্জা প্রতিষ্ঠা হয়নি। সেখান দিয়ে কিছু রোমীয় সেনা জীবিত ফিরে যেতে পারলো।

পরিখার এধারে খুব কম রোমীয়ই প্রাণে বাঁচতে পারলো। কিছু রোমীয় পরিখার ওপর দিয়ে লাফিয়ে ওপারে যেতে চাইলো। কিন্তু মশালের উজ্জ্বল আলোয় তীরন্দজ মুজাহিদরা সহজেই তাদেরকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে লাগলো। এভাবে অনেক রোমীয় পরিখার পানিতে লাশ হয়ে আশ্রয় নিতে লাগলো।

কেল্লার লোকেরা যখন দেখলো, তাদের সৈন্যরা কেল্লার দিকে পালিয়ে আসছে এবং মুসলমানরা তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে আসছে, মুকাওকিসের হুকুমে তখন কেল্লার সবগুলো দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। যাতে রোমীয়দের পিছু পিছু মুসলমানরা কেল্লায় ঢুকে পড়তে না পারে।

শুধু মুসলমানদের আটকে রাখার জন্য মুকাওকিস তার অনেক সৈন্যকে বলির পাঠা বানালেন।

রাতের অন্ধকারের এ লড়াই ছিলো অসম্ভব রক্তক্ষয়ী। এমন রক্তক্ষয়ী একটি লড়াই রাতের অন্ধকার থাকতেই শেষ হয়ে গেলো।

আরো অনেক পর ভোরের সূর্য পূব আকাশে উঁকি দিলো। সকালের নরম আলোয় চার দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই লাশ আর লাশ। বিক্ষিপ্ত লাশের স্তুপ থেকে দু একজন যখমী আছড়ে পাছড়ে উঠে দাঁড়াতো। তারপর দু এক কদম হেঁটে গড়িয়ে পড়তো।

নীল নদীর যে পানি প্লাবনের সময় ডাঙ্গায় উঠে এসেছিলো এবং ঝিল ও পুকুর এবং ছোট ছোট বিলের আকারে দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছিলো, সেগুলোর পানি মৃত সৈনিকদের রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

পরিখায় বয়ে চলা পানিকে মনে হচ্ছিলো রক্ত স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই ভয়াবহ দৃশ্যে মুসলমানদের নারায়ে তাকবীর শ্লোগান চারদিক গুঞ্জরিত করে তুলছিলো।

শহরের লোকেরা কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়ে নৈশ হামলার লড়াইয়ের পরিণতি দেখছিলো। প্রাচীরের উচ্চতা থেকে এ দৃশ্য আরো কয়েকগুণ ভয়াবহ হয়ে তাদের অন্ত রাত্মা শুকিয়ে দিচ্ছিলো।

মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যে সংকল্প শহরের নারীরা পর্যন্ত করে রেখেছিলো, সেখানে তাদের পুরুষদের এই ধ্বংসাত্মক পরিণতি! সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলো না তারা! এই ভাবনা তাদের মধ্যে মৃত্যুনীল অতঙ্ক ছড়িয়ে দিলো।

মুকাওকিসকে জানানো হলো, শহরবাসী ও সৈন্যরা কেল্লার প্রাচীরগুলোর ওপর উঠে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখছে। এতে তাদের ভাঙ্গা মনোবল আরো টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

মুকাওকিস এটা শুনে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বাইরে বের হয়ে হুকুম দিলেন, কোন শহরবাসী ও সৈনিক যেন প্রাচীরে না চড়ে। শুধু ডিউটিরত সৈনিকরাই সেখানে থাকতে পারবে।

এ হুকুম শুনে মুহাফিজ ইউনিটের লোকেরা দৌড়ে প্রাচীরে গিয়ে লোকদেরকে হাকিয়ে নিচে নামিয়ে দিলো। সারা শহরে মুকাওকিসের এ হুকুম ঘোষণা করে দেয়া হলো। অনুমতি ছাড়া কেউ প্রাচীরের ওপর যেতে পারবে না। কেউ গেলে তাকে প্রাচীর থেকে নীচে ফেলে দেয়া হবে।
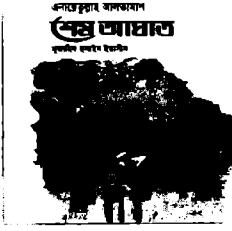
প্রাচীরের ভিড় কমে গেলে মুকাওকিস তার জেনারেল ও দুজন উপদেষ্টাকে ডেকে পাঠালেন। কীরাসকেও ডাকিয়ে আনলেন। তাদের সবাইকে নিয়ে প্রাচীরের ওপর চলে গেলেন।

'কী দেখতে পাচ্ছো তো, নিজেদের রক্ত গরম যুদ্ধের পরিণাম?' মুকাওকিস সবার দিকে তাকিয়ে তীর্যক কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা ওদের ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের ওপর হামলা করেছো। কিন্তু রক্ত স্রোত কলকল করে ঘোষণা দিচ্ছে, যেন ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাদের ওপর হামলা করেছে?'...

'আমি জানতাম, এমনই হবে। তোমরা নিজেদেরকে এভাবেই ধোকা দিয়ে কাল্পনিক তৃপ্তিবোধ করবে। বাস্তবতা দেখো, যা তোমাদেরকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আমাদের সেনারা তো এখন লড়াইয়ের যোগ্য নেই আর। তবে হ্যাঁ, ইস্কান্দারিয়া থেকে সেনা সাহায্য এসে গেলে তখন তোমরা মুসলামানদেরকে চ্যালেঞ্জ করার ঝুঁকি নিতে পারবে।'

জেনারেল ও উপদেষ্টারা নিঃশব্দে মুকাওকিসের কথা শুনতে লাগলো। বলার মতো কোন কথা ওদের মুখে জুটলোও না।

'এখনো আমি সন্ধির কথা বলবো।' মুকাওকিস বলতে লাগলেন, 'কিন্তু এখন সেপথে যেতে হলে আমাদেরকে জিযিয়া দেয়ার শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিচুক্তি একপ্রকার কিনে নিতে হবে'।...

'আমি সবাইকে মুসলমানদের গোলামে পরিণত করতে চাই একথা বলে যে তোমরা লোকদেরকে ও সৈনিকদেরকে দারুন ক্ষিপ্ত করে তুলে ছিলে সেটা আমি জানি। তোমদের জন্য এখন একমাত্র খোলা পথ হলো, লোকদেরকে গিয়ে বলো, জিযিয়া-করের শর্ত মেনে নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করতে।'

এবারও সবাই নিরুত্তর। মুকাওকিসের মতো তার জেনারেলরাও জানেন, মুসলমানরা যখন কোন কেল্লাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানায় সেটা জয় না করে তারা ক্ষ্যান্ত হয় না।

ইতিমধ্যে কেল্লা ও প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে যে বিশাল ফসলি ক্ষেত ও ফলের বাগান রয়েছে তাও মুসলমানদের দখলে চলে গেছে।

সবাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো, শহরবাসী ও সাধারণদেরকে এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে হবে যে, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির মধ্যেই এখন তাদের জীবন মরনের প্রশ্ন জড়িত।

'জন সাধারণকে আমরা জানিয়ে দিতে পারবো।' কীরাস বললেন, 'আপনি সন্ধির ব্যাপারে যে উদ্যোগ নিতে চান সেটা নিতে থাকুন।'

শহরবাসী ও সৈন্যদের অবস্থা তো এখন তাড়া খাওয়া হরিণের মতো। সারা শহর এখন আতঙ্কগ্রস্ত। গতকাল এবং গত রাতের আগে তারা কেল্লার ভেতর নিজেদেরকে শতভাগ নিরাপদ বলে ভাবতো। কিন্তু এখন এসব প্রাচীরের দিকে নজর পড়লেও তাদেরকে ভয় তাড়া করে।

মুকাওকিস জেনারেল ও উপদেষ্টাদেরকে তার মহলে নিয়ে গেলেন। সবাইকে নিয়ে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর নামে একটা পয়গাম লিখালেন। পয়গামে লেখা হলো,

'আমি নিরাপত্তার ও শান্তির বিনিময়ে আপনাদের দ্বিতীয় শর্তটি মেনে নিচ্ছি। আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিন। আমার দু চারজন সঙ্গী আমার সঙ্গে থাকবে এবং আপনারও দু চারজন সঙ্গী আপনার সঙ্গী হবেন। আমরা আলোচনার মাধ্যমে সন্ধি-সমঝোতার কোন একটা পথ বের করে ফেলবো। হয়তো আমরা ভালো কোন ফয়সালায় পৌছতে পারবো।'

এক পত্রদূতের মাধ্যমে তখন পয়গামটি পাঠিয়ে দেয়া হলো।

আমর ইবনে আস (রা.) তখন কেল্লার পাশে পায়চারী করছিলেন। এসময় মুকাওকিসের পয়গাম নিয়ে পত্রদূত তার কাছে পৌছলো।

তিনি তার সব সালারকে ডাকিয়ে এনে জরুরি বৈঠকে বসলেন। পত্রদূতকে একটু দূরে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার ইবনে আস (রা.) মুকাওকিসের পয়গাম সবাইকে পড়ে শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এব্যাপারে তাদের মতামত কী?

'সরাসরি প্রত্যাখ্যান করুন,' সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) বললেন, 'আপনি যে আগে ধারণা করছিলেন, এ লোক সময় হাতিয়ে নিচ্ছে এটা সম্পূর্ণ সঠিক।'

আমর (রা.) অন্যান্য সালারের দিকে তাকালেন। সবাই যোবায়ের ইবনে আওয়ামের কথায় জোর সমর্থন জানিয়ে বললো, সাক্ষাতের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করে দিন।
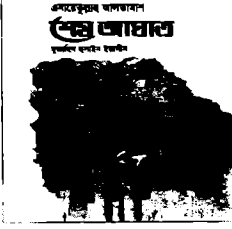
আমর ইবনে আস (রা.) আবার সবার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন। প্রত্যেকের চোখে মুখেই প্রত্যাখানের জোরালো অভিব্যক্তি ফুটে আছে।

'তোমরা কি আমার অপারগতার বিষয়টি নিয়ে ভেবেছো?' আমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি জানো না, আমীরুল মুমিনীন আমার প্রতি কি হুকুম দিয়ে রেখেছেন?...তিনি বড় পরিষ্কার ভাষায় হুকুম করেছেন, মিসরের বাদশাহ এই তিন শর্তের একটি যদি মেনে নেন তাহলে তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও।'...

'তবে মনে রাখবে, নিজেদের শর্ত শতভাগ বাস্তবায়ন করবে। এখন মুকাওকিস আমাদের একটি শর্ত মেনে নিয়েছেন। আমি আমীরুল মুমিনীনের হুকুমের খেলাফ কিছুই করতে পারবো না।

'এছাড়া এখানে আমরা কি অবস্থায় আছি তা দেখে নাও। আমরা এখনো পানিবন্দি হয়ে আছি। এটা ঠিক যে আমরা পরিখা অতিক্রম করে এসেছি। কিন্তু কেল্লাবেষ্টিত এই ব্যবিলন শহর জয় করা খুবই কঠিন কাজ।'...

'সামনের ফসলি জমি ও বিশাল বাগানও পানিতে ডুবে আছে। এখন আমরা অন্য কোন শহরেও অভিযান চালাতে পারবো না। পানি নেমে গিয়ে আশপাশ শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'...

'এখন দুশমনের কি অবস্থা সেটা অনুসরণ করে বের করো। সঙ্গে সঙ্গে দুশমনদের মানসিক অবস্থা বুঝার চেষ্টা করো। রোমীয়দের মনোবল, আত্মবিশ্বাস এখন ভেঙ্গে শতভাগ হয়ে আছে। আমরা ওদের যেসব বন্দি গ্রেফতার করেছি তারা বলেছে, নৈশ হামলায় শহরের লোকেরাও যোগ দিয়ে ছিলো। এ থেকে আমাদের এই ফায়দা হয়েছে যে, শহরের লোকদের মধ্যে মুজাহিদদের ভীতি গেঁথে বসেছে।'...

'তারপরও কথা থেকে যায়। সেটা হলো, ওরা কিন্তু এখন কেল্লার নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আছে। এ অবস্থায় আর কিছু দিন থাকলে ওদের মনোবল আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেত পারে। এর আগেই ওদের সন্ধির প্রস্তাব আমাদের মেনে নেয়া উচিত। না হয় এরা যদি এ অবস্থা কোনমতে সামলে উঠতে পারে তাহলে কিন্তু সন্ধির চিন্তা থেকে ওরা দূরে সরে যেতে পারে।'

সালাররা সবাই আমর ইবনে আস (রা.) এর বাস্তবসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনে একমত হয়ে বললেন,

'তাহলে মুকাওকিসের পয়গামের জবাবে বলে দেয়া হোক, তিনি যেখানে খুশি সেখানে এসে সাক্ষাত করুন।'
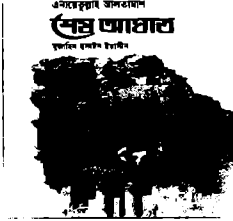
এই দীপাক্ষীয় সাক্ষাত কোথায় হয়েছিলো তার উল্লেখ ইতিহাসের কোথাও নেই। তবে সাক্ষাত ও আলোচনার কথা সব ঐতিহাসিকরাই লিখেছেন। মুকাওকিসের সঙ্গে দুজন জেনারেল ও দুজন উপদেষ্টা ছিলো, আর আমর ইবনে আস (রা.) এর সঙ্গে ছিলেন চারজন সালার।

আমর (রা.) আনুগত্য মেনে নেয়া ও জিযিয়া পরিশোধের ব্যাপারটি আরোপ করার বিষয় ছাড়া অতিরিক্ত কোন কথা মুকাওকিসকে বলেন না। জিযিয়ার পরিমাণ ঠিক হলো, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মাথা পিছু দুই দীনার প্রতি বছর মুসলিম খাজনা অফিসে জমা দেবে। নারী, বৃদ্ধ ও অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েকে এ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

জিযিয়ার পরিমাণ এত সামান্য দেখে মুকাওকিস বিস্মিত হলেন। আমর ইবনে আস (রা) মুকাওকিস থেকে এ ব্যাপারটি চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন যে, মুসলমানদের যে কোন দল যেখানে ইচ্ছা সেখানে কিছু দিন অবস্থান করতে পারবে।

যদি দুই চারজন মুসলমান বাধ্য হয়ে মিসরে কোথাও কারো বাড়িতে অবস্থান করে তাহলে ঘরের কর্তা যেন কমপক্ষে তিন দিন তাদেরকে আতিথেয়তা দান করে।

মুকাওকিসের কোন দাবী ছাড়াই আমর (রা.) চুক্তিনামায় এটাও অন্তর্ভূক্ত করে দিলেন,

মিসরের ভূমি, সহায় সম্পদ, গির্জা, উপাসনালয়, জল ও স্থলভাগে যে কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত স্থাপনা মিসরবাসীরই থাকবে। মুসলমানরা এগুলোর হেফাযত করবে।

মিসরবাসীর ব্যবসা বানিজ্যের ওপর কোন ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে না। ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে কোন দেশে ইচ্ছা ব্যবসায়ীরা যেতে পারবে এবং ভিন দেশ থেকে মালামালও আনতে পারবে।

মুকাওকিস এই চুক্তির ওপর রাষ্ট্রীয় সিলমোহর মেরে দিলেন। তারপর বললেন, এই চুক্তিনামার মঞ্জুরী নিতে হবে হেরাকলের কাছ থেকে। এর মধ্যবর্তী সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্যরা স্ব স্ব অবস্থানে থাকবে। মঞ্জুরী দ্রুতই চলে আসবে।

আলোচনা শেষে মুকাওকিস ব্যবিলন কেল্লায় ফিরে এসে তার দুই জেনারেল ও উপদেষ্টাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে বিস্তারিত হেরাকলকে কীভাবে জানানো যায়?

সাধারণত শাহী পত্রদূতই হেরাকলের নামে পাঠানো পয়গামপত্র নিয়ে যেতো। কিন্তু মুকাওকিসই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, এ ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, হেরাকল না জানি কেমন কেমন প্রশ্ন করে পত্রদূতকে হতভম্ব করে দেন। তারপর তো সে এর জবাব দিতে পারবে না।

সবাই এক সঙ্গে পরামর্শ দিলো, মুকাওকিস নিজেই বযনতিয়া চলে যাক। তিনিই একমাত্র হেরাকলকে বাস্তব অবস্থা বুঝাতে পারবেন।

মুকাওকিস নীল দরিয়ার পথে ইস্কান্দারিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখান থেকেই জাহাজে করে তার বযনতিয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু কি মনে করে যেন তিনি বযনতিয়ায় গেলেন না।

সন্ধি চুক্তির বিস্তারিত বিষয় লিখে এক পত্রদূতের মাধ্যমে বযনতিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। চুক্তিনামার মূল কাগজপত্রও পাঠিয়ে দিলেন। যাতে আমর ইবনে আস (রা.) ও মুকাওকিস যার যার স্বাক্ষর মোহররাঙ্কিত করে দিয়েছেন।

পত্রদূত দ্রুতই বযনতিয়ায় পৌঁছলো। হেরাকল মিসরের অবস্থা জানতে এতই আকুল ছিলেন যে, এক পত্রদূত মিসর থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছে শুনে নিজে বাইরে দৌড়ে এলেন এবং পত্রদূতের হাত থেকে এক প্রকার ছিনিয়ে নিলেন পয়গাম পত্রটি। তারপর দম বন্ধ করে পড়তে লাগলেন।

চুক্তির কথা পড়ে তার সারা শরীরে যেন আগুন লেগে গেলো।

সন্ধিচুক্তির বিস্তারিত যখন পড়লেন তখন তো ক্রোধে ফেটে পড়লেন। পত্রদূতকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

'তুমি কি আমাকে বলতে পারো?' হেরাকল রাগে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলেন,

'এই চুক্তিনামা কি শুধু ব্যবিলনের জন্য, না ঐ হতভাগা মুকাওকিস পুরো মিসরই মুসলমানদের ঝোলায় ভরে দিয়েছে? তুমি কি আমাকে বলতে পারো, এই জিযিয়া উসুল করে মুসলমানরা মিসর থেকে চলে যাবে, না মিসরের বাদশাহ বনে যাবে?'

'না, কায়সারে রোম!' পত্রদূত হাতজোড় করে বললো, 'আপনার দরবারে এই পয়গাম পেশ করা ছাড়া ফারওয়ারে মিসর আমাকে এ বিষয়ে আর কোন কথা বলেননি।'

'সে এখন কোথায়?' হেরাকল জিজ্ঞেস করলেন এবং নিজেই জবাব দিলেন, 'নিশ্চয় ব্যবিলন বসে ভোগ বিলাসে ডুবে আছে।'

'না, কায়সারে রোম! তিনি ইস্কান্দারিয়ায়...আপনার জবাবের অপেক্ষায় সেখানেই অবস্থান করছেন।' পত্রদূত জবাব দিলো।

'তুমি এখনই রওয়ানা হয়ে যাও। দ্বিগুণ শক্তিশালী পালতোলা জাহাজ তুমি প্রস্তুত পাবে। ইস্কান্দারিয়ায় খুব দ্রুত পৌঁছে যাবে। মুকাওকিসকে বলবে, এই জাহাজে করেই যেন আমার কাছে চলে আসে'; হেরাকল হুকুম দিলেন।
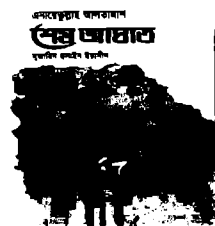
মুকাওসিক বযনতিয়ায় হেরাকলের শাহী মহলে পৌঁছে গেলেন। হেরাকল রাজকীয় নিয়ম মতো মুকাওকিসকে শাহী সম্মানটুকুও দিলেন না। মুকাওকিস মিসরের মতো এতো বড় দেশের গভর্ণর কিন্তু হেরাকল তার সঙ্গে এমন আচরণ শুরু করলেন যেন তিনি তার গোলাম।

হেরাকল কোন ভূমিকা ছাড়াই মুকাওকিসকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন,

'এই চুক্তিনামা কার্যকর হওয়ার পর মুসলমানরা কি মিসর ছেড়ে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ, মুকাওকিস কোন সমীহ না দেখিয়ে জবাব দিলেন, ওরা মিসর থেকে চলে যাবে।'

'তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো; হেরাকল বললেন, 'সন্ধিচুক্তিতে লেখা আছে মুসলমানদের যে কোন দল যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারবে এবং যেখানে খুশি সেখানে অবস্থান করতে পারবে। আর কয়েকজন মুসলমান কোন কারণে বা নিরূপায় হয়ে কোন মিসরীয়ের ঘরে উঠলে সেই মিসরীয়ের ওপর তার আতিথেয়তা দেয়া ফরয।...এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মুসলমানরা ফিরে যাবে না।'

এরপর হেরাকল মুকাওকিসকে বিভিন্ন বিষয়ে এত বেশি প্রশ্ন করলেন এবং অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছু উত্থাপন করে এত খুটিয়ে সে সব ব্যাপারে ব্যাখ্যা চাইতে শুরু

করলেন যে, মুকাওকিস ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। তাই বাস্তব বিষয়টি হেরাকলের কাছে তুলে ধরাটা তিনি জরুরি মনে করলেন।

'কায়সারে রোম!' মুকাওকিস বললেন,

'আপনি কি আরবদের শৌর্যবীর্য, বীরত্ব, দুঃসাহস ও সবকিছু বিনাশ করার কঠিন সংকল্প সম্পর্কে জ্ঞাত নন? তাদের সঙ্গে তো আপনার মোকাবেলা হয়েছে এবং আপনি এর পরিনামও স্বচক্ষে দেখেছেন, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন মুসলিম যোদ্ধা কি জিনিস?'...

'আপনি কি এব্যাপারে কখনো আমার সঙ্গে একমত হবেন না যে, এই মুসলমানদেরকে পরাজিত করা কমপক্ষে আমাদের এই সেনাবাহিনী দ্বারা সম্ভব নয়?'

'আমার সামনে সন্ধির চুক্তি ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিলো না। আমি ব্যবিলনকে তাদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। মুসলমানরা যদি লড়াই করে ব্যবিল নিয়ে নেয় তাহলে পুরো মিসর তাদের পদতলে চুমু খাবে।'

'দেখো মুকাওকিস!' হেরাকল বললেন, 'আগেও তুমি আমাকে শামের পরাজয়ের ব্যাপারে খোটা দিয়েছো। আর এখন তুমি মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিয়েছো। তাদেরকে জিযিয়া-কর দেয়ারও ফয়সালা করে ফেলেছো। সঙ্গে সঙ্গে মিসরে তাদের পরোক্ষ শাসনও মেনে নিয়েছো। অথচ সেই তুমি আমাকে শামের পরাজয়ের ব্যাপারে খোঁটা দিচ্ছো।'

মুকাওকিস যে তাকে খোঁটা দিচ্ছে না এবং বিদ্রূপ করছে না এব্যাপারে হেরাকলের এই ধারণা দূর করতে তিনি অনেক কিছুই বললেন।

তিনি আরো বললেন, তিনি এক বাস্তবতার বর্ণনা দিয়েছেন। কোন ধরনের খোঁটা দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হেরাকল তার কোন যুক্তিই মানতে রাজি হলেন না।

'তুমি কি মনে করছো, আমি মিসর থেকে এত দূরে রয়েছি বলে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না?' হেরাকল বললেন, 'প্রতিটি মুহূর্তের খবর আমি পেয়ে যাই'।

'মিসরে আমাদের এক লাখ সৈন্য রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র সাড়ে বার হাজার সৈন্য সম্মুখ যুদ্ধে লড়েছে। যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বাকি ফৌজের নেতৃত্ব দেয়া যায় তাহলে ঐ মুষ্ঠিমেয় মুসলমানকে মিসরের মরুভূমিতে পিষে দেয়া কোন ব্যাপারই হবে না।'...

'কিংবা তাদের নীল নদে সলিল সমাধি করা যাবে অতি সহজে। এতে নীলের প্রবাহে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। নীল নদ তার মতোই বয়ে যাবে।...

মিসরের আমাদের ফৌজ বড় বড় মজবুত কেল্লায় হেফাযতে রয়েছে। এই সামান্য কয়টা মুসলমান ওদের কিছুই বিগড়াতে পারবে না। আমার বিশ্বাস মুকাওকিস! এমন কোন গোপন ব্যাপার অবশ্যই আছে যেটা আমার কাছে লুকাচ্ছো।'

মুকাওকিসও আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলেন না। তিনিও রেগে গেলেন এবং দুই একটা কঠিন কথা শুনিয়ে দিলেন।

'তুমি তোমার সবচেয়ে বড় এবং লজ্জাজনক অপরাধের কথা শুনে নাও; হেরাকল আক্রোশে ফুলে উঠে বললেন,

'যাদেরকে তুমি আমার হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলে তারা তো আমার হাতে কতল হয়েছেই। এখন তোমার পালা। তুমি চরম কাপুরুষতা দেখিয়েছো এবং মিসর আরবদের জন্য খালি করে দিয়েছো।'

হেরাকল তো আগেই বলে রেখেছিলেন, তিনি সুযোগ পেলেই মুকাওকিসের কাছ থেকে চরম প্রতিশোধ নেবেন। এবার সে সুযোগ তিনি মোক্ষমভাবেই পেয়ে গেলেন।

তখনই তিনি শহরের হাকিম ও কতোয়ালকে ডেকে পাঠালেন। তারা দৌড়ে এলেন হেরাকলের কাছে।

'মুকাওকিসকে হাতে হাতকড়া ওপায়ে বেড়ি পড়িয়ে দাও।' হেরাকল হুকুম করলেন,

'তারপর তাকে সারা বযনতিয়া শহরে ঘুরিয়ে বেড়াও। এরপর কোন উম্মুক্ত স্থানে তাকে দাঁড় করিয়ে শহরের লোকদেরকে সমবেত করে ঘোষণা দাও যে, এ লোক গাদ্দার। সে মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হাতে মিসরকে তুলে দিয়েছে। ঘোষণার পর তার হাতকড়া খুলে দেবে এবং পায়ের বেড়ি রেখে দেবে। এরপর আরো লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে সালতানাতে রোম থেকে বের করে দেবে।'

হেরাকলের হুকুম পালিত হলো। মুকাওকিসকে হেরাকলের হুকুম মতে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে সালতানাত থেকে বের করে দেয়া হলো।...হেরাকল তার প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন।

মুকাওকিসকে যখন দরবার থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো তখন হেরাকলের রাণী মার্টিনা প্রায় ছুটে সেই দরবার কক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। এটাই এখন হেরাকলের শাহী দরবার ও শাহী আদালত।

রাণী মার্টিনা দেখলেন, হেরাকল ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছেন এবং চেহারা কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। সেখানে হেরাকরের এক সচিব ও দুই মুহাফিজ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। রাণী মাথায় ইঙ্গিত করতেই ওরা বড় দ্রুত বাইরে চলে গেলো।

'চমৎকার, দারুণ, শাহেনশাহে হেরাকল।' রাণী মার্টিনা তার এক হাতে হেরাকলের গলা জড়িয়ে এবং তার গালে আলতো করে চুমু খেয়ে বললেন, 'শাহে হেরাকল জিন্দাবাদ!...গাদ্দারদের এমন শাস্তিই দেয়া উচিত। মৃত্যু তো আসলে তেমন কোন শাস্তি না। এতে মানুষ দুনিয়ার ঝুট ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

'এই লোক মুকাওকিস মিসরের বাদশাহ বনে গিয়েছিলো। এখন অপদস্থতার মালা পড়ে ঘুরে বেড়াক। তার চেহারায় লেখা থাকবে– এ লোক গাদ্দার।'

'মার্টিনা!' হেরাকল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাকে এমন শাস্তি দিয়েও আমি খুশি হতে পারিনি। রোমের মাটি কখনো গাদ্দার জন্ম দেয়নি।'

'আরে ঝাটা মারুন ওর কপালে.' মার্টিনা বললেন, 'সে তো শুধু আপনাকে নয়, সালতানে রোমকে ধোকা দিয়েছে। নিজের মনের ওপর এত বড় মনস্তাপ আর দুঃখের বোঝা চাপিয়ে নেবেন না। আপনার চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি হারকিউলিনাসকে মিসর পাঠিয়ে দেবো।'

'ও' ওখানে গিয়ে কি করবে?' হেরাকল ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'ওখানে তো আমার অভিজ্ঞ জেনারেলরাও হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছে।'

'আমি জানি আপনার একথা বলার অর্থ কি' মার্টিনা বললেন, 'সে লড়তে পারে না এবং লড়াতেও হয়তো পারবে না। কিন্তু জেনারেলদের ওপর নজর তো রাখতে পারবে। কেউ গোপনে মুসলমানদের সঙ্গ সন্ধি বা ষড়যন্ত্র পাকায় কিনা। যেমন মুকাওকিস করেছিলো। হারকিউলিনাস এ কাজ খুব চমৎকার ভাবে করতে পারবে।'

'আসলে ওখানে আমার যাওয়া উচিত।' হেরাকল বললেন, 'অথবা কস্তন্তীনের যাওয়া উচিত। তুমি তো জানো কস্তন্তীন অভিজ্ঞ এক জেনারেল। কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থার এমন অবনতি ঘটেছে যে, না আমি যেতে পারছি না কস্তন্তীনকে পাঠাতে পারছি। কারণ, এখানকার শাসন কার্য কস্তন্তীনই চালাচ্ছে। আমি চাইও এটা যে, আমার এই ছেলে যেন সালতানাতে রোমের নিয়ন্ত্রণভার খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে।'

রাণী মার্টিনার চেহারায় অসন্তোষের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেলো। চেষ্টা করে সেখানে ঠোটের ওপর এক টুকরো হাসি ঝুলিয়ে নিলেন।

'আপনি ঠিকই বলেছেন; মার্টিনা কণ্ঠে খুশির ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'আপনার শারীরিক অবস্থা একটু বেশি খারাপ মনে হচ্ছে। আমি ডাক্তারকে ডেকে আনাচ্ছি। মিসরের চিন্তা মন থেকে সরিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হোন। ওখানে তা থিয়োডর ও জারেজের মতো বিখ্যাত জেনারেল রয়েছে।'

মার্টিনা ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য বেরিয়ে গেলেন।

হেরাকলের অবস্থা খুব দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। বার্ধক্য তাকে ছুয়েছে ঠিক; কিন্তু তার বার্ধক্য বুদ্ধির কোন ক্ষতিই করতে পারে নি। বরং এসময় বুদ্ধি আরো তীক্ষ্ম এবং চিন্তাশক্তি হয় আরো গভীর।

কিন্তু হেরাকল মেধা ও বুদ্ধির দিক দিয়েও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এর একটি কারণ এও ছিলো যে, তিনি তার রাণী মার্টিনা ও ছেলে হারকিলিউনাসকে ভয় পেতেন।

মুসলিম-অমুসলিম সব ঐতিহাসিকরাই হেরাকলের নেতৃত্বগুণ, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা নিয়ে প্রশংসা করেছেন। তারা লিখেছেন,

হেরাকল সূর্যের প্রবল দীপ্তি হয়ে সালতানাতে রোমের দিগন্তে উদিত হয়েছিলেন। রোম সাম্রাজ্যকে বহুদূর দূরান্ত পর্যন্ত তিনি বিস্তৃত করেছেন। এমনকি পুরো শাম।

মিসরকেও তার রোম সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারপর তিনি তার অগ্রাসী দৃষ্টি হানেন আরব বিশ্বের দিকে। মুসলমানরা না থাকলে এত দিনে আরবও তার সম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতো।

এই হেরাকলই তো কিসরায়ে ইরানের মতো ভয়াবহ যুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করে প্রথমে মিসর থেকে তাড়িয়েছেন, তারপর শাম থেকেও ইরানীদেরকে তাড়িয়েছেন। ইরাক পর্যন্ত তার সালতানাতের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

সেই হেরাকলই লক্ষ্য লক্ষ্য সৈন্যের যুদ্ধ শক্তি নিয়েও গুটি কয়েক মুসলিম সেনাদের কাছে পরাজিত হতে হতে আজ এ পর্যন্ত পৌছেছেন।

প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সীমাহীন দাপুটে শাহেনশাহে হেরাকল আজ সামান্য এক নারী মার্টিনাকেও ভয় পান। রাণী মার্টিনার কারণে সালতানাতে রোম হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে হেরাকল এখন মিসরকে বাঁচাতে মিসর যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারছেন না।

শাহী মহলের ডাক্তার তো শাহী হুকুমেরই অপেক্ষায় থাকেন। রাণীর হুকুম পৌছতেই ডাক্তার দৌড়ে এলেন। কিন্তু মার্টিনা তাকে হেরাকরের কাছে না নিয়ে নিজের কামরায় নিয়ে গেলেন।

এই ডাক্তার শাহী মহলের অন্যান্য রাজ কর্মচারীর মতোই বাদশাহ, রাণী, শাহজাদা, শাহজাদীর ডাক শুনলেই ছুটে আসেন এবং তাদের হুকুম পালন করে গর্ববোধ করেন। কথায়, কথায় মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করেন।

কিন্তু এই ডাক্তার যেই মার্টিনার কামরায় ঢুকলো ওমনিই তার হাভভাব পাল্টে গেলো। যেন এলোক মার্টিনার কোন নিকটাত্মীয়।

'কি অবস্থা?' ডাক্তার মার্টিনার কিছু বলার আগেই বসতে বসতে বললো, 'মাথা এখনো ঠিক হয়নি?'

'না, সেই আগের মতোই'...মার্টিনা জবাব দিলেন, 'আমি কোন এক ব্যাপারে সুযোগ পেয়ে বললাম, হারকিলিউনাসকে মিসর পাঠিয়ে দিতে। সে জেনারেল ও উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদের ওপর নজর রাখবে।....

'এতে গান্দারীর আশঙ্কা কমপক্ষে অনেকটাই কমে যাবে। কিন্তু হেরাকল পরিষ্কার বলে দিলেন, হয় তিনি মিসর যাবেন, না হয় কস্তন্তীনকে পাঠাবেন। হারকিলিউনাস নাকি এর যোগ্য নয়।'

'তাহলে আমার জন্য কি হুকুম?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও'; মার্টিনা বললেন, 'এখন এই একটি চিকিৎসাই তো রয়ে গেছে। আমার তো এখন মনে হচ্ছে, এ লোক তার জীবদ্দশাতেই কস্তন্তীনকে সিংহাসনে বসিয়ে দেবেন। আজ ওকে দেখে এসে আমাকে জানাও। আর কত দিন তিনি এই দুনিয়ার মদ ও নারী ভোগ করবেন? এখন কিন্তু আমি দ্রুতই ফলাফল চাচ্ছি।'

'মালিকায়ে মুহতারামা!' ডাক্তার বললেন, 'আমি শুরু থেকেই একটা কথা বলে আসছি, আজও সে কথা বলবো, আপনার উদ্দেশ্য দুই চার মুহূর্তেই পূর্ণ করে দিতে পারি আমি।...

'কিন্তু তখন আমি তো ধরা পড়বোই, সঙ্গে আপনিও ধরা পড়বেন। একাজ ধীরে ধীরে করতে দিন। আপনি কি আমার চিকিৎসার সামান্য প্রতিক্রিয়াও দেখেননি?'

'কারো কোন সন্দেহ পর্যন্ত হচ্ছে না। আমি অতি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত লোকের মুখেও শুনেছি একের পর এক পরাজয়ের কঠিন মনস্তাপই হেরাকলকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে'।

'পৃথিবীর যেখান থেকেই যত বড় ডাক্তারই নিয়ে আসুক, কেউ এতটুকু টের পাবে না, শাহে হেরাকলকে কোন শোক-দুঃখ খাচ্ছে; না খাচ্ছে অন্য কিছু। ডাক্তার মাত্রই বলবে, শহরের পর শহর, দেশ হারানোর যে শোক, যে অপমান, লাঞ্ছনা তিনি সয়েছেন এবং এখানো তাকে একের পর এক অপদস্থতার সংবাদ শুনতে হচ্ছে, এরই ভয়াবহ প্রভাব তার শরীর-স্বাস্থ্যের ওপর পড়েছে।'

'আচ্ছা, এখন উঠো। এখানে বেশি সময় নষ্ট করো না।' মার্টিনা তাড়া দিলেন, 'হেরাকল না আবার বলে বসেন, ডাক্তার আসতে এত দেরি করছে কেন?'

এই ডাক্তার মধ্যবয়সী প্রায়। চোখ মুখে এবং চলা ফেরায় বুদ্ধিদীপ্ত ডাক্তার বলেই মনে হয়। মার্টিনা তার চেয়ে চার গুণ বড় হবে। কিন্তু তাকে ডাক্তারের চেয়ে অনেক ছোট মনে হয়।
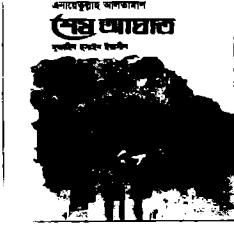
ডাক্তার উঠে দাড়ালেন এবং মার্টিনাকে নিজের দিকে টেনে তার বাহু বেষ্টনে বন্দি করে ফেললেন।

মার্টিনা একটুও বাধা দিলো না। বরং নিজেকে স্বেচ্ছায় তার বাহুতে ছেড়ে দিয়ে শুধু বললেন, আগে তোমার কাজ শেষ করে এসো।

হেরাকলের কামরায় প্রথমে ঢুকলেন মার্টিনা, তার পেছনে পেছনে ডাক্তার ঢুকলেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার প্রথমে ঝুকলেন। তারপর সোজা হয়ে এবং ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে রোমীয় ভঙ্গিতে হেরাকলকে সালাম করলেন। তারপর দ্রুত এগিয়ে গিয়ে হেরাকলের নাড়ি পরীক্ষা করলেন। নাড়ি ছেড়ে তার বুক পিঠও পরীক্ষা করলেন।

মোটামুটি দেখার পর হেরাকলের কাছে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

'কায়সারে রোম!' ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন, 'সালতানাতে রোম আপনার কারণেই টিকে আছে। জয় পরাজয় মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি মেধা ও বুদ্ধির অধিকারী।...

'আপনাকে বেশি কিছু বলাও ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন। আপনি যদি এভাবে হাত পা ছেড়ে হতাশায় ডুবে থাকেন তাহলে পরাজয়ের দাগ আপনার ভাগ্য লিপিতে লিখে দেয়া হবে।'...

'মনোবল শক্ত করুন। এই সিংহাসনে বসে বসেই আপনি এই সাময়িক পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তিরিত করতে পারবেন।'

'আমি অদূর ভবিষ্যৎও নির্ভূল অনুমান করতে পারি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যে এলাকা সালতানাতে রোম থেকে হাত ছাড়া হয়ে গেছে এর চেয়ে দ্বিগুণ এলাকা সালতানাতে রোমের ঝুলিতে চলে আসবে'।

'মাননীয় রাণী আপনাকে এ অবস্থায় দেখে দেখে একলা বসে অনবরত চোখের অশ্রু ঝরায়। আমি তাকেও এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সালতানে রোমের দুর্দিন শেষ। এখন তার বিস্তৃতি আর সমৃদ্ধির দিন শুরু হয়ে যাবে।'

'ডাক্তার কথা কম বলো।' মার্টিনা রাগত কণ্ঠে ডাক্তারকে বললো, 'তুমি যদি উনার সঠিক চিকিৎসা করতে না পারো তাহলে পরিষ্কার করে বলে দাও। তোমাকে আমরা এর জন্য শাস্তি দিতে যাবো না'।

দেখো, 'উনার অবস্থা কী হয়েছে। উনি না থাকলে দুনিয়ায় আমিও থাকবো না। আজ আমি তোমার কাছে পরিষ্কার জবাব চাচ্ছি।'

মনে হলো শোকে মার্টিনার গলা আবেগে কেঁপে উঠেছে।

'আমি শোকে-দুঃখে কাবু হওয়ার মতো লোক ছিলাম না'; হেরাকল বললেন, 'আমি এমন দুর্বল স্বভাবের মানুষ হলে রোমের সিংহাসন উল্টে দিয়ে সালতানাতে রোমকে এমন বিশাল পরিধি দান করতে পারতাম না। এখন একটি দুঃখ আমাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে'।...

'দুঃখটা হলো, রোমীয়দের মধ্যেও গাদ্দার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারপরও তুমি আরো ভালো করে দেখে নাও। সম্ভবত অন্যকোন রোগ আমাকে ধরেছে।'

'আমি দেখেছি, কায়সারে রোম।' ডাক্তার বললেন, 'আজ আমি ঔষধ বদলে দিচ্ছি।'

'আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিচ্ছি। যাও, গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দাও।' হেরাকল বললেন।
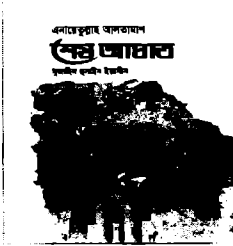
ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন এবং রোমীয় পদ্ধতিতে হেরাকলকে সালাম করে উল্টো পায়ে দরজা পর্যন্ত গেলেন এবং কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মার্টিনাও কামরা থেকে এই বলে বেরিয়ে গেলেন যে, তিনি ডাক্তারের সঙ্গে এক লোককে পাঠাবেন যে দ্রুত ঔষধ নিয়ে ফির আসবে।

মার্টিনা আরেকবার ডাক্তারকে তার কামরায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'এখন তুমি কি করবে? তোমার কি মনে হয়?'

'আমিও দ্রুত কাজ করবো এখন থেকে। আমার মনে হয় দেড় বা দুই মাস সময় লাগবে। এর চেয়ে বেশি নয়। তারপর এই সিংহাসনে আপনার ছেলে হারকিলিউনাস বসবে।'

'তখন তোমাকে আমি এমন পুরস্কার দেবো, তোমার পরবর্তী দশ প্রজন্ম আমার কথা স্মরণ করবে। মার্টিনা বললেন, 'আমি তোমাকে এখানে আর আটকে রাখবো না। ঔষধ তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর বলো, তুমি কি চাও?'

'আপনার কাজ হচ্ছে– এটাই বড় কথা। আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না আমি কী চাই।' ডাক্তার বললেন।

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মার্টিনা অন্য কামরায় চলে গেলেন। কামরা থেকে ফিরে আসলে দেখা গেলো, তার সাথে স্বর্ণের একটি টুকরো। একে সোনার ইট বলা হয়।

প্রায় ত্রিশ তোলা ওজনের হয় এই সোনার ইট। এমন পুরস্কার তাকে এই প্রথম দেয়া হয়নি। আরো কয়েকবার মার্টিনা তাকে এধরনের বখশিশ দিয়েছেন।

ডাক্তার কামরা থেকে বেরিয়ে না গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে ঠোটে হালকা হাসির আভাস ঝুলিয়ে মাটির দিকে তাকালেন।

এই দৃষ্টিকে মার্টিনা ভালোই করে বুঝেন।

'মুখে বলো, কী চাই? এমন ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকাবে না।' মার্টিনা বললেন।

'আজকের রাতটা একটু রঙ্গীন বানাতে ইচ্ছে করছে। কোন আঁধ ফোটা কলি যদি সন্ধ্যার পর পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনাকে মনভরে দুআ দেবো।' ডাক্তার বললেন কাচুমাচু হয়ে।

'পৌছে যাবে,' মার্টিনা বললেন, 'এই কলিকে দেখে তোমার ইচ্ছা করবে চিরদিন তোমার ঘরে রেখে দিতে। কিন্তু সকালের আগেই ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

মার্টিনা এক লোককে ডেকে ডাক্তারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

স্পেনিশ ঐতিহাসিক ফার্ডিনেন্ড লিখেছেন,

মার্টিনা যেদিন থেকে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, হেরাকল তার ছেলে কস্তন্তীনকেই তার গদিতে বসাবেন সেদিনই ফয়সালা করে ফেলেন, সুক্ষ্ম বিষযুক্ত ঔষদের মাধ্যমে হেরাকলকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবেন।

মার্টিনা ও ডাক্তার ছাড়া এ ব্যাপারে কারো সামান্যতম সন্দেহ পর্যন্ত হবে না।
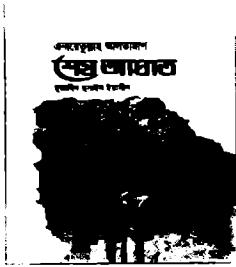
সে রাতেই ডাক্তারের খাস কামরায় এক কম বয়সী যুবতীকে দেখা গেলো। যে কামরায় ডাক্তারের পরিবারের কোন লোকও ঢুকতে পারে না।

অবশ্য কেউ যদি ডাক্তারকে আপত্তিজনক কোন অবস্থায় দেখে ফেলে তাতেও তার কিছু আসবে যাবে না। কারণ, রোমীয়দের অভিজাত ঘরণায় ভোগ-বিলাস আর খোলামেলা যৌন চর্চার অবাধ পরিবেশ ছিলো।

ডাক্তারকে আগেও মার্টিনা এধরনের সুন্দরী মেয়ে ফূর্তির জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ রাতের মেয়েটি সত্যিই আঁধফোটা কলি। ডাক্তার এমনই চেয়েছিলেন।

এটা হেরেমের মেয়ে। এধরনের মেয়েকে 'সাকী' বলা হয় অর্থাৎ, যে মদের জলসায় মদ পান করায় উন্মাদ পুরুষদেরকে।

শাহী জলসায় এরা অনেকটা উলঙ্গ হয়ে মদ পান করায়। এজন্যে তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। তবে এসব মেয়েকে এধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় না; আজ মার্টিনা তাকে যে কাজে পাঠিয়েছেন।

ডাক্তার তো মেয়েটিকে দেখে চোখের পলক ফেলতে পারলো না কয়েক মুহূর্তে। আসলেই আধফোটা ফুলের কলির মতো তীব্র আকর্ষণীয়া।

'দেড় দুই মাস পর আপনার ছেলে সিংহাসনে বসবে, একথা শুনে মার্টিনা এতই খুশি হয়েছেন যে, ডাক্তার যেমন চেয়েছেন তেমন বখশিশই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'তোমার নাম?' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

'মিরিয়াকিস। আমাকে মেরীও বলে কেউ কেউ, আবার মিরিয়াও বলে।' মেয়েটি জবাব দিলো।

এমন সুন্দরী এক যুবতীকে দেখে মদ ছাড়াই ডাক্তারের নেশা ধরে গেলো। তার জ্ঞান বুদ্ধিও যেন লোপ পেয়ে গেলো।

'তোমার আপাদমস্তক এমন নেশাময় যে, তোমার সামনে রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ মদও বেকার জিনিস। ডাক্তার নেশাধরা গলায় বললেন,

'তবুও আমি আপনাকে আমার হাতে মদ পান করাবো।' মেরি গলায় আবেগ ঢেলে বললো, 'আমার হাতে যে রঙ্গীন পানি পান করে সে মেঘের সাদা খণ্ডে ভেসে বেড়ায়।'

রাণী মার্টিনা মেরীকে তার কামরায় ডেকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন, তিনি তাকে পাঠাতে চাননি। কিন্তু ডাক্তারকে খুশি রাখাও জরুরি। কারণ, ডাক্তারকে খুশি রাখলে ডাক্তারও হেরাকলের চিকিৎসা করবে মন দিয়ে। তাই মেরি যেন ডাক্তারকে হাত করে নেয়।

মেরী ডাক্তারের কাছে গিয়ে বুঝলো, এ লোক মানসিকভাবে বেশ ঢিলাঢালা এবং দুর্বল। একে কথায় কথায় আকাশ পর্যন্ত পৌছানো কোন ব্যাপারই না।

মেরী তার প্রশিক্ষণ অনুযায়ী ডাক্তারের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ভাব দেখিয়ে কথা বলতে শুরু করলো যে, ডাক্তার নির্বোধের মতো আচরণ করতে লাগলো।

মেরী তাকে মদপান করাতে শুরু করলো এবং একেরপর এক গ্লাস ডাক্তারের গলায় ঢালতে লাগলো।

তারপর তো মনে হলো, ডাক্তার নয়, মেরীই এই মধ্য বয়সী লোকটির সঙ্গে খেলে যাচ্ছে।

নেশার ঘোরে ডাক্তারের মুখ দিয়ে কথার ফুলঝুরি ছুটলো। অধিকাংশই অর্থহীন কথা মাঝে মধ্যে বেফাস কথাও বের হয়ে আসতে লাগলো। বলতে বলতে রাণী মার্টিনার কথাও উঠলো। এমনকি এক সময় ডাক্তার বলে উঠলেন,

'আমি চাইলে রাণীকে এখানে ডেকে সারা রাত আমার কামরায় রাখতে পারবো। রাণী মার্টিনা যখন আমার কাছে থাকেন তখন তিনি রাণী নন, তিনি শুধু মার্টিনা হয়ে যান।'

তারপর ডাক্তার মেরীর ওপর দাপট ও প্রভাব বিস্তারের জন্য বললেন,

'আজ রাণী তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন,...মনে তো করা হয়, এই হেরেম ও অন্দর মহল শাহে হেরাকলের। আসলে এটা আমার হেরেম। এখানকার সব সুন্দরী মেয়ে আমার।'

ডাক্তারের এই দাপুটে কথাবার্তা মেরী তেমন পাত্তা দিলো না। কিন্তু রাণী মার্টিনা ডাক্তারের কাছে আসে একথাটা শুনে মেরী বেশ ধাক্কা খেলো। তবে মেরীর এ সন্দেহও হলো, ডাক্তার তাকে প্রভাবিত করার জন্য মিথ্যা বলছেন। তবুও মেরীর অনুসন্ধানী মন জেগে উঠলো।

তারপর মেরী তার ভাবভঙ্গি এমন আবেগী ও মনো-উদ্দীপক হয়ে উঠলো যে, ডাক্তারের অবশিষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধিও লোপ পেয়ে গেলো।

সিংহাসনের ব্যাপারে কস্তন্তীন ও হারকিলিউনাসকে নিয়ে হেরাকল ও রাণী মার্টিনার মধ্যে যে এক শীতল লড়াই চলছে সেটা শাহী মহলের অতি নগণ্য কর্মচারীও জানে। মেরীর মতো মেয়েরা আরো অধিকও জানে।

তাই ডাক্তারের মুখে রাণী মার্টিনার একটা সম্পর্কের কথা শুনে মেরীর মধ্যে কৌতুহল জেগে উঠলো। মেরী ইচ্ছে করেই কথাটি আবার উঠালো।

'আপনি নিশ্চয় সঠিক জানবেন,' মেরী বললো, 'আপনি যে কত বড় মানুষ এটাতো এর দ্বারাই অনুমান করা যায়, রাণী মার্টিনার সঙ্গে আপনার এমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে।...আপনার মতে শাহে হেরাকলের স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারে?'

'যাকে আমি চাইবো সে,' ডাক্তার এলোমেলো গলায় বললেন, 'মার্টিনার ছেলে ছাড়া সিংহাসনে আর কেউ বসতে পারবে না।'

'যদি শাহে হেরাকলের হুকুম অন্য কিছু হয়?'

'শাহে হেরাকল?' ডাক্তারের গলা এবার বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠলো, 'এই শাহেনশাহের প্রাণ তো এখন আমার হাতের মুঠোয়। চাইলে কালই তার দেহ থেকে প্রাণ বের করে নিতে পারি। কিন্তু যে কাজ ধীরে ধীরে হয় সেটা অনেক বেশি নিখুঁত হয়।'

মেরী সুরাহী থেকে মদ পানপাত্রে ঢেলে আবারো ডাক্তারের মুখে চেপে ধরলো। ডাক্তার ঢক ঢক করে তা গিলতে লাগলো।

মদের নেশা তো আছেই, তারপর মেরীর রূপ ও রেশম কোমল চুল ও নরম চিবুকের সামান্য স্পর্শ দিতেই ডাক্তার মেরীর পালিত ভেড়ার মতো হয়ে গেলো। তার বকবকানি আরো বেড়ে গেলো।

তবে ডাক্তার প্রসঙ্গটা একেবারেই পরিষ্কার করলেন না। তবুও মেরীর মনে এ সংশয় ভালো করেই চেপে বসলো যে, শাহে হেরাকলকে যে রোগ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সে রোগ সৃষ্টির পেছনে মার্টিনা ও ডাক্তারের কোন ভূমিকা আছে।

ডাক্তার যদিও মদ ও নারীর নেশায় চরম অসতর্ক হয়ে অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। কিন্তু তার এও জানা ছিলো, হেরাকলের হেরেমের একটি মেয়ের এত দুঃসাহস নেই যে, এসব কথা কাউকে বলবে। আর বললেও বিশ্বাস করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই মেরীর চোখ খুলে গেলো। দেখলো, ডাক্তার মরা লাশের মতো পড়ে আছে এবং মৃদু নাক ডাকছে। পাঁড় মাতাল হয়ে ডাক্তার রাতে এভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো।

মেরীকে কেন বখশিশ হিসাবে আনিয়েছিলেন তাও ভুলে গিয়েছিলেন। মেরী ধীর পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।
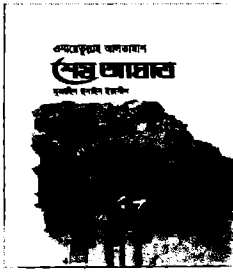
পর দিন রাতেও মেরী হেরেম থেকে অনুপস্থিত রইলো। আগের রাতে তো রাণীর হুকুমে হেরেমের বাইরে ডাক্তারের বাড়িতে ছিলো। কিন্তু পর দিন রাতে লুকিয়ে ছাপিয়ে হেরেম বাইরে রইলো।

শাহী মহলের সঙ্গেই সুবাশি চমৎকার একটি বাগান আছে। বাগানের এমন এক জায়গায় সে বসে আছে যেখানে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। মেরী একা নয় এখানে তার সঙ্গে এক শাহজাদা বসে আছে। নাম কোস্তানিস।

কোস্তানিস হেরাকলের বড় ছেলে কস্তন্তীনের ছেলে। অর্থাৎ কোস্তানিস হেরাকলের নাতি। হেরাকল কস্তন্তীনকে যেহেতু অনেক ভালোবাসেন তাই কোস্তানিসকেও তিনি অনেক আদর করেন।

কস্তন্তীন এত দিনে প্রায় মধ্য বয়সে পৌঁছে গেছে। আর কোস্তানিসের বয়স তেইশ চব্বিশ বছর।

এই যুবক সেসব শাহজাদার মতো যারা নিজেদেরকে লজ্জা, শালীনতা, নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা থেকে স্বাধীন মনে করতো। বাপের অন্দরমহলকে নিজের জন্য বৈধ মনে করতো।

বাপের পছন্দের মেয়েকে ভালো লাগলে নিজের বগলদাবা করে নিতো। কোন এক রঙ্গ জলসায় মেরীর ওপর তার নজর পড়তেই এই মেয়ের প্রেমে পড়ে যায় কোস্তানিস।

বাদশাহের হেরেমে তার ছেলে, ভাতিজা ও ভাগনিদের যাতায়াতের অনুমতি ছিলো না। কিন্তু শাহজাদারা হেরেমের দাস দাসীদেরকে তাদের হাতে রাখতো। হেরেমের কোন মেয়ের প্রতি চোখ পড়লে তারা কোন চাকরাণীকে বখশিশ দিয়ে বলতো, রাতে অমুক মেয়েকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ো। অধিক বখশিশের লোভে তারা তার চাহিদা মেটাতো।

মেরীকেও কোস্তানিস এভাবেই লাভ করে। সেই প্রথম মেরী কোন শাহজাদার ডাকে লুকিয়ে ছাপিয়ে হেরেমের বাইরে বেরিয়েছিলো। কারণ, ওকে বেশ দামি জিনিস মনে করা হতো হেরেমে।

তাই কোন চাকরাণী বা পরিচারিকা তাকে বাইরে নিয়ে যেতে সাহস করতো না। মেরী জানতো গোপনে এসব কর্মকাণ্ড চলে। কিন্তু সে কখনো এধরনের মনোভাব প্রকাশ করেনি।

এক পুরনো ও অতি চতুর এক পরিচারিকা একদিন মেরীকে বলে, তাকে কস্তন্তীনের ছেলে কোস্তানিস খুবই পছন্দ করে এবং তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

এটা শুনেও মেরী প্রথমে রাজী হতে চায়নি। পরিচারিকা তাকে সাবধান করে দেয়, এভাবে প্রত্যাখ্যান করলে শাহজাদা তাকে চরম লাঞ্ছিত, অপদস্থ করবে, এমনকি ইজ্জত লুটেও প্রতিশোধ নিতে পারে।

আর যে শাহজাদার এই ডাককে সম্মান করে তাহলে তো তাকে মাথায় উঠিয়ে রাখবে। অবশেষে তাকে রাজি হতে হলো। সে রাতেই পরিচারিকা তাকে কোস্তানিসের হাতে তুলে দেয়।

এটা ছয় সাত মাস আগের ঘটনা। সে রাতেই মেরী কোস্তানিসকে জানিয়ে দেয় সে এভাবে হেরেমের বাইরে আসতে ভয় পায় এবং এধরনের কাজ সে পছন্দও করে না।

শাহে হেরাকলের হুকুমে তাকে আতিথ্যদানের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং শাহী মেহমানদেরকে মদ পরিবেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন থেকেই সে নিজেকে পরপুরুষের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

'তোমার কথা শুনে ও তোমার এই দৃঢ় আদর্শ দেখে আমি বেশ খুশি হয়েছি মেরী!' কোস্তানিস বললো, 'তুমি যা ভাবছো আমি তোমাকে সে উদ্দেশ্যে ডাকিনি। আমার মনে তোমার ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছে।...

'আমি তোমাকে জোর করতে পারবো না যে, তোমার মনে আমার ভালোবাসা সৃষ্টি করে নাও। ভালোবাসা জোর করে গড়ে উঠে না এবং ভালোবাসার কোন বিনিময়ও হয় না।'

'আমি আমার মনের কথা বলে দিয়েছি।' মেরী বললো, 'আর এটাও শুধু এজন্যই বলেছি, আমিও তোমাকে সেসব শাহজাদার মতোই মনে করি যারা হেরেমের মেয়েদেরকে নিয়ে এভাবে ফূর্তি করে, আবার ভালোবাসার কথাও বলে।'

'ভালোবাসা কার কাছে প্রিয় নয়?...আমাকে আমার মা বাবার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে এবং তাদেরকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে আমাকে এই হেরেমের বন্দি খানায় কয়েদ করে নিয়েছে।'...

'এজন্যই আমি ভালোবাসা আর প্রেমের ব্যাকুল পিয়াসী। তুমি যদি তোমার মনের কাম পিপাসা মেটানোর জন্য আমাকে ডেকে থাকো তাহলে আমি হাড় মাংসের তৈরি এক প্রতিমা হয়ে থাকবো তোমার জন্য।...

'আর যদি সেই ভালোবাসার কথা বলো যার সম্পর্ক দৈহিক ক্ষুধা মেটানোর সঙ্গে মোটেও সম্পৃক্ত নয়, তাহলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখো।...তোমার ভালোবাসায় প্রাণও সপে দেবো হাসি মুখে।'

ওরা সে রাতে শাহী বাগানোর এক কোণে অনেক্ষণ বসে থাকে। মেরী যখন ফিরে আসতে চাইলো কোস্তানিস তাকে স্বর্ণ মুদ্রার একটি থলি দিলো।

মেরী থলেটার দিকে প্রথমে তাকালো, তারপর কোস্তানিসের চেহারার দিকে তাকালো এবং তার চোখ দুটি অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠলো। কোস্তানিস তাকে বাহুবেষ্টনে নিয়ে জড়িয়ে ধরলো।

'এই ভালোবাসাকে এভাবে অপমানিত করো না' মেরী ছলো ছলো কণ্ঠে বললো, 'যখন তোমার ইঙ্গিত পাবো আমি চলে আসবো।'

'আমি তোমার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দেবো।' কোস্তানিস বললো, 'আমি হেরেমের সব পরিচারিকা ও চাকরাণীকে বলে দেবো, কোন শাহাজাদা যদি তোমাকে পেতে চায় তাহলে যেন পরিষ্কার নিষেধ করে দেয়। তবে শাহে হেরাকল ও রাণী মার্টিনার হুকুমে যদি কারো কাছে পাঠানো হয় তাহলে সেখানে আমি অপারগ।'

এরপর থেকে তো প্রায় প্রতিদিন ওদের মিলন-সাক্ষাত ঘটতে লাগলো। তাদের কোন সাক্ষাতে তো সারা রাত কেটে যেতো।

ভোরের পাখির ডাক তাদের ঘনিষ্ঠ তন্ময়তা ভাঙ্গতো।

তাদের এই প্রেম ভালোবাসার কারণে মেরীকেও অন্য কেউ কামনা করতো না এবং কোস্তানিসও অন্য কোন মেয়ের দিকে মনোযোগ দিতো না।

কোস্তানিসের বাবা কন্তন্তীন নিজের মতো ছেলেকেও প্রতিভাধর রণকুশলী হিসেবে গড়ে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য সম্পর্কেও তার পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারেও তার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে এ বয়সেই। এজন্য কোস্তানিসকে অন্য দশজন শাহজাদার কাতারে কেউ ফেলতো না।

প্রথম সাক্ষাতের ছয় সাত মাস পর মেরী ও কোস্তানিস আজ সেই বাগানের এক কোণে আবার পরস্পরের মধ্যে হারিয়ে যায়।

'তোমাকে একটা কথা বলবো আজ', মেরী বললো কোস্তানিসকে, 'তবে কথাটা এখন আপাতত তোমার মনে গোপন রাখতে হবে।...

'গতকাল রাতটি আমার কেটেছে সেই ডাক্তারের কাছে যিনি শাহেনশাহে হেরাকলের চিকিৎসা করান। তিনি ডাক্তার ঠিক আছেন, কিন্তু তার মতো এমন নির্বোধ আমি আর কোন মানুষ দেখিনি।'...

'রাণী মার্টিনা আমাকে তার কাছে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার তো আমাকে দেখে তার সব খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তাকে আমি মদপান করাতে শুরু করলাম। আর তিনি পান করতে লাগলেন।....

'তার কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, এ লোকের ভেতরে গোপন কিছু নিশ্চয় আছে এবং সেটা আমি বেরও করতে পারবো। আর তার আসল উদ্দেশ্য পূরণ না করেই রাতটি পার করে দিতে পারবো।'...

'যা হোক আমার রাত কিভাবে কেটেছে সেটা শুনে তো তোমার কোন কাজ নেই। এটা শুনে নাও যে, তিনি আমার প্রতি এমন মুগ্ধ এবং আবেগ অন্ধ হয়ে উঠলেন যে, তার ভেতর থেকে দু একটি এমন কথাও বেরোলো, যা আমাকে সংশয় ও সন্দেহে ফেলে দিয়েছে।

'প্রথম কথা হলো, তিনি চেষ্টা করেছেন, শাহে হেরাকলের স্থলাভিষিক্ত হোক হারকিলিউনাস। আর রাণী মার্টিনা সম্পর্কে এমনভাবে কথা বললেন যে, এ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, রাণীর সঙ্গে তার কোন ধরনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।'

'এর মধ্যে সন্দেহজনক ব্যাপার নেই কোন'। কোস্তানিস বললো, রাণী চান, শাহে হেরাকল যেন সুস্থ হয়ে উঠেন। এজন্য তিনি ডাক্তারকে খুশি রাখছেন। এবং খুশি রাখছেন শাহে হেরাকলকে। আসলে তিনি শাহে হেরাকলকে খুশি রাখতে চাচ্ছেন। কারণ, তিনি তার ছেলেকে সিংহাসনে বসা দেখতে চান।'

'তারপরও আমার সন্দেহ অটুট আছে। সন্দেহ হলো, রাণীর সম্মতিতেই ডাক্তার শাহে হেরাকলকে যে কোন ভুল বা বিষাক্ত ঔষধ দিচ্ছেন। যে কারণে খুব দ্রুত তার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

'আমার মনে হচ্ছে ডাক্তার এত বড় দুঃসাহস করতে পারবে না। এজন্য এসব কথা এখন অন্য কারো সঙ্গে বলা আমাদের উচিত হবে না। আর কারো সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললেও বলতে হবে এ কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হয়েছে। আমি জানি এখন সালতানাতে রোমে রাণী মার্টিনার শাসন চলছে।'...

'আর মার্টিনা পর্যন্ত তোমার নাম পৌঁছলে তো তিনি তোমাকে হত্যা করবেন বা গুম করে ফেলবেন। তবে রাণী আবার কখনো তোমাকে ডাক্তারের কাছে পাঠালে তখন ভেতরের গোপন ব্যাপারটি বের করতে চেষ্টা করবে। তিনি যদি তোমার রূপ যৌবনের প্রতি অন্ধ হয়ে থাকেন তাহলে ভেতরের সব কিছু উগড়ে দেবেন তোমার সামনে।'

'আমি সেই গোপন তত্ত্বটি বের করতে চাই।'
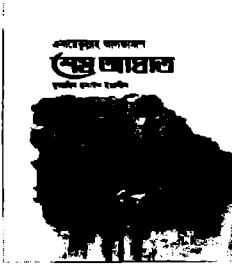
হেরাকলের অবস্থা আগের চেয়ে আরো অবনতির দিকে। তার কাছে মনে হচ্ছে, মুকাওকিসের গাদ্দারীটাই তার মানসিক অবস্থা বিগড়ে দিয়েছে। একারণেই তার স্বাস্থের এই অবনতি।

তিনি মোটেও এ নিয়ে গভীর ভাবে ভাবলেন না যে, মুকাওকিস কি সত্যিই গাদ্দারী করেছেন, না তিনি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

মুকাওকিসের এ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো, রোমীয় সেনারা এখন আর মুসলিম সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে না। তাই মুসলমানরা পুরো মিসর জয় করার আগে তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ব্যবিলন ও নীল নদের মাঝখানে গড়ে ওঠা অতি মজবুত কেল্লা রওজাকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন মুকাওকিস। এছাড়াও আশে পাশের এলাকাগুলোকেও মুসলমানাদের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছিলেন মুকাওকিস। এজন্যই তিনি সন্ধির আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু হেরাকল তার এই যুক্তি মোটেও শুনেননি। হেরাকল তো আসলে মুকাওকিসের কাছ থেকে তাকে হত্যার চেষ্টার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিলেন।

মুকাওকিসের ভাগ্যের ফয়সালা করে হেরাকলের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার আরো অবনিত হলো। ডাক্তার তাকে দেখে নতুন করে ঔষধ দিলো। সেটাও তিনি সেবন শুরু করলেন।

হেরাকল সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর নামে পয়গাম লিখালেন। তাতে মুকাওকিসের কৃত চুক্তি রহিত করার ঘোষণা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর পরিনামের হুকমিও দিলেন।

হেরাকলের উদ্দেশ্য হলো। মুসলমানরা বিনা চুক্তিতে কোন শর্ত আরোপ না করেই যেন মিসর থেকে বেরিয়ে যায়।

হেরাকল পয়গামটি কোন পত্রবাহককে না দিয়ে পত্রদূতকে দিলেন, নির্দেশ দিলেন খুব দ্রুত ব্যবিলনে মুসলিম সিপাহসালারের কাছে পয়গাম পৌঁছে দিতে।

পয়গাম লেখক পয়গাম লিখে যখন বাইরে বের হলো তখন শাহী মহলের এক পরিচারিকা তার কানে কানে বললো, মালিকায়ে মার্টিনা তাকে ডাকছেন। পরিচারিকা তাকে একটি কামরায় নিয়ে গেলো। সেখানে মার্টিনা বসা ছিলেন।

'বসো এবং একটি পয়গাম লিখো; মার্টিনা পয়গাম লেখককে বললেন, 'এই পয়গামের কথা কাউকে বলবে না। সামান্যতম সন্দেহও যদি হয়- তুমি এর কথা কাউকে বলেছো তাহলে আর তুমি এর মুহূর্ত পরই দুনিয়া থেকে চলে যাবে। অবশ্য আমার কথা শুনলে বখশিশও পাবে দু'হাত ভরে।

মার্টিনা জেনারেল থিয়োডরের নামে পয়গাম লিখালেন। থিয়োডর তখন ব্যবিলন শহরে ছিলো।

পয়গাম লেখা হলে পয়গাম লেখককে ডাক্তারের মতো মার্টিনা একটি সোনার টুকরো দিলেন। সোনার টুকরোটি হাতে নিয়ে লোকটি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো। সে কল্পনাও করেনি এত বড় বখশিশ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

মার্টিনা ব্যাপারটি লক্ষ করে একটু আদুরে গলায় ধমকে উঠে বললেন, 'এটা পকেটে রাখো। খবরদার, কোত্থেকে পেয়েছো এটা কাউকে বলবে না।...'

পয়গাম লেখক দ্রুত সেটা পকেটে রেখে দিয়ে মার্টিনার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে উঠলো।

রোমের এই শাহী খান্দানের কাছে সোনা জহরতের এত বিশাল মজুদ ছিলো যার হিসাব তাদের নিজেদেরও জানা ছিলো না।

কিন্তু এক পয়গাম লেখকের জন্য স্বর্ণের এই টুকরোটিও ছিলো এক ধনভাণ্ডারের মতো। আর মার্টিনার কাছে এর মূল্য এতটুকু যেন একটি ঝাড়ুর শলা উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হলো।

পয়গাম লেখক বাইরে বের হতেই পরিচারিকা ভেতরে এসে জানালো, বাইরে পত্রদূত দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিতে বললেন মার্টিনা।

'আমারও একটি পয়গাম নিয়ে যেতে হবে'। মার্টিনা বললেন, 'তুমি জানো আমার পয়গাম কাউকে দেখানো যায় না। মিসর পৌঁছে জেনারেল থিয়োডরকে একেবারে একা আমার এই পয়গামটি দেবে। কেউ যদি ব্যাপারটি টের পায় তাহলে জানোই এর শাস্তি কেমন ভয়ঙ্কর হবে।'

পত্রদূতকেও মার্টিনা একটি স্বর্ণের টুকরো দিলেন। পত্রদূত সেটা সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুড়ে ফেললো। পত্রদূত তখনই হেরাকল ও মার্টিনার পৃথক পৃথক দুটি পয়গাম নিয়ে বযনতিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো।
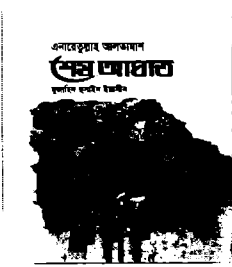
সিপাহসালার আমার ইবনে আস (রা.) এর নামে হেরাকলের পয়গাম ৬৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসম্বরের প্রথম দিকে বযনতিয়া থেকে রওয়ানা হয়। আর ডিসেম্বরের শেষ হপ্তার মাঝা মাঝিতে গিয়ে গন্তব্যে পৌছে।

মুসলিম সেনারা ব্যবিলন অবরোধ করে রাখে। এজন্য পত্রদূত আমর ইবনে আস (রা.) এর সঙ্গে কেল্লার বাইরে এসে সাক্ষাত করে।

পয়গাম পৌছে দিয়ে পত্রদূত নদীর দিকে চলে যায়। তাকে সেই দরজা দিয়ে শহরে ঢুকতে হবে যেটা নদীর দিকে খোলা হয়।

আমর ইবনে আস (রা.) হেরাকলের পয়গাম পড়ে এমনভাবে সালারদেরকে ডেকে পাঠালেন যেন তিনি কোন সুসংবাদ পেয়েছেন।

সালাররা দৌড়ে এলো। আমর ইবনে আস (রা.) তাদেরকে হেরাকলের পয়গাম পড়ে শোনালেন। হেরাকলের পয়গামের মূল কথা হলো, সন্ধিচুক্তি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এখন মুসলমানদের লড়াই মুকাওকিস ছাড়া অন্য জেনারেলদের সঙ্গে হবে।

হেরাকল এমন কথাও লেখেন যে, কোন শাসক তার স্বজাতির কোন গাদ্দারের কৃত সন্ধিচুক্তি মেনে নিতে পারেন না। আর তোমাদের হাড় গোড় মিসরের মাটিতে মিশে যাওয়ার আগেই তোমরা জীবিত এবং নিরাপদে মিসর থেকে বেরিয়ে যাও। ব্যবিলন জয় করা তোমাদের সাধ্যের অতীত ব্যাপার।

'আল্লাহর সিংহরা!' আমর ইবনে আস (রা.) পয়গাম পাঠ শেষে তার সালারদেরকে বললেন,

'হেরাকলের এই হুমকি আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। মুকাওকিস তো আমাদেরকে হুমকি দিতে দিতে অবশেষে সন্ধিচুক্তি করে ফেলেন। তোমরা কি বুঝতে পারছো না রোমীয়দের কাছে হুমকি ছাড়া আর কিছুই নেই? তবে ব্যবিলনের ব্যাপারে হেরাকল যে কথা বলেছেন তা এজন্য একটু ব্যতিক্রম যে, এটা অসম্ভব এক মজবুত ও অজেয় কেল্লা।'...

'এক দিক থেকে নীলনদ তাকে সুরক্ষা দিচ্ছে, অন্য দিকে সামনের এই বিশাল পরিখাও দারুন কার্যকর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের

মুজাহিদদেরকে না নীল নদ বাঁধা দিতে পারে, না মরু ভূমির বাধা তাদের পথ রুখতে পেরেছে। ইনশাআল্লাহ তোমরা ব্যবিলনও জয় করে নিবে। খোদার কসম! আমি হেরাকলকে তার হুমকির জবাব দিতে চাই।'

আমর (রা.) সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবিলন জয় করার পরিকল্পনা আগেই ঠিক করে রাখেন। তিনি অপেক্ষা করছিলেন হেরাকল চুক্তি মেনে নেন কিনা।

এটা এখন জানা হয়ে গেছে - হেরাকল কী চান; তাই সিপাহসালার ব্যবিলনের ওপর হামলার হুকুম দিয়ে বললেন, এখন থেকে একটি মুহূর্তও আমি নষ্ট করতে চাই না।

সালাররা ছুটে গেলেন, প্রত্যেকের সেনা ইউনিটকে একত্রিত করে সিপাহসালারের হুকুম শুনিয়ে দিলেন। তাদের জোশ-জযবাও জাগিয়ে তুললেন।

প্রত্যেক মুজাহিদের কানে হেরাকলের হুমকিগুলো ঢেলে দেয়া হলো, বলে দেয়া হলো, এ হুমকির জবাব মুখে নয়, তলোয়ারের মাধ্যমে দিতে হবে।
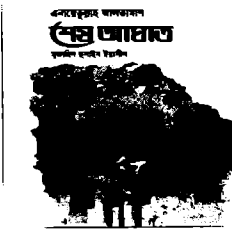
মুকাওকিসের সন্ধির পয়গামের আগে মুজাহিদরা কেল্লার সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা পরিখা পার হয়ে কেল্লার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলো। কিন্তু মুকাওকিস সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে লড়াই স্থগিত করতে হলো। তারপর চুক্তি হলো।

সিপাহসালার আমর (রা.) দেখলেন, তার সেনাদল পরিখা ও কেল্লার মাঝখানে অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। কেল্লা ও পরিখার মাঝখানের ব্যবধান অনেকটুকু জায়গা। তারপরও মুজাহিদদের অবস্থান নিরাপদ স্থানে ছিলো না।

চুক্তি হলেও আমর ইবনে আস (রা.) এর দূর দৃষ্টি এ চুক্তিকে অন্য চোখে দেখে। এ চুক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য মুকাওকিসের সময় হাসিল করা এবং এই চুক্তির অনুমোদনও হেরাকলের কাছ থেকে নিতে হবে। আমর (রা.) তার সালারদেরকে এসব কথা বুঝিয়ে দেন।

আমর (রা.) অনুভব করলেন, এমনিতেই অনেক সময় চলে গেছে। এখনা পর্যন্ত সন্ধির চুক্তির ব্যাপারে কোন ফয়সালার খবর আসছে না। হতে পারে চুক্তির অনুমোদনের পরিবর্তে ইস্কান্দারিয়া বা বযনতিয়া থেকে বিশাল সেনা সাহায্য এসে যাবে। যেটা মুজাহিদদের জন্য অনেক বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে।

এ আশঙ্কা মাথায় রেখে আমর (রা.) তার সেনা দলের পজিশনের অবস্থা জরিপ করলেন।

এ আশঙ্কাও আমর (রা.) এর মনে আসলো যে, রোমীয়দের সেনা সাহায্য নদী পথে আসবে এবং নদীপথের ফটক দিয়ে কেল্লায় ঢুকে পড়বে। এমনও হতে পারে, রোমীয়রা পরিখায় পানি ছেড়ে দেবে এবং ভেতর থেকে সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে হামলা করে বসবে।

সে পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের জন্য পিছু হঠা বিপদজনক হয়ে উঠবে। মুসলমানরা পরিখা ও অধিখ সংখ্যক রোমীয়দের মধ্যে পড়ে এমন বিপদে ফেঁসে যাবে যে, সালাররা কোন চালও দিতে পারবে না এমনকি দিক বদল করেও লড়তে পারবে না।

মুজাহিদরা যখন পরিখা পার হয়েছিলো তখন পরিখার পানি নদীতে চলে গিয়েছিলো। পরিখায় এখনো পানি নেই।

অবশ্য সিপাহসালারের এটাও জানা নেই যে, পরিখায় পানি ছাড়া বা পানি দিয়ে পরিখা পূর্ণ করার রোমীয়দের কোন গোপন ব্যবস্থা আছে কি না। জানা না থাকলেও এ আশঙ্কা তো রয়েই যায় যে, কোন একটা ব্যবস্থা অবশ্যই আছে।

এ আশঙ্কার কারণেই সিপাহসালার সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিলেন। চুক্তির ব্যাপারে কোন খবর আসার আগেই পুরো সেনাদলকে পরিখার পরিবেষ্টনের বাইরে নিয়ে এলেন। অবরোধও বহাল রাখলেন। সালারদের বলে রাখলেন, পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে পরিখা অন্য কোন উপায়ে অতিক্রম করা হবে।
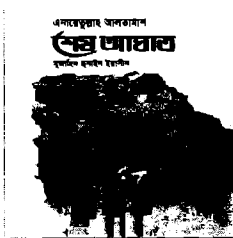
কেল্লাবদ্ধ রোমীয়রা যখন দেখলো, মুসলমানরা পরিখার ওপারে গিয়ে পিছু হঠে গেছে তখন তাদের জেনারেলরা আরেকটা চাল চাললো। তারা ফৌজ বাইরে না আনলেও মিনজানিকগুলো বাইরে নিয়ে এলো এবং শহরের চার দিকে স্থাপন করলো।

এর সঙ্গে সঙ্গে এক দল তীরন্দায সৈন্যও বাইরে এসে গেলো। এদের কাজ সামনে বেড়ে হামল করা নয়, বরং এক জায়গায় পজিশন নিয়ে মুসলিম সেনাদের ওপর তীর ছোড়া।

রোমীয়দের একটা সুবিধা ছিলো যে, পরিখা ও কেল্লার মাঝখানের বিস্তর জায়গায় ফলমূলের বিশাল বাগান। ফলের গাছগুলো বেশ ঘন ঘন করে লাগানো। এগুলো চার

দিকে ঝোপ ঝাড়ের মতো বিস্তার করে আছে। রোমীয় তীরন্দাযরা গাছগুলোর ওপর চড়ে তীর ছুড়তে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে মিনজানিক থেকেও পাথর বর্ষিত হতে লাগলো।

মিনজানিক মুসলমানদের কাছেও আছে এবং দূরপাল্লার তীরও আছে। তারা মিনজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণের জবাব দিতে লাগলো এবং তীরের জবাবে তীর বৃষ্টি শুরু করে দিলো।

তবে রোমীয় তীরন্দাযরা গাছে গাছে পজিশন নেয়ার কারণে তাদেরকে দেখা যাচ্ছিলো না।

গাছের আড়াল ও সুবিধার কারণে রোমীয়রা অধিক ফায়দা হাসিল করছিলো। এজন্য সিপাহসালার তার সেনা দলকে তীর থেকে বাঁচানোর জন্য পিছু হঠিয়ে নিয়ে আসলেন।

রাতের নিকষ অন্ধকার নেমে এলে স্পষ্ট বুঝা যেতো, রোমীয়রা পরিখায় কিছু একটা করছে। রাতে যদিও উভয় পক্ষের তীরন্দাযী থেমে যেতো, তবুও মুজাহিদরা দেখার জন্য সামনে যেতো না। কারণ, সামান্য সন্দেহ হলেই রোমীয়রা চরম তীরবৃষ্টি শুরু করে দিবে।

পরিস্থিতি অনুকুলে দেখে রোমীয়রা নিজেদেরকে এতই নিরাপদ ও স্বাধীন ভাবতে লাগলো যে, তারা শহরে যাতায়াতের জন্য শহরের একাধিক ফটক রাতেও খোলা রাখতো।

সারা দিন এক দল তীরান্দায তরীন্দাযী করে ভেতরে চলে যেতো, তাদের জায়গায় তাজাদম তীরন্দায দল এসে পজিশন নিতো। সিপাহলার আমর ইবনে আস (রা.) চার দিকে ঘোড়া দৌড়াতেন এবং লড়াইয়ের অবস্থা দেখে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতেন।

পাথর বর্ষণের জবাবে পাথর বর্ষণ এবং তীর বৃষ্টির জবাবে তীর বৃষ্টি এই করতে করতে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাস কেটে গেলো। ফেব্রুয়ারী মাস শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে মুজাহিদরা এক কদমও আগে বাড়তে পারেননি।

রোমীয়রা পরিখা ও কেল্লার দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় একেবারে নিরাপদে এবং দারুন স্বস্তিতে ছিলো।

আমর ইবনে আস (রা.) তবুও লড়াই অব্যহত রাখলেন। রোমীয়দের তুলনায় ব্যবিলন কেল্লা জয় করার জন্য মুসলিম সেনা সংখ্যা এতই নগন্য ছিলো যে, তাদের এই দুর্বলতাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো রোমীয়রা। সিপাহসালারের মাথা বিদ্যুতগতিতে কাজ করছিলো।

কিন্তু চূড়ান্ত হামলার জন্য তিনি কোন পথ বা উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

ইস্কান্দারিয়া অভিমুখী নীলনদের তীর ঘেষা পথে কিছু মুজাহিদ নিয়োজিত রাখলেন। এরা অবশ্য দূর দুরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলো। এদের কাজ হলো,

ওদিক থেকে রোমীয়দের পক্ষে কোন সেনা সাহায্য এলে সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শিবিরে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়া।

দিন যতই এগিয়ে গেলো সাফল্যের পাল্লা রোমীয়দের দিকে ততই ঝুঁকতে লাগলো। মুসলিম সেনাদের জন্য আশাপ্রদ কোন ঘটনাই ঘটছিলো না। তবুও তারা আল্লাহর অলৌকিক কোন সাহায্যের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে লাগলো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা জিহাদকে সর্বোত্তম ইবাদত সাব্যস্ত করে আল্লাহর রাহের যোদ্ধাদের সঙ্গে কিছু ওয়াদা করেছেন। সূরা আনকাবুতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে তাদেরকে অবশ্যই বিজয়ে পথ দেখান।'
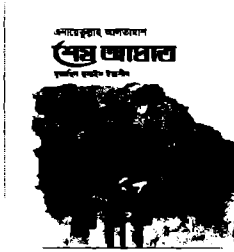
মুসলমানরা এই সাহায্য প্রাপ্তির প্রতীক্ষাতেই রইলো।

নীল নদের পারে ডিউটিতে থাকা এক মুজাহিদ একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এলো সিপাহসারের কাছে। সোজা সিপাহসালারের কাছে গিয়ে পৌঁছলো। তার চোখ মুখ দেখে এটাই আশা করা যাচ্ছিলো যে, সে সেনা সাহায্যের সংবাদ নিয়ে এসেছে।

'রোমীয়দের সেনা সাহায্য আসছে? কোন মন্দ সংবাদ?' সিপাহসালার তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'না সিপাহাসালার!' মুজাহিদ জবাব দিলো।

'মনে হয়, ভালো খবরই এনেছি। একটা খবর হলো, ব্যবিলনে এমন এক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে যে, প্রায় সারা শহরের লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিছু লোক এতে মারাও গেছে। সেনা সদস্যদের যারা শহরে রয়েছে তাদের মধ্যেও এরোগ ছড়িয়ে পড়েছে।'...

'দ্বিতীয় খবরটি হলো, হেরাকল মারা গেছেন। তৃতীয় খবরটি হলো, দূরদুরান্ত পর্যন্ত সেনাসাহায্যের নাম নিশানাও দেখা যাচ্ছে না। সেনা সদস্যরা কেল্লার বুরুজে চড়ে প্রায় দিনভর ওদের পথ চেয়ে বসে থাকে– যেদিক থেকে সেনা সাহায্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে।'

সিপাহসালার এখবর শুনে বড়ই সস্তিদায়ক বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

নদীর দিকে কেল্লার যে ফটকটি আছে সেদিক থেকে মাছ শিকারীদের একটি নৌকা এলো।

ঘটনাক্রমে সেটি নদীর পশ্চিম তীরের কাছ ঘেষে যাচ্ছিলো। ওখানে ডিউটিতে থাকা মুজাহিদরা নৌকাটিকে আটক করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, শহরের ভেতরের অবস্থা। মাছ শিকারীরা তখন এসব সংবাদ দিলো। বিনিময়ে মুজাহিদদরা ওদেরকে ছেড়ে দিলো।

সিপাহসালার তখনই সব সালারদেরকে ডেকে তাদেরকে এখবর শোনালেন।

'এখন আশা করা যায়, রোমীয় ফৌজের মনোবল অনেক দুর্বল হয়ে পড়বে। রোমীয় সৈন্যরা এবং জেনারেলরাও তাদের বাদশাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে। ওদের বাদশাহ মরে গেছে। এর যে মন্দ প্রভাব পড়বে সেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।' আমর (রা.) বললেন,

'তবে এর অর্থ এই নয় যে, সেনাসাহায্য আসবেই না। হেরাকলের কাছে মুসলমানদের ব্যবিলন পর্যন্ত পৌছার খবর পৌছবে আর তিনি সেনাসাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন না, এটা তো হতেই পারে না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সেনাসাহায্য পাঠানোর হুকুম দিয়ে থাকবেন। তাই আমাদের ব্যবিলন জয় করতে হলে মনোবল আরো চাঙ্গা করে তুলতে হবে।'

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হেরাকলের মৃত্যু হয় ৬৪১খ্রিস্টাব্দের মার্চে। তবে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক মতামত হলো, ৬৪১খি. ফেব্রুয়ারীতে হেরাকলের মৃত্যু হয়।
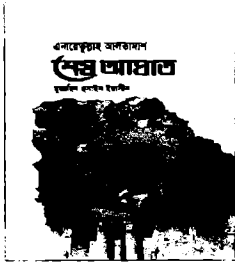
হেরাকলের মৃত্যুর খবর তো আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে পৌছে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর বযনতিয়ার অবস্থা কি হয়েছে সে খবর তো তার কাছে পৌছার কথা নয়। তার এটাও জানার কথা নয়। মালিকায়ে মার্টিনা জেনারেল থিয়োডরকে গোপন এক পয়গাম পাঠিয়েছেন।

মার্টিনা থিয়োডরকে লেখেন,

'শাহে কেরাকল এখন জীবনের শেষ প্রান্তে। কখন কী হয়ে যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার শারীরিক অবস্থা খুব দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। প্রতিদিনই তিনি

কয়েকগুন করে দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তুমি তো জানো আমি আমার ছেলে হারকিউলিনাসকে সালতানাতের রাজ মুকুট পড়াতে চাই।'

'এখন জরুরি কাজ হলো, তোমরা আরবের ঐ মুসলমানদেরকে মিসর থেকে বের করে দাও। তখন আমি এটা বলতে পারবো, শাহ হেরাকল পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার ছেলে পরাজয়কে জয়ে রূপান্তরিত করেছে। কোন মূল্যেও যেন ব্যবিলন মুসলমানদের দখলে চলে না যায়। তুমি জানো এর বিনিময়ে তোমাকে আমি কী দেবো। বলার প্রয়োজন নেই।'

'এতটুকু বলছি যে, তুমি হয়রান হয়ে যাবে। আমার এই ইচ্ছাটা পূরণ করে দিলে অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে তোমাকে পুরো রোম সম্রাজ্যের সেনাপতি বানিয়ে দেবো। আর মিসরে তুমি মুকাওকিসের অবস্থানে পৌছে যাবে। তুমি হবে মিসরের বাদশাহ।'

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন, পয়গামে মার্টিনা কিছু রোমান্টিক কথাবার্তাও লিখেন। তিনজন অতি রূপসী কুমারী মেয়ে থিয়োডরের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হবে...

মোটকথা, মার্টিনা থিয়োডরকে এমন কিছু প্রস্তাব দেন, যা মানুষকে দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বপ্ন দেখায়।

পয়গাম পেয়েই থিয়োডরের মধ্যে অসম্ভব জোশ-জযবা জ্বলে উঠে। সে তার অধীনস্ত কমাণ্ডার ও জেনারেলদেরকে ডেকে তাদেরকে আবেগ-উন্মত্ত ভাষায় উস্কে দেয় এবং লড়াইয়ের দৃষ্টিকোন থেকেও তাদেরকে আক্রমনাত্মক নির্দেশ দেয়, আর বলে; এটা শুধু রোমের ইযযত-আবরুরই প্রশ্ন নয়, এটা প্রতিটি রোমীয়র জন্য ব্যক্তিগত আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন।

হেরাকলের মৃত্যুর খবর যখন ব্যবিলন পৌছলো তখনো এর প্রতিক্রিয়ায় সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ার কথা ছিলো কিন্তু; থিয়োডর পুরো ফৌজকে একত্রিত করে এমন উত্তপ্ত ভাষায় বক্তৃতা করলো যে, পুরো সেনাবাহিনী উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

সে বলল, পরাজয়ের সবচেয়ে বড় দায় ছিলো হেরাকলের, তারপর মুকাওকিসের। এখন তাদের দুজনেই চলে গেছেন, তাই এর দায় পড়ে আমাদের সবার ওপর।

আমরা আমাদের পরাজয়ের দায় বিজয়ে বদলে দেবো। সালতানাতে রোম হেরাকলের নয় বরং তোমাদের।

সৈন্যরা এরপর থেকে ব্যবিলনের লড়াইকে ব্যক্তিগত লড়াই বলে ভাবতে লাগলো।
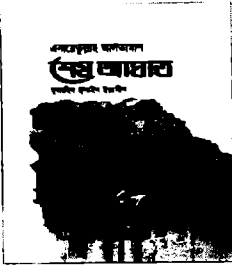
হেরাকলের ডাক্তার যে বলেছিলেন, হেরাকল আর মাত্র দেড় বা বড় জোড় দুই মাসের মেহমান, তার সে অনুমানই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো।

হেরাকলের মৃত্যু হতেই মালিকায়ে মার্টিনা ঘোষণা করে দিলেন, তার ছেলে হারকিলিউনাস হেরাকলের স্থলাভিষিক্ত। আর হেরাকল মৃত্যুর আগেই এ ফয়সালা করে গেছেন।

বাস্তবে হেরাকল এধরনের কোন ফায়সালা করেননি। মৃত্যুর আগের তিন চার দিন তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন। রাতে ঘুমে বা অচেতন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মালিকায়ে মার্টিনার এই ঘোষণা শুনতেই হেরাকলের বড় ছেলে কস্তন্তীন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠলো। সে বলতে লাগলো, হেরাকল সব সময় তাকে বলে এসেছেন, তার মৃত্যুর পর কস্তন্তীনই তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

তিনি বলতেন, হারকিউলিনাস অপরিণত বয়সের, অনভিজ্ঞ এবং সালতানাতে রোমরে শাসন ক্ষমতা সামলানোর জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত।

আর বর্তমানের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন মুসলমানরা রোমীয়দেরকে শাম থেকে বের করে দিয়েছে এবং মিসরের বিশাল অংশ দখল করে নিয়েছে। তখন তো এমন এক শাসক জরুরি, যে শুধু পরীক্ষিত যুদ্ধকুশলীই নয়, বরং শাসন ব্যবস্থা সামলানোর ব্যাপারেও অভিজ্ঞ।

ফৌজের জেনারেল ও সালতানাতের হাকিমরা জানতো এ পরিস্থিতিতে হারকিলিউনাসকে সিংহাসনে বসানো অনেক বড় এবং ভয়াবহ ভুল।

কস্তন্তীনই এজন্য উপযুক্ত। কিন্তু জেনারেলরা ও প্রশাসনের ছোট বড় হাকিমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কিছু রইলো মালিকায়ে মার্টিনার সমর্থনে, আর কিছু কস্তন্তীনের সমর্থনে।

এভাবে ফৌজ ও শাহী মহল দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার প্রশ্নে দু'দলই সাংঘর্ষিক অবস্থায় পৌঁছে গেলো।

কস্তন্তীন তো কোন মূল্যেই সিংহাসনের দাবী ছাড়ছিলো না। আর সিংহাসনের প্রকৃত দাবীদারও সেই। কিন্তু মার্টিনা তাকে মেনে নিতে পারছিলেন না।

মৃত্যুর আগে হেরাকল বিশাল সংখ্যার এক তাজাদম সেনাদল প্রস্তুত করার ও মিসর পাঠানোর হুকুম দিয়েছিলেন। সেনা সাহায্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো। রওয়ানার জন্যও প্রস্তুত ছিলো। এসময় হেরাকল মারা যান।

কস্তন্তীন সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দেয় সেনা সাহায্য রওয়ানার জন্য দ্রুত জাহাজ প্রস্তুত করা হোক।

কিন্তু মালিকায়ে মার্টিনা এ হুকুমের ব্যাপারে আপত্তি করে বললেন, কস্তন্তীন যেন নিজে এই সাহায্যকারী সেনাদলের সঙ্গে যায়। সে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেয়ার অভিজ্ঞতায় দক্ষ হয়ে উঠেছে।

এজন্যই সে এই দলটিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে। না হয় অন্য জেনারেলরা ভুল পথে পরিচালনা করে সেনাদলকে মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করে দেবে।

কস্তন্তীন তো জানেই, মালিকায়ে মার্টিনার আসলে মিসরের ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। তিনি এখন নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসাতে মরিয়া। সব মনোযোগ রাজমুকুটের দিকে। এজন্য কস্তন্তীনও এখন বযনতিয়া থেকে অনুপস্থিত থাকতে চাচ্ছে না।

'হুকুম একমাত্র আমারই চলবে।' মালিকায়ে মার্টিনা ঘোষণা করলেন, 'অথবা আমার ছেলের হুকুম চলবে। কস্তন্তীন আমাদের ফৌজের কমাণ্ডার। সে আমার কাছ থেকে অথবা আমার ছেলের কাছ থেকে যেন হুকুম গ্রহণ করে। এজন্য এখন শাহী হুকুম হলো, সে যেন সেনাসাহায্য নিয়ে মিসর চলে যায়। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সমস্যা মিটে গেছে।'

সমস্যা মিটবে কি, সমস্যা ক্রমেই কঠিন সংকটের আকার নিলো। কস্তন্তীনের সমর্থক জেনারেল, পদস্থ কর্মকর্তা, সেনা অফিসার, প্রশাসনিক ছোট বড় হাকিম এবং শাহী খান্দানের কিছু লোক তার ঘোর সমর্থনে মোর্চাবদ্ধ হয়ে গেলো।

এরা মিসরের বিপর্যস্ত অবস্থা ও মুসলমানদের একের পর এক বিজয়ের ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়ে সবাই কস্তন্তীনের রাজমুকুটের উত্তারাধিকারের প্রশ্নটিই প্রাধান্য দিতে লাগলো।

এসব সেনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাস্তবেই সালতানাতে রোমের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে চায়। এজন্য ওরা কস্তন্তীনকেই বর্তমান পরিস্থিতি সামলে উঠার যোগ্য মনে করে। বয়সেও কস্তন্তীন প্রায় মধ্যবয়সে পৌঁছে গেছে। এবয়সে মানুষের বিষয় বুদ্ধি আরো প্রখর হয়ে উঠে।

অন্য দিকে সম্রাজ্ঞী মার্টিনা নিজের শুভাকাঙ্খীদেরকে এক প্রকার কিনে নিয়েছেন। ধনভাণ্ডার তার হাতেই ছিলো। শাহী হেরেমেও চলতো তারই হুকুম। ধন সম্পদ ও সুন্দরী নারীদের ব্যবহার করে তাই মার্টিনা সহজেই কিছু জেনারেল ও হাকিমকে নিজের মুঠোয় পুরো নেয়।

এখন সময় এসেছে এসব নজরানা আর বখশিশের ঋণ আদায় করা। এজন্য ওরা কস্তন্তীনের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে গেলো।
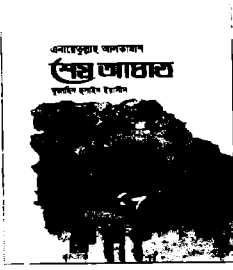
শাহী হুকুম তো অকেজো হয়ে গেছে। সেনাসাহায্য রওয়ানার অপেক্ষায় ব্যারাকে বসে আছে। দুপক্ষের জেনারেলরা নিজেদের সেনা ইউনিটগুলোকে পৃথক করে ফেলেছেন। গৃহযুদ্ধের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে।

সালতানাতে রোমের ব্যাপারে কস্তন্তীনের আন্তরিকতা ছিলো প্রশ্নাতীত। সে মনে প্রাণেই চাচ্ছিলো ক্ষমতা নিয়ে এ বিরোধ মিটে যাক।

এর মধ্যে মার্টিনা এ চালও চাললেন যে, কয়েকজন বড় পাদ্রীকে এজন্য কস্তন্তীনের কাছে পাঠান যে, তারা কস্তন্তীনকে রাজি করাবে, সে যেন পুরো সেনাদলের প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে নেয়। হারকিলিউনিাস সিংহাসনে বসলেও ক্ষমতা থাকবে কস্তন্তীনের হাতেই।

পাদ্রীরা কস্তন্তীনের কাছে গিয়ে তাকে বুঝাতে শুরু করলো। কস্তন্তীন উত্তরে বললো, সে নিশ্চিত যদি হতো যে, হারকিলিউনাস সিংহাসনে বসলে সালতানাতে রোমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুসংহত হবে তাহলে সে সিংহাসনের দাবী ছেড়ে দিতো। কথায় কথায় কোন এক পাদ্রী তাকে অপমানসূচক কথাও বলে ফেললেন।

'আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য সম্মান করেই বলছি' কস্তন্তীন থম থমে গলায় বললো, 'আপনারা কিন্তু আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন এবং হুমকিও দিচ্ছেন। আপনাদের মধ্যে কি এতটুকু জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধিও নেই যে, আপনারা হারকিলিউনাসের চরিত্র ও যোগ্যতার দৌড় জেনেও তাকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন?'...

'আসলে আপনারা নিরুপায়। কারণ, মালিকায়ে মার্টিনার দেয়া বখশিশ আর নজরানাই আপনাদের ভেতর থেকে কথা বলছে। মার্টিনা যে সুন্দরী যুবতী মেয়েদেরকে আপনাদের পবিত্র ভোগে দিয়েছে সেই তারা আপনাদের ওপর যাদুর মতো সওয়ার হয়ে আছে। পবিত্র গির্জার পাদ্রীর পদ থকে আপনাদেরকে পদচ্যুত করার আগে আপনারা এখান থেকে দূর হয়ে যান।'

পাদ্রীদের বিবেক অপরাধী। তাই তারা মাথা নিচু করে চলে গেলো।

পাদ্রীরা চলে যেতেই কস্তন্তীন বাদশাহর মেজাজে হুকুম জারী করলো, সাহায্যকারী সেনাদলকে দ্রুত প্রস্তুত করে মিসর পাঠানো হোক। কিন্তু তার হুকুম পরিণত হলো হাওয়ায় হুকুম চালানোর মতো।

কস্তন্তীনের সমর্থক জেনারেলরা জানালো, সেনাদলও দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। কস্তন্তীনের পক্ষের সৈন্যদেরকে যদি সাহায্যকারী সেনাদল হিসাবে মিসরে পাঠানো হয় তাহলে তো তার সমর্থনকারী সেনারা সংখ্যায় অনেক কমে যাবে। তখন সহজেই মার্টিনার সৈন্যরা হারকিলিউনাসকে রোমের বাদশাহ বানিয়ে দেবে।

যারা এক সময় দেশ বাঁচানোর জন্য কাধে কাধ মিলিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারাই আজ দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে পরাজয়ের রক্ত পান করতে মরিয়া হয়ে উঠছে।
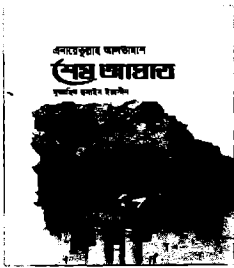
সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) তখনো বযনতিয়ার অবস্থা জানতে পারেননি এবং এও তার জানার কথা নয় যে, রোমীয়দের পক্ষে সেনা সাহায্য আসার সম্ভাবনা আপাতত নেই।

তাই তিনি আগের মতোই সতর্কতা অবলম্বন করে পরিকল্পনা করতে লাগলেন, কি করে পরিখা পার হয়ে কেল্লার ওপর হামলা করা যায়। কোনভাবেই এর সম্ভাব্য পথ দেখা যাচ্ছিলো না।

মালিকায়ে মার্টিনা জেনারেল থিয়োডরকে আরেকটি পয়গাম পাঠালেন। শাহী মহলের সঠিক অবস্থা পয়গামে লিখে বলা হলো, যেকোন সময় এখানে গৃহযুদ্ধ হতে পারে। গৃহযুদ্ধ হোক বা না হোক এটা এখন স্পষ্ট যে, হারকিলিউনাস সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব পাচ্ছে না।

মার্টিনা আরো লিখেছেন, নিজের সব শক্তি কৌশল খুব ভেবে চিন্তে ব্যবহার করো। মিসর থেকে মুসলমানদেরকে বের করতেই হবে।

মার্টিনার আসল উদ্দেশ্য হলো, হতে পারে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টিহবে যে, সাধারণ মানুষ তার ও তার ছেলের বিরুদ্ধে চলে যাবে। তখন তিনি ছেলেকে নিয়ে মিসর এসে আশ্রয় নেবে। তারপর মিসরের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ঘোষণা দেবেন।

থিয়োডরকে জোরালো ভাষায় লিখলেন, মিসরকে নিরাপদ রাখা চাই। সেখান থেকে আমাদের বাদশাহী শুরু হবে। মিসরে যে রোমীয় ফৌজ আছে সে ফৌজ হবে আমাদের নিজস্ব ফৌজ।

হেরাকল বয়নতিয়ায় মুকাওকিসকে যখন গাদ্দারীর দায়ে অভিযুক্ত করেন তখন বলেছিলেন,

মিসরে এক লাখ রোমীয় ফৌজ রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র বার হাজার সৈন্যকেই লড়ানো হয়েছে। যদি বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক রণকৌশলে এতগুলো সৈন্যকে ব্যবহার করা হয় তাহলে মুসলমানদের এই হাতে গোনা কিছু সৈন্যকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পিষে ফেলবে।

হেরাকল একথা মোটেও বাড়িয়ে বলেননি। মিসরে তখন এক লাখ রোমীয় ফৌজ ছিলো। তবে এরা বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে ছড়ানো ছিটানো ছিলো। মুসলিম সেনাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াইয়ে নামে তাদের মধ্যে কয়েক হাজার নিহত হয়।

থিয়োডর মার্টিনার দ্বিতীয় পয়গাম অনুযায়ী তার প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় রদবদল করলো।

একদিন মুজাহিদরা দেখলো, রোমীয়রা মিনজানিকগুলো কেল্লার ভেতর নিয়ে যাচ্ছে। তারপর তীরন্দায ইউনিটগুলোও কেল্লার ভেতরে চলে যাচ্ছে।

আমর ইবনে আস (রা.) তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, কেল্লার ফটকগুলো বন্ধ হয়ে গেলো।

একটুপর দেখা গেলো, মিনজানিকগুলো কেল্লার প্রাচীরের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে পাথর বর্ষণ শুরু হলো।

ব্যবিলনের বাইর এখন মুসলিম শিবিরে বেশ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। রোমীয় মিনজানীক ও তীরান্দাযরা যখন কেল্লার ভেতর চলে গেলো মুজাহিদরা তখন এগিয়ে গিয়ে পরিখা দেখতে লাগলো।

তীরান্দাযরা থাকলে এটা সম্ভব হতো না। কারণ, অনবরত তীরবৃষ্টি কাউকে পরিখার সামনেই যেতে দিতো না। মুজাহিদরা দেখছিলো পরিখা অতিক্রম করা যাবে কিনা।

দেখে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। রোমীয়রা পরিখা পার হওয়া তো দূরের কথা, এই কল্পনাও যাতে কেউ না করে সে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। পরিখায় এক ফোটা পানিও নেই। পুরো পরিখা অতি ধারালো কাটা তারের বেড়া দিয়ে পরিবেষ্টিত।

এছাড়াও বর্শার ফলার চোখা চোখা লোহার থাম পুরো পরিখায় গেড়ে দেয়া হয়েছে। পরিখাকে পুরো একটা মৃত্যুক্ষেত্র বানিয়ে রেখে গেছে রোমীয়রা।

পানি দিয়ে ভরে রাখলে তো কষ্টে সৃষ্টি সাতরে পার হওয়া যেতো। কিন্তু পরিখাকে যে ভয়ঙ্কর করে রেখে গেছে রোমীয়রা কোন মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীও তাতে পা ফেলার সাহস করবে না।

প্রায় আটমাস কেটে গেছে অবরোধের। তবুও মুজাহিদদের মধ্যে হতাশা বা হীনমন্যতার কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু সিপাহসালার ও অন্যান্য সালারদের অস্থিরতা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। পরিখা একে তো খুব চওড়া।

তারপর এসব অনাতিক্রম্য ভয়ঙ্কর সব বাধা পেরিয়ে পার হওয়ার কল্পনাও করা যাচ্ছিলো না। তারপরও সবাই যার যার মতো মাথা খাটাচ্ছিলেন। যেভাবেই হোক পরিখা অতিক্রম করতে হবে।
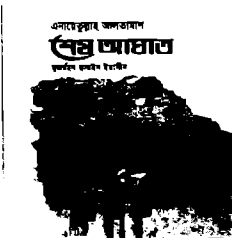
সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) একটা চেষ্টা করলেন। যোবায়ের (রা.) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফুফাতো ভাই। আরবের অন্যতম বীর পুরুষ হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো। তাঁর ব্যাপারে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'প্রত্যেক নবীরই একজন হাওয়ারী-বিশ্বস্ত সহচর থাকে। আমার হাওয়ারী হলো যোবায়ের ইবনে আওয়াম।'

যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) যখন দেখলেন, পরিখা পার হওয়া না হওয়ার ওপরই নির্ভর করছে অবরোধের সফলতা ও ব্যর্থতা। তিনি পণ করলেন, একটা না একটা সম্ভাব্য উপায় বের করতেই হবে।

এক রাতে তিনি বলশালী বেশ কয়েকজন মুজাহিদ সঙ্গে নিলেন। বিশাল বিশাল কয়েকটি গাছের ডাল কাটালেন। পাতাসুদ্ধ ডালগুলোকে টেনে হেচড়ে পরিখা পর্যন্ত সবাই মিলে নিয়ে গেলো।

পরিখাটি তার নিচ দিয়ে কাটা তার ও লোহার চোখা চোখা ফলা দিয়ে পরিবেষ্টিত। তারা গাছের বড় বড় ডালপালাগুলোকে এমনভাবে পরিখায় ফেলতে লাগলো যে, ডালগুলোর আরেক মাথা পরিখার অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌছতে লাগলো।

তারা পরিখার এ প্রান্ত থেকে জায়গা বদল করে করে গাছের ডালাগুলো ফেলতে লাগলো পরিখায়। এভাবে পরিখার ওপর দিয়ে এক দুজনের পার হওয়ার মতো অতি ঝুঁকিপূর্ণ একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেলো।

তারপর তিনি মুজাহিদদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করে এভাবে বক্তৃতার মতো করে বললেন,

'স্মরণ করো খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর সেই মহান কীর্তি যা দিয়ে তিনি দামেশক জয় করেছিলেন। স্মরণ করো হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) এর সেই বীরত্বগাথা, যা দিয়ে তিনি মাদায়েন জয় করে ছিলেন। নাহাওয়ান্দে নাঈম ইবনে মিকরানের ঐতিহাসিক বীরত্বের কথাও ভুলে যেয়ো না।...

তোমাদের এমন কে আছে, যে এসব মহান মুজাহিদদের মতো আত্মত্যাগের অমর কীর্তি গড়তে চাও না?'

'অবশ্যই চাই, সবাই বলে উঠলো, 'আমরা আল্লাহর রাহের জানবাজ আর আত্মবিসর্জনকারী। আমাদেরকে বলুন, মহামান্য সালার! আমাদের কী করতে হবে?'

'আল্লাহর রাহে আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করছি। আল্লাহ তাআলা আমার এই কুরবানীকে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ যেন বানান।' যোবায়ের (রা.) বললেন।

যোবায়ের (রা.) এর এতটুকু কথায় মুজাহিদদেরকে জোশ-জযবার জীবন্ত অঙ্গার বানিয়ে দিলো।

মুসলিম সেনাদের প্রত্যেকেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করে চলে। কোন সালারই এমন কিছুই করবে না যা সিপাহসালারের অনুমোদন সাপেক্ষে হবে না। যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সিপাহালারকে আগেই পুরো পরিকল্পনা জানিয়ে রেখেছিলেন। তারপরই তিনি একাজটি করেন।

যোবায়ের (রা.) আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে গিয়ে জানালেন, পরিখায় তিনি কি করে এসেছেন এবং কেল্লায় হামলার জন্য মুজাহিদদের পূর্ণাঙ্গ একটি ইউনিট প্রস্তুত করেছেন। তারপর তিনি তার পরিকল্পনার কথাও জানালেন।

ঝুঁকি নেয়ার ক্ষেত্রে তো আমর ইবনে আস (রা.) এর দারুন খ্যাতি ছিলো। তিনি তো নিশ্চিত হয়ে গেছেন, ব্যবিলনের দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করতে হলে ভয়াবহ কোন ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে। যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সে ঝুঁকিটাই নিচ্ছেন। আমর (রা.) সব দিক ভেবে চিন্তে যোবায়ের (রা.)-কে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

যোবায়ের (রা.) যখন সেদিকে ফিরে গেলেন যেখানে পরিখার ওপর গাছের ডাল পালা ফেলে সরু একটা পথের মতো তৈরী করে গেছেন। এখানে এসে দেখলেন আগের চেয়ে অনেক বেশি মুজাহিদ জমা হয়ে গেছে। সবাই নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হচ্ছে।

সবাই ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তাদেরকে কী কাজে লাগানো হবে!

যোবায়ের (রা.) বেছে বেছে এক ইউনিট সৈন্য আলাদা করে তাদেরকে জানালেন, তিনি কী করতে চাচ্ছেন এবং এজন্য কেমন ভয়াবহ আত্মত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আসলে তাঁর পরিকল্পনায় নিশ্চিত শাহাদাতের রক্তরাঙা দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগলো।

যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর নির্দেশে সৈন্যরা অনেকগুলো বাঁশের সিড়ি একত্রিত করলো, তারপর এক সঙ্গে দুটি করে সিঁড়ি বাঁধলো।
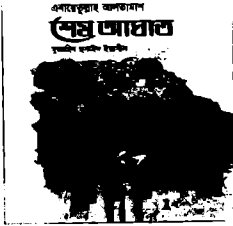
এ কাজগুলো হচ্ছিলো রাতের অন্ধকারে। অন্ধকার তো সেনাদেরকে বেশ ফায়দা দিচ্ছিলো, কিন্তু এই অন্ধকারে বিপদের ঝুকিও কম ছিলো না।

বিজয় তাদের ভাগ্যেই লেখা হয় যারা নমরুদের প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে নির্ভয়ে ঝাপিয়ে পড়ে।

সেখানে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)ও চলে এলেন। তিনি তার সেনাদলকে উৎসাহ জোগাতে লাগলেন। ওরা তো দারুন খুশি যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর মতো এমন একজন নির্ভিক সালার তারা পেয়ে গেছে।

তিনি তাদের মধ্যে নতুন এক প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছেন।

মুসলিম সেনাদের সঙ্গে কারো কারো বোন, কারো স্ত্রী, কারো মাও এসে থাকে। এই সেনাদলের কারো মা বোন, স্ত্রীরা তাদের সঙ্গে এসেছে। এরা সবাই কঠিন পর্দার সঙ্গে থাকে এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করে।

নারী মহলে যে কোনভাবে এখবর চলে গেছে, সৈন্যরা পরিখা অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। আর এটা খবুই ভয়াবহ কাজ।

তারা জানতো মুসলিম সৈন্যরা অনেক পরিখাই বিভিন্নভাবে অতিক্রম করেছে। কিন্তু ব্যবিলনের আশে পাশের যে পরিখা তা ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারা এখন জানতে পারলো, অমুক সালারের নেতৃত্বে পরিখা পার হওয়ার একটা কৌশল বের করা হয়েছে এবং পরিখা পার হতে পারলে কেল্লার প্রাচীরে উঠার জন্য অসংখ্য সিড়ির দরকার হবে এবং আরো কিছু জিনিসপত্রও লাগবে।

এসব শুনে বিশ পচিশজন মেয়ে সেদিকে ছুটতে শুরু করলো যে দিক দিয়ে পরিখা পার হওয়ার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) তাদের ছুটন্ত পদধ্বনি এবং তাদের কথার আওয়াজ পেয়ে নিজেও ছুট দিলেন।

তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তাদের পথরোধ করে জিজ্ঞেস করলেন, তারা এভাবে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছে? আর বললেন, তাদের গলার আওয়াজ যেন উঁচু না হয়। নিঃশব্দে যেন তারা চলাচল করে।

এক মেয়ে এগিয়ে এসে জানালো তারা কোথায় যাচ্ছে।

'এখনই কোন কথা না বলে চুপচাপ চলে যাও। তোমাদের প্রয়োজন দেখা দিলে অবশ্যই ডেকে আনা হবে।' আমর (রা.) বললেন,

'প্রাচীরে চড়ার সিড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আমাদেরকে যেতে দিন। আমরা তো অযথা তাবুতে পড়ে আছি।' কথাটি বলল নেকাবে আবৃত শারীনা।

আমর ইবনে আস (রা.) একটু শক্ত হয়ে বললেন, তারা যেন ফিরে যায়। পরিখা পার হওয়া মুসলিম সেনাদের জন্য নতুন কোন অভিজ্ঞতা নয় যে, মেয়েদের সাহায্য ছাড়া একাজটি হবে না।

'মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য নিয়েই আপনি সব কিছু করে ফেলবেন!' আরেকটি মেয়ে বললো,

'আমাদের শরীরেও আল্লাহ তাআলা শক্তি দিয়ে রেখেছেন। এটা তো কোন কাজে লাগা দরকার। আমরা শুধু লড়াইয়ের পর শহীদের লাশ ওঠাই। আহত সৈন্যদেরকে খুঁজে পেয়ে তাদের শিবিরে পৌঁছে দিই। এই পরিখার ব্যাপারে আমরা বেশ ওয়াকিফহাল রয়েছি।'

'আমাদের পুরুষদের তো শুধু পরিখা পার হওয়াই নয় সামনে গিয়েও কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়তে হবে। আমরা যতটুকু করতে পারি সেটা আমাদেরকে করতে দিন।

'তোমাদের করার শুধু একটি কাজই আছে।' আমর ইবনে আস (রা.) বললেন, 'এখনই ফিরে যাও এবং এ কাজ শুরু করে দাও...অযু করো, নফল পড়ো এবং আমাদের সফলতার জন্য দুআ করো...। আমাদের জন্য তোমাদের এ সাহায্যের বড় প্রয়োজন।'

মেয়েরা আর কোন কথা না বলে তো ফিরে গেলো; কিন্তু তাদের সবার ওপর হতাশা নেমে এলো। তাবুতে ফিরে গিয়ে তারা সবাই অযু করলো। তারপর পৃথক পৃথক ভাবে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো।

কয়েক রাকাত করে নামায পড়ার পর তারা দুআর জন্য হাত উঠালো। দুআর মধ্যে তারা সবাই কান্নায় ভেঙে পড়লো।
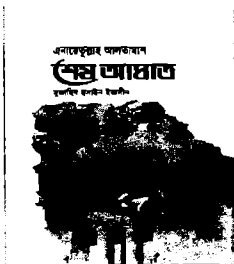
এদিকে মুসলিম সেনাদের সিপাহসালার সিপাহীদের কাতারে নিজেকে নামিয়ে মুজাহিদদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করছেন। ওদিকে কেল্লার ভেতর রোমীয় জেনারেলরা বাদশাহ বনে বসে আছে। মুকাওকিসের পর জেনারেল থিয়োডরই এখন মিসরের স্বঘোষিত বাদশাহ।

প্রায় মাঝ রাত হয়ে এসেছে। থিয়োডরের শয়ন কক্ষে সদ্য তরুনী একটি মেয়ে তার অপেক্ষায় বসে আছে। থিয়োডর তখন অন্য আকেরটি কামরায়। তার সঙ্গে তার অধীনস্ত দুজন জেনারেল ও তার পাঁচজন সেনা কর্মকর্তা রয়েছে। জেনারেলের পরেই যাদের পদমর্যাদা। সেখানে জেনারেল জারেজও আছে। যে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতায় থিয়োডরের সমপর্যায়ের।

জেনারেল থিয়োডরের মাথায় এখন সওয়ার হয়ে আছে মালিকায়ে মার্টিনা ও তার প্রতিশ্রুতি দেয়া নজরানা আর বখশিশের কথা।

নিজেকে তো এখন থিয়োডর ফারমাওয়ারে মিসর অর্থাৎ মিসরের শাসক মনে করছে। তার সামনে বসা সেনা কর্মকর্তাদেরকে সে নিশ্চয়তা দিচ্ছে, এই আরবী সৈনিকরা ব্যাবিলনের প্রাচীরের কাছে ধারেও ঘেষতে পারবে না।

তার এই দাবি যে অমূলক নয় এটাও সবাই বুঝছিলো। কারণ, পরিখাকে যেভাবে ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুফাঁদ বানানো হয়েছে তা অতিক্রম করে কেউ কেল্লার ধারে কাছে পৌছার কথা কল্পনাও করতে পারবে না। এজন্য উচ্চ পদস্থ অফিসার থেকে নিয়ে

সাধারণ সৈন্য পর্যন্ত নিশ্চিত হয়ে যায়, মুসলমানরা কোন দিনও পরিখা পার হয়ে কেল্লায় পৌছতে পারবে না।

সেনা কর্মকর্তাদের সাধারণ সভা চলছে। প্রায় অর্ধ উলঙ্গ সুন্দরী দুটি মেয়ে তাদেরকে মদ পরিবেশন করছে। মদ তার নেশার কাজ তাদের মধ্যে শুরু করে দিয়েছে।

'বযনতিয়ার ব্যাপারে এখনো যদি তোমরা কোন আশা পোষণ করে থাকো সেটা মন থেকে বের করে দাও।' থিয়োডর বললো, 'এটা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে, শাহে হেরাকল সেনা সাহায্য পাঠাতে চাননি। এখন তার পুত্র কস্তন্তীনই তার এ দায়িত্ব পূরণ করতে পারে। কিন্তু সেও যে সেনা সাহায্য পাঠাবে সে ব্যাপারেও আমি আশাবাদী নই।'..

'বযনতিয়া থে ক যেসব সংবাদ আমার কাছে আসছে তা আমাদের জন্য এবং মিসরের জন্য মোটেও ভালো নয়। কস্তন্তীন শাহে হেরাকলের গদিতে বসার পায়তারা করছে। সম্রাজ্ঞী মার্টিনার পয়গাম আমার কাছে এসে গেছে।'

'একমাত্র মার্টিনাই শাহে হেরাকলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। তবে যাই হোক, আমরা যদি আশা করে থাকি, কস্তন্তিন সেনা সাহায্য পাঠাবে তাহলে সে আশায় গুড়ে বালি।'..

'তবে মালিকায়ে মার্টিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশাল সংখ্যার এক সেনা সাহায্য পাঠাবেন। অবশ্য এতে কিছু সময় লেগে যাবে। মিসরের ব্যাপারে হেরাকলেরও কোন মনযোগ ছিলো না। কস্তন্তীনেরও নেই। তার সব মনযোগ এখন সিংহাসন ও রাজমুকুটের ওপর।...'

'মনে এই সংকল্প করো এবং শপথ করো, আমাদেরকে এই পরিখার বাইরেই মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। আমি মিসরের ভেতর থেকেই সেনা সাহায্যের ব্যবস্থা করবো।'

'আর আরবের এই বুদ্ধুরা আর কত দিন অবরোধ করে বসে থাকতে পারবে?' জেনারেল জারেজ বললেন, 'ওদেরকে কিছু দিন এভাবে বসে থাকতে দাও। আমরা ওদের রসদের পথও বন্ধ করে দিচ্ছি। ওরা যখন খাবার না পেয়ে মরতে বসবে তখন ওদের পেছন থেকে হামলা করবো।'

'মিসরেই তো আমাদের বহু সংখ্যক সৈন্য রয়েছে।' থিয়োডর বললো, 'এই আরবদেরকে একটু আত্মতুষ্টিতে থাকতে দাও। এখনো এরা জয়ের নেশায় ডুবে আছে। আর কিছু দিন পরই টের পাবে ওরা কত বড় ভুলের মধ্যে ছিলো।'
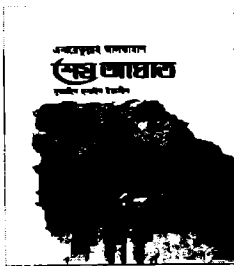
মাঝ রাতের দিকে এ সভা ভাঙ্গলো। অফিসাররা সবাই যার যার ঠিকানায় চলে গেলো। থিয়োডরও তার শয়ন কক্ষে গিয়ে হাজির হলো। যেখানে তার অপেক্ষায় এক তরুণী বসেছিলো। রাত বেড়ে যাওয়াতে মেয়েটি আর ঘুম চেপে রাখতে পারলো না। খাটের ওপরই এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

এ তরুণী মিসরের বাদশাহের হেরেমের কোন মেয়ে নয়। আর মুকাওকিসও এখানকার শাহী মহলে কোন হেরেম গড়ে তুলে যাননি। এ এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তাদের ঘরে এমন কোন অভাব নেই যে, একটি মেয়েকে আরেকজনের ঘরে রাত কাটাতে হবে।

কিন্তু বড় ঘরের মেয়েরাও কখনো এ স্বপ্ন দেখে না যে, সে কখনো শাহী মহলের শয়নকক্ষের শোভাবর্ধন করার সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারবে।

এ মেয়েটিও একল্পনা কখনো করেনি। তবে সে সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও খোদা তাকে এমন অসাধারণ রূপের অধিকারী করেছেন যে, শাহী মহলেই তাকে বেশি মানায়।

থিয়োডর একবার শহর পরিদর্শনের সময় কোথাও মেয়েটিকে একবার দেখতে পায়। দেখার পর বেশ কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। তার সঙ্গে তখন তার এক বিশেষ সচিব ছিলো।

সে তার সচিবকে বললো, মেয়েটিকে তার এতই ভালো লেগেছে যে, আজ রাতে মেয়েটিকে তার শয়ন কক্ষে না দেখলে সে হার্টফেল করবে। সচিব তাকে নিশ্চয়তা দেয়, সময় মতোই মেয়েটি তার কামরায় পৌঁছে যাবে।

বহু সোনা রূপা ও টাকা পয়সার বিনিময়ে মেয়েটিকে রাতের প্রথম প্রহরেই থিয়োডরের মহলে পৌঁছ দেয়া হলো। মেয়েটিকে খুব বেশি জোরজবস্তি করতে হয়নি। তার মা বাবাকে এত বেশি সোনাদানা আর টাকা পয়সা দেয়া হলো যে, তারা কখনো তা স্বপ্নেও দেখেনি।

তাদেরকে ও তাদের মেয়েকে স্বপ্ন দেখানো হলো, বর্তমান মিসরের গভর্নর জেনারেল থিয়োডর এই মেয়েক বিয়ে করবে।

থিয়োডরের বয়স প্রৌঢ়ত্বে পৌছে গেছে। কিন্তু এখনো তার স্বাস্থ্য বেশ অটুট রয়েছে। তার শয়ন কামরায় ঢুকে দেখলো, মেয়েটি তার খাটের ওপর পড়ে ঘুমুচ্ছে। তার ঘুম যে গভীর এও বুঝা যাচ্ছে।

থিয়োডরের এমন কোন ভয় নেই যে, তার স্ত্রী যদি জানতে পারে তার স্বামীর কামরায় একটি মেয়ে আছে; তাহলে হৈচৈ করবে। তার স্ত্রী ও মেয়েরা তাদের নিজ নিজ কামরায় ঘুমুচ্ছে।

অবাধ স্বাধীন সমাজে এদের বসবাস। এখানে কোন মেয়ে তার স্বামী ছাড়া যেমন ভিন পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলা মেশা করতে পারে। পুরুষরা তো আরো অবাধে একাধিক নারীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক রাখতে পারে। আর এরা তো এই সমাজের সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর মানুষ। এদের কাছে তো শালীনতা-অশ্লীলতা সবই সমান।
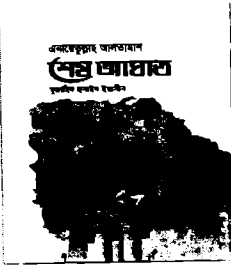
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেয়েটিকে থিয়োডরের এখন আরো সুন্দরী লাগছে। নেশায় মদ-মাতাল থিয়োডর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। আর মেয়েটির দিকে চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছে। তার কাছে তো মেয়েটি একটি খেলনামাত্র। যেভাবে ইচ্ছে তার সঙ্গে সে খেলতে পারে। সে মেয়েটির রেশম কোমল চুলে বিলি কাটতে লাগলো।

মেয়েটি ঘাবড়ে গিয়ে জেগে উঠলো। তার সরল-নিস্পাপ চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠলো। তবে থিয়োডরের মুখে খোলা হাসি দেখতে পেয়ে ভয় কিছুটা কমে এলো। থিয়োডর ওর কাছে বসে প্রেম নিবেদনের সুরে এমনভাবে কথা বলতে লাগলো যে, তাকে বেশ আপন মনে হলো মেয়েটির।

'আমাকে এমন ভয় পেয়ো না মেয়ে! থিয়োডর আদুরে গলায় বললো, 'আমার মন তোমাকে ভালবেসে ফেলেছে। তোমাকে আমি মিসরের সম্রাজ্ঞী বানাবো। বলো, তুমি মিসরের সম্রাজ্ঞী হবে না?'

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়ে বাচ্চাদের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলো। এর তো জানার কথা নয়, এলোক নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। সকালেই সে সেসব কথা ভুলে যাবে যা সে রাতে বলেছে।

থিয়োডর তার ওপর হিংস্রের মতো ঝাপিয়ে না পড়ে খুব আন্তরিক হয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। যেন মেয়েটি তার কত দিনের চেনা।

কথা বলতে বলতে মেয়েটিও থিয়োডরের সঙ্গে আড়ষ্টতা কাটিয়ে ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো। কথায় কথায় মুসলমানদের কথাও উঠলো। থিয়োডর মুসলমানদের ব্যাপারে ঘৃণাসূচক কথা বললো।

মেয়েটির মা বাবা কট্টর কিবতী খ্রিস্টান। মেয়েটির মনোভাবও মা বাবার মতো। ধর্মের ব্যাপারে বেশ অন্ধ। ধর্মের কথা শুনে তার মধ্যেও ধর্মের ব্যাপারে অন্ধত্ব জেগে উঠলো।

'আমি এক মুসলমান গুপ্তচরকে ধরিয়ে দিতে পারবো।' মেয়েটি অনেক বড় দায়িত্ব পালন করছে এমনভাবে বললো, 'ও আমাকে অনেক ভালোবাসে। ওকে আমার অনেক ভালো লাগে। আমি জানতে পেরেছি, সে আরবের সেই সেনাদলের গুপ্তচর যে আমাদের এই শহরকে অবরোধ করে রেখেছে। কিন্তু আমি ওর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাইনি। কারণ, সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলো।'

'তাহলে এখন কেন মুখ খুলছো?' থিয়োডর অবিশ্বাস্য গলায় জিজ্ঞেস করলো।

'আমি বুঝতে পারছি, ওর সঙ্গে বেঈমানী করছি।' মেয়েটি গম্ভীর গলায় বললো, 'কিন্তু আপনার কথা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে, ওর সঙ্গে যদি আমি সকৃতজ্ঞ আচরণ করি তাহলে এটা আমার ধর্ম ও দেশের সঙ্গে বেঈমানী হবে। যেটা গাদ্দারীর শাস্তির উপযুক্ত হবে।'

সে থিয়োডরকে জানালো, এই মুসলমান গুপ্তচর কবে এখানে এসেছে এবং কোথায় থাকে।

'সাবাশ মেয়ে সাবাশ!' থিয়োডর দারুন খুশী হয়ে বললো, 'ভালোবাসা আর আবেগকে বিসর্জন দেয়ার চেয়ে বড় কুরবানী আর কি হতে পারে? আমি তোমার এই আত্মত্যাগী মনোভাবকে অবশ্যই মূল্যায়ন করি এবং তুমি এর পূর্ণ প্রতিদান পাবে।'

'সকাল বেলা এই মুসলিম গুপ্তচর হাত পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় এখানে থাকবে এবং তোমার সামনে ওর মাথা ধর থেকে আলাদা করে তোমার সামনে নিক্ষেপ করা হবে।'

মেয়েটির বাস্তব জগত স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত হলো। সেখানে সে স্বপ্নের সম্রাজ্ঞী হয়ে গেলো। নিজেকে থিয়োডরের কাছে সমর্পনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।'

'এই মুসলিম গোয়েন্দা কে?'

তার নাম উসামা বিন আজহারী। চব্বিশ পচিশ বছরের যুবক। ইরাকে মুসান্না ইবনে হারিসার সেনাদলে ছিলো। যারা কিসরায়ে ইরানের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে।

অবশ্য মুসান্না এমন আত্মত্যাগী লড়াইয়ের স্বাক্ষর রাখেন যে, কিংবদন্তীর এক শহীদের খাতায় তার নাম স্বমহিমায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

উসামা বিন আজহারীর বড় ভাই শামের অভিযানে হেরাকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়। এরা মাত্র দুই ভাই। এখন শুধু উসামাই বেঁচে আছে। তার মা একা হয়ে পড়ায় উসামাকে রণাঙ্গনে পাঠাতেন না।

এর আগে ওদের বাবাও যুদ্ধে শহীদ হন। এখন বাপের পর ভাইও যখন শহীদ হয়ে গেলো তখন উসামার মা তাকে বললো, সে যেন তার ভাইয়ের জায়গায় চলে যায়। এভাবে উসামা রোমীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয় এবং তার মা-ও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

উসামার সালার যখন দেখলেন তার মধ্যে বেশ ক্ষিপ্রতা রয়েছে এবং সে নিপুন মেধার অধিকারী তাকে তখন গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উসামা বেশ সুদর্শন পুরুষ। কথার মধ্যেও বেশ আকর্ষণ ও আত্মপ্রত্যয় ফুটে উঠে।

প্রথমবার যখন গোয়েন্দা অভিযানে পাঠানো হয় তখন সে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যে, এক রোমীয় অফিসারের খাদেম হয়ে যায়।

প্রায় দেড় মাস পর ফিরে অতি মূল্যবান কিছু তথ্য নিয়ে। অবশেষে তাকে আমর ইবনে আস (রা.) এর সেনাদলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

মিসরে এসে গুপ্তচর বৃত্তিতে দারুন সাফল্য দেখায়। তারপর তাকে ব্যবিলনের ভেতর পাঠানো হয়। একবার শহর থেকে বেরিয়ে এসে সিপাহসালারকে জানিয়ে যায় রোমীয় ফৌজের মানসিক অবস্থা কি এবং শহরের লোকদেরও মনোভাব কেমন। এসব তথ্য সিপাহসালারের পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে বেশ সহায়ক হিসেবে কাজে দেয়।

তারপর সে আবার আরেক ছদ্মবেশে ব্যবিলনের ভেতর চলে যায়। কিন্তু এবার আর সে ব্যবিলন থেকে বেরোতে পারলো না। কারণ, ততদিনে ব্যবিলন মুসলমানরা অবরোধ করে ফেলেছে।

এ অবস্থায় শহর থেকে বের হওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার। তাই সে এক খ্রিস্টান ব্যবসায়ীর আস্থাভাজন নওকর হয়ে যায়।

তার চিন্তা ছিলো শহরের ভেতরে থেকেই মুসলমানদের সাহায্যের যথা সম্ভব উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

উসামা বিন আজহারী এটাও ভেবে রেখেছে, মুসলিম সেনারা যদি অলৌকিক কোন উপায়ে কেল্লার ওপর হামলা চালাতে আসে তাহলে সে প্রাণ বাজি রেখে শহরের যে কোন একটা ফটক খুলে দেয়ার চেষ্টা করবে।

এই উসামা বিন আজহারীকেই মেয়েটি থিয়োডরের কাছে শনাক্ত করেছে। মেয়েটি যে বলেছে ওর সঙ্গে ছেলেটির ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে এটা একটা ঘটনার পর থেকে শুরু হয়েছে।

ঘটনাটি ছিলো এরকম, বড় একটি পাল তোলা নৌকা ব্যবিলন থেকে যাচ্ছিলো নীল নদের মধ্যদ্বীপ রওজা কেল্লায়। যে ব্যবসায়ীর কর্মচারী সেজেছে উসামা সে ব্যবসায়ী তাকেও কোন কাজে ওখানে পাঠায়।

নীলনদের এদিকটা অবরোধের আওতা থেকে নিরাপদ। এজন্য ব্যবিলন ও কেল্লা রওজার মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ, যাতায়াত অব্যহত রয়েছে।

নৌকাটি বিশাল বড়। এযুগের ষ্টিমারই বলা চলে। অনেক যাত্রী, মালপত্র এবং কয়েকটি ঘোড়াও যাচ্ছিলো।

এটা প্রায় সাড়ে তিন মাস আগের কথা। তখন নীলনদ বেশ উম্মত্ত ছিলো। ঢেউয়ের ঘূর্ণি আর উম্মত্তা নদীর মাঝখানেই বেশি থাকে। নৌকা যখন নদীর মাঝখানে পৌঁছলো তখন চালকরা লক্ষ করলো না, নদীর এ দিকটায় ঢেউ অনেক বেশি। নৌকার দুলুনিও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

এক সময় নৌকা ঢেউয়ের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আছাড়ি পাছাড়ি খেতে লাগলো। তারপর নৌকার দিক ও বদলে গেলো। তীব্র বাতাসের চাপ চালকদের হাত থেকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে গেলো নৌকাকে।

এত বিশাল নৌকার একদিক এমনভাবে কাত হয়ে পড়লো যেন পুরো নদী নৌকার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সদ্য তরুণী এক মেয়ে নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে পারলো না। সোজা নদীতে পড়লো।

এমন খরস্রোতা নদীতে পড়লে তো নিশ্চিত মৃত্যু। বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই, নৌকার বিপদগ্রস্ত যাত্রীরা সেটা বুঝে আরো আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

মেয়েটির বাপ তার সঙ্গেই ছিলো। সে বিলাপ করতে করতে অন্যান্য যাত্রীদের কাছে হাতজোড় করে মিনতি করতে লাগলো, তার মেয়েকে যেন কোন সহৃদয় ব্যক্তি উদ্ধার করে।

সৈনিক পরিবারের ছেলে উসামা কঠিন বিপদে ঝাপিয়ে পড়ার গুণটি জন্মগতভাবেই পেয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সীমাহীন সহমর্মিতা।

সে আর কোন কিছু না ভেবে মেয়েটির পিছু পিছু নদীতে ঝাপিয়ে পড়লো। বিশাল বিশাল ঢেউগুলো তখন মেয়েটিকে খেলনায় পরিণত করেছিলো। এক ঢেউয়ের চূড়া থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আরেক ঢেউয়ের পিঠে আছড়ে পড়ছিলো।

উসামার যুবক দেহে এমনিতেই অদম্য শক্তি। সে শক্তি যেন এখন আরো দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পুরো শক্তি একত্রিত করে সে সাতার কাটতে লাগলো। ঢেউয়ের পাহাড়গুলো যেন তার সন্তরণ প্রক্রিয়ার সামনে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো।
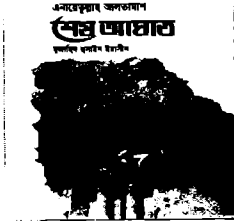
এই চরম বিপদজনক ক্ষেত্রে নৌকা বেশিক্ষণ রাখার তো প্রশ্নই উঠে না। একটি মেয়ের জন্য শত শত যাত্রীর জীবন এখানে বিপন্ন। মাঝিরা নৌকার নিয়ন্ত্রণ পেতেই নৌকা নদীর মাঝখান থেকে সরিয়ে নিলো।

নৌকা থেকে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে, মেয়েটি একবার ভেসে উঠছে। পর মুহূর্তেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পানির নিচে। নৌকা যত দূরে সরে যেতে লাগলো এ দৃশ্যও মিলিয়ে যেতে লাগলো।

উসামা প্রাণপন সাতরে মেয়েটির কাছে যেতে চেষ্টা করতে লাগলো। ধীরে ধীরে সে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঢেউয়ের ধাক্কা মাঝে মধ্যে তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এজন্য ব্যবধানও কখনো কখনো বেড়ে যাচ্ছে।

অবশেষে উসামা মেয়েটির কাছে পৌছে গেলো এবং তাকে নিজের পিঠে উঠিয়ে নিলো।

এখন শুরু হলো ভয়ঙ্কর এক অভিযান। সেটা হলো উন্মাতাল তরঙ্গ নৃত্যের কবল থেকে বের হওয়া। অনেক দূরে গিয়ে ওরা ঢেউয়ের কবল থেকে বেরোতে পারলো। তারা সামনের তীরের দিকে চলে গেলো।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটির ওজন খুব বেশি না হলেও উসামার কাছে মনে হচ্ছে তার পিঠে যেন পাহাড় চেপেছে। তারপর নদীর বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে সাতরাতে গিয়ে তার হাতও প্রায় অসাড় হয়ে এসেছিলো।

পিঠে একটি বোঝা নিয়ে তাই আর বেশি দূর সাতরানো তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিন্তু তার ও মেয়েটির সৌভাগ্য যে, ঢেউ তাদেরকে ধাক্কিয়ে নদীর তীরে পৌছে দিয়েছে।

নদী তীরের বালিতে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলো ওরা। তীরে ছোট ছোট কয়েকটি নৌকা ভিড়ানো ছিলো। এর একটার মধ্যে চড়ে উসামা মেয়েটিকে কেল্লা রওজা নিয়ে গেলো।

সেখানেই মেয়েটির বাবাকে পাওয়া গেলো। তার বাবা তো নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিলো মেয়ে সলিল সমাধি হয়ে গেছে। সঙ্গে ছেলেটিরও একই দশা হয়েছে তার মেয়ের জন্য।

মেয়েকে দেখে পাগলের মতো মেয়ের কাছে উড়ে এলো বাপ। বুকে জড়িয়ে নিলো উসামাকেও। আর আনন্দে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো।

খ্রিস্টান ব্যবসায়ির যে কাজে উসামা ওখানে গিয়েছিলো সে কাজ শেষ করে সেই মেয়ে ও তার বাপের সঙ্গে ব্যবিলনে ফিরে এলো।

প্রথমবার যখন উসামা ওদের ঘরে গেলো লোকেরা তো পারলে তাকে মাথায় নিয়ে নাচে। মেয়েটি তো ওর জন্য মরে যাচ্ছিলো। সে তো ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে। তার নতুন জীবনদাতা বলতে গেলে এই ছেলেটি।
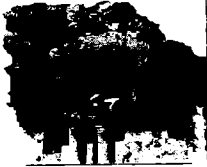
উসামা সদ্য যুবক। জীবনে এমন কোন মেয়ের সংস্পর্শে আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই মেয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণবোধ করলো। এ থেকে প্রেম ভালোবাসাও হয়ে গেলো।

সব মানুষই এই পরিস্থিতিতে পড়ে এক অদৃশ্য নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। উসামাকেও তাই করতে হলো। এখান থেকেই ওদের মধ্যে নিয়মিত দেখা সাক্ষাতও শুরু হলো।

উসামাকে সেই ব্যবসায়ী ছোট একটি বাড়ি দিয়েছিলো থাকার জন্য। মেয়েটি তার ওখানে চলে যেতো। একদিন উসামা কথায় কথায় এমন আবেগী হয়ে উঠলো যে, মেয়েটিকে বললো, সে তাকে আরবে নিয়ে যাবে।

সে জিজ্ঞেস করলো, তাকে কেন আরব নিয়ে যাবে। উসামা না একজন খ্রিস্টান।

উসামা একটু থতমত খেয়ে গেলো। তার মুখ দিয়ে এমন কথা বের হওয়া উচিত হয়নি। ওর মুখোশ তো খুলে গেছে। সে প্রসঙ্গ পাল্টে এটা ওটা বলে তার ওপর আবার পর্দা টেনে নিলো ঠিক, কিন্তু মেয়েটির সন্দেহ নয়, বরং বিশ্বাস জন্মে গেলো উসামার পরিচয় অন্য কিছু। উসামা তার পরিচয় গোপন রাখতে ব্যর্থই হলো।

মেয়েটির আগুন ঝরা রূপ, তার বয়স এবং সে এমন কিছু কথা বললো যে, সবকিছুতে চরমভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে উসামাকে তার পরিচয় প্রকাশ করতে হলো। দু'জনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো যে, উসামা কল্পনাও করেনি মেয়েটি তাকে ধোকা দিতে পারে।

সেই মেয়ে তো কসম খেয়ে বললো, এই গোপন বিষয়টি তার বুকের মধ্যে দাফন করে রাখবে। উসামা মন খুলে কথা বলার পর মেয়েটিও ওয়াদা করলো, সে মুসলমান হয়ে যাবে এবং তার সঙ্গে আরবে চলে যাবে।

ওতো উসামার প্রতি দারুন কৃতজ্ঞ ছিলো। সে ঘটনার পর তার মনে এমন ভয় বাসা বাঁধলো যে, পানি দেখলেই সে কেঁপে উঠতো। উসামাকে সে তার জীবনের মুহাফিজ মনে করতো।

মেয়েটির ওপর উসামার আস্থা থাকলেও এই একটা ভাবনা তাকে প্রায়ই দুশ্চিন্তায় রাখতো যে, সে নিজের পেশাদারিত্বের প্রতি সুবিচার করেনি এবং নিজের মুখোশ খুলে দিয়েছে। মেয়েটিকে নিজের আয়ত্বে রাখতে উসামা তার মনে রোমীয়দের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করতেও কম চেষ্টা করেনি।

সে তাকে বিভিন্ন ঘটনা শোনালো এবং তুলে ধরলো হেরাকল ও কীরাস কিভাবে কিবতী খ্রিস্টানদেরকে নির্বিচারে হত্যা করেছে। এও বলল, রোমীয়দের রাজত্ব যদি এখানে থাকে তাহলে একজন কিবতীকেও তারা জীবিত রাখবে না। মুসলমানদের বিজয় হলে সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্মীয় জীবন স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।

কিবতী খ্রিস্টানদের ওপর রোমীয়দের অমানবিক নির্যাতনের কথা মেয়েটিও জানতো। কিন্তু সে ছিলো কাঁচা মেয়ে। কোন ঘটনার শেষ পরিনাম পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা করার মতো বয়স বা মেধা এ মেয়ের তখনো হয়নি।

ওদিকে জেনারেল থিয়োডরও তার সরলতা নিয়ে খেলতে খেলতে বলে দিলো সে তাকে মিসরের সম্রাজ্ঞী বানিয়ে দেবে। একথা তার মধ্যে এমন এক অন্ধকার মোহগ্রস্ত তা জাগিয়ে তুললো যে, সে উসামার প্রেম ভালোবাসা, তার জীবন বাঁচানোর কথা, তার ওয়াদা সব ভুলে গেলো।

উসামা তার ঘরে একলা গভীর ঘুমে অচেতন। সে জানে না এরাতটিই তার জীবনের শেষ রাত হতে পারে। সে আবেগে অন্ধ হয়ে যে ভুল করেছিলো তার শাস্তি থিয়োডর শুনিয়ে দিয়েছে।...মৃত্যুদণ্ড।

এ শাস্তি তো আসলে ভোগ করতে হবে উসামার মায়ের। তিনি তার স্বামী হারিয়েছেন। বড় ছেলেকে হারিয়েছেন। সকাল হলেই থিয়োডরের জল্লাদের হাতে তার ছোট ছেলেকেও হত্যা করা হবে।

উসামার মা তখন অবরোধ করা মুসলিম শিবিরের নারী মহলে অন্যান্য নারীদের সঙ্গে নফল নামায পড়ছিলেন এবং মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য দুআ করছিলেন। দুআ করছিলেন ছেলের নিরাপত্তার জন্যও। তিনি তো জানেন না, তার ছেলে ব্যবিলন শহরে মরণ ফাঁদে পা দিয়ে আঘোরে ঘুমুচ্ছে।

যে রাতে মেয়েটির কাছে উসামার মৃত্যুদন্ডের কথা বলছিলো থিয়োডর সে রাতেই সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা) এর নেতৃত্বে দুই ইউনিট মুসলিম সেনা ভয়ঙ্কর মৃত্যুফাঁদ হিসাবে গড়ে তোলা সেই পরিখাটি পার হওয়ার চেষ্টা করছিলো।

কেল্লার প্রাচীর দুর্বল হলে এবং তাতে ইটের আধিক্য থাকলে লোহার আংটাযুক্ত রশি ছুড়ে দিয়ে প্রাচীরের সঙ্গে গেঁথে তাতে চড়ার চেষ্টা করা হয়।

ব্যবিলনের প্রাচীর অতি মজবুত এবং পাথরের আধিক্যই এখানে বেশি। তাই এতে চড়তে হলে সিড়িই একমাত্র অবলম্বন। এজন্য মুজাহিদরা দুটি করে সিড়ি জোড়া বেঁধে প্রস্তুত করে রাখে। কারণ, প্রাচীর যেমন প্রশস্ত তেমনি উঁচু।

রোমীয়রা এক শ ভাগ নিশ্চিতবোধ করছে তারা এখন নিরাপদ। একে তো স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত পরিখা, তারপর আবার তাতে ভীষণ ধারযুক্ত কাটাতার ও চোখা লোহার ফলা দিয়ে ভরে এমন দুর্ভেদ্য করে তোলা হয়েছে যে, তা অতিক্রম করা কোন মুসলমানের পক্ষ্যেই সম্ভব নয়।

এ ব্যবস্থা রোমীয় জেনারেল ও তাদের সেনাদলকে এতই আশঙ্কামুক্ত করে দিয়েছে যে, রাতের বেলা রোমীয়রা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে শুরু করে এবং প্রাচীরের ওপরও সেনা টহল বেশ কমিয়ে দেয়। এজন্য টহল সেনারা রুটিন ডিউটি মাফিক দু'চারবার প্রাচীরে চক্কর মেরে বিশ্রামে চলে যায়।

থিয়োডর তো একেবারেই নিশ্চত যে মিসরের ভেতর থেকেই সেনা সাহায্য আসছে এবং মুসলিম সেনাদের ওপর পেছন থেকে হামলে পড়বে তারা। উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তাদেরকে সে শুধু বলেইনি, বরং নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, ব্যবিলনের বাইরে পরিখা থেকে কিছু দূরের জমি মুসলিম সৈন্যদের কবরস্থান হয়ে যাবে।

মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে। সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সবার আগে পরিখায় নিক্ষেপ করা বড় বড় গাছের ডালের ওপর আস্তে করে পা রাখলেন এবং দাঁড়িয়ে থাকা ডালগুলো সাবধানী হাতে ধরে ধরে পরিখার ওপর দিয়ে এগিয়ে চললেন।

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যরা শ্বাস রোধ করে এ দৃশ্য দেখছে, এই বুঝি তাদের সালার উল্টে পড়ে গেলেন।

কিন্তু না তিনি নিরাপদেই পরিখা পার হয়ে আবার ফিরে এলেন। পরিখা থেকে একটু দূরে গিয়ে সৈন্যদেরকে কাছে ডাকলেন।

'আমার বন্ধুরা!' যোবায়ের (রা.) তাদেরকে বললেন, আমাকে পরিখা পার হতে দেখে এবং ফিরে আসতে দেখে মনে করো না এ কোন সহজ কাজ। তোমরা তো দেখতে পাচ্ছো, গাছের ডালগুলো কাটাতার ও লোহার ফলার ওপর রাখা হয়েছে। যখন এর ওপর দেহের পূর্ণ ভার নিয়ে পা রাখা হয় তখন ডালগুলো ডানে বামে হেলে যেতে চায় এবং কিছুটা নিচুও হয়ে যায়।'...

'তখন দাঁড়িয়ে থাকা ডালগুলোর সাহায্য নিতে হয়। মনে রেখো, কোন দুর্বল গাছের শাখায় যদি হাত পড়ে তাহলে সেটা ভেঙ্গে যেতে পারে এবং নিচের ডালগুলো হেলে উঠায় দেহের ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যেতে পারে।'

'এর ফলে স্বাভাবিকভাবে পরিখায় উচিয়ে থাকা লোহার ফলা ও ঘন কাটাতারের ওপর পড়তে হবে। যেগুলো তার দেহ ফালা ফালা করে দিবে।'...

এরপর তো পরিখা থেকে তার লাশও উদ্ধার করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা এই ডালগুলো ব্যবহার করে পরিখা পাড়ি দিতে চেষ্টাই করবো না।'...

বিজয় ও সাফল্য সেই লাভ করে যে উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবনের ঝুঁকি নিতে পারে। ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহ তাআলার সেই প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করো, 'তোমরা আমার পথে সাহায্য করো, আমিও তোমাদেরকে সাহায্য করবো।...'

'যেসব সৈন্যরা সিড়িগুলো ওপারে নিয়ে যাবে তাদের আরো অনেক সতর্ক পায়ে নিক্ষেপিত ডালগুলোর ওপর দিয়ে চলতে হবে। আল্লাহর অপার সাহায্যে আমরা যখন পরিখার ওপারে যেতে পারবো তখন কিন্তু আরেকটি বিপদের সম্মুখীন হতে পারি। হতে পারে সামনের ময়দান আমাদের জন্য নিষ্কণ্টক হবে।'...

'আমাদের মনে রাখতে হবে, নিষ্কণ্টক না হয়ে ভয়াবহ বিপদও আমাদের জন্য ওৎ পেতে থাকতে পারে। বিপদটা ঐ ঘনবৃক্ষ্যগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে যার সারি

কেল্লা পর্যন্ত বিস্তৃত। হতে পারে ঘন বৃক্ষের ঝোপে কিছু রোমীয় সৈন্য লুকিয়ে আছে। এমন অন্ধকার রাতে তাদের উপস্থিতি টের পাওয়া কঠিনই হবে।'...

'কোন গাছে যদি কোন রোমীয় থাকে তাহলে এর নিচ দিয়ে যে যাবে তাকে তীর মেরে নিঃশব্দে খতম করে দিতে পারবে। তবে কোন গাছ থেকে এমন একটি তীরও যদি আসে আমরা জবাবী হামলা করে ওদেরকে খতম করে দেবো। তবে এজন্য চোখ কান খোলা রেখে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে।'

এই দিক নির্দেশনা দেয়ার পর যোবায়ের (রা.) বেশ কয়েকজন সৈন্যকে পৃথক করে বললেন, চারজন বা পাঁচজন করে একটি সিঁড়ি নিয়ে ধীরে ধীরে পরিখা পার হবে।

'খবরদার! সজোরে পা ফেলবে না।' যোবায়ের (রা.) সতর্ক করে দিলেন তাদেরকে।

'আপনার প্রতিটি নির্দেশনা আমরা মেনে চলবো মাননীয় সালার।' তারা সবাই লঘু কণ্ঠে বললো।

তারপর ছোট ছোট তিনটি দল তিনটি সিড়ি নিয়ে পরিখার দিকে এগিয়ে গেলো। সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) ওদের আগে আগে পরিখা পার হতে লাগলনে। ওরাও খুব সন্তর্পণে নিক্ষেপিত ডালগুলোর ওপর পা ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওপার পৌঁছে দিলেন।

পরিখার ওপারে গিয়ে যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) দুজন সৈন্যকে সামনের অবস্থা দেখার জন্য পাঠালেন। যদি কোন রোমীয় সৈন্য কোথাও লুকিয়ে থাকে তাহলে ওদেরকে দেখে হয় পাকড়াও করতে চেষ্টা করবে না হয় ওপর থেকে তীর চালাবে। এই বিপদকে চিহ্নিত করার জন্য এই দুই মুজাহিদ নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে গেলো।

রাতের অন্ধকারে দুজন অদৃশ্য হয়ে গেলো। বেশ কিছু সময় দুজন গাছের নিচে ঝোপের ভেতরে এবং বিভিন্ন আড়াল আবডাল খুঁজে খুঁজে ফিরে এলো অক্ষত অবস্থায়। নিশ্চিত হওয়া গেলো রাস্তা পরিষ্কার।

প্রাচীরের ওপরে কোন রোমীয় তীরন্দায থাকলেও এখন এই বিশাল গাছপালা ও ফলের বাগান মুজাহিদদের জন্য নিরাপদ আড়াল হয়ে গেলো। এই গাছগুলোর আড়াল ধরে এগুলো একেবারে প্রাচীরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেও কোন রোমীয় টের পাবে না প্রাচীরের নিচে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

মই আকারের সিড়িগুলো পরিখার পাশে রেখে ওপারের বাছাই করা সৈন্যদেরকে যোবায়ের (রা.) হাত নেড়ে ইশারা করলেন, এখন ওরা পরিখা পেরিয়ে আসতে পারে। ইশারা পেয়েই পুরো ইউনিট সৈন্য একেরপর এক পরিখা পেরিয়ে এলো। কোন ধরনের বিপদ ঘটলো না।

কয়েকজন জানবায সৈন্যকে যোবায়ের (রা.) বেছে নিলেন। ওরা সিড়িগুলো কেল্লার প্রাচীর পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ইউনিটের অন্য সৈন্যরা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। সংকেত

পেলেই তারা এগিয়ে যাবে। দিক নির্দেশনাগুলো আবার পুনরাবৃত্তি করলেন যোবায়ের (রা.)।

'আরেকবার শুনে নাও; যোবায়ের (রা.) বললেন, 'যখন আমরা প্রাচীরের ওপর অক্ষত অবস্থায় পৌঁছতে পারবো তখন একবার নারায়ে তাকবীর উচ্চারিত হবে। এটা শুনে যারা আমার সঙ্গে যাচ্ছে তারা ওপরে চলে যাবে।... তারপর সবাই মিলে আল্লাহু আকবার নারা উচ্চকিত করবো, তখন পুরো ইউনিট দৌড়ে সিড়িতে চড়বে এবং প্রাচীরের ওপর চলে যাবে।'

পরিখা পার হওয়ার আগে যোবায়ের (রা.) আমার ইবনে আস (রা.) কেও এই তাকবীর ধ্বনির কথা বলে এসেছেন।

'তৃতীয়বার তাকবীরধ্বনী উঠলে বাকি সৈন্য পরিখা পার হয়ে যাবে। এরা সঙ্গে মই নিয় আসবে। যাতে প্রাচীরে চড়তে অধিক সময় না লাগে।

তারপর সিদ্ধান্ত হলো, প্রাচীর থেকে যদি কেল্লার ভেতর সৈন্যরা নামতে পারে তাহলে কেল্লার দুতিনটি ফটক খোলার চেষ্টা করা হবে। বাকী সৈন্য খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকবে।

এই তাকবীর ধ্বনিও এক বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে খোদ মুসলিম সেনাদের জন্য।

প্রথমবারের শ্লোগান শুনেই ঘুমন্ত রোমীয় সৈন্যরা জেগে উঠে প্রাচীরের দিকে ধেয়ে আসতে পারে। তখন সে কয়জন জানবাজ মুজাহিদকে ওপরে পাওয়া যাবে তাদেরকে কয়েকগুণ রোমীয়রা নিমিষেই মেরে কেটে নিচে ফেলে দিতে পারবে।

কিন্তু ঝুঁকি নেয়া ছাড়া কোন উপায়ও ছিলো না।

তিনটি সিড়ি পাশাপাশি প্রাচীরের সঙ্গে লেগে গেলো। এগুলোর উচ্চতা প্রাচীরের উচ্চতার চেয়ে কম নয়। নিঃশব্দতা বজায় রাখা জরুরি। কিন্তু ভারী সিড়িগুলো পাথরের প্রাচীরের গায়ে ঠোকাঠুকি লাগায় নিঃশব্দতা ভেঙ্গে শব্দ উচ্চতর হলো। কিন্তু ওপরে কোন নড়াচড়া দেখা গেলো না।

সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি তার সে কথাগুলো পুনারাবৃত্তি করলেন, যা তিনি প্রায়ই বলতেন,

'হে আল্লাহ আমার এই আত্মত্যাগকে মুজাহিদীনে ইসলামের বিজয়ের কারণ বানাও।'

সাহায্য প্রার্থনার পর তিনি সিঁড়িতে পা রাখলেন এবং যাদেরকে তার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা তাদেরকে হাতে ইশারা করলেন সিঁড়িতে চড়তে।

সবার আগে যোবায়ের (রা.) প্রাচীরের ওপরে পৌঁছে এদিক ওদিক তাকালেন। কোন নড়াচড়া চোখে পড়লো না। একটু পর তার সঙ্গের সৈন্যরা প্রাচীরে উঠে এলো। তারা সালারের ডানে বামে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

তারা আল্লাহু আকবার শ্লোগান তুললো অপেক্ষাকৃত নিচু শব্দে।

এখন তো এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। প্রথম দেখতে হবে শ্লোগানের শব্দে রোমীয়রা জেগে উঠে কিনা।

রোমীয়রা তো এত অসচেতন নয় যে, এত উঁচু শব্দের শ্লোগান এই নিঃশব্দ রাতে শুনেও তাদের ঘুম ভাঙবে না। টহল সৈন্যরা প্রাচীর সংলগ্ন বুরুজে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলো।

ওরা পালা করে জেগে সামান্য চক্কর দিয়ে ফিরে যেতো। এর চেয়ে কম শব্দ হলেও ওদের ঘুম ভেঙে যেতো। তাকবীর ধ্বনির শব্দে ঘুম ভাঙ্গতেই ওরা বর্শা ও তলোয়ার নিয়ে দৌড়ে এলো। প্রাচীর তো বেশ চওড়া। দিক বদল করে লড়াইয়ের যথেষ্ট জায়গা আছে প্রাচীরে।

রোমীয়রা কাছে আসতেই জানবায মুজাহিদরা ওদেরকে চ্যালেঞ্জ করলো। রোমীয়রা তো এটা দেখেই ভয় পেয়ে গেলো, এমন ভয়ঙ্কর পরিখা পার হয়ে এত আকাশ সামান উচু প্রাচীরে কি করে চড়লো এরা?

দ্বিতীয়ত ওদের ধারণা হলো প্রাচীরে চড়া মুসলমানদের সংখ্যা নিশ্চয় অনেক বেশি। ওদের তো জানা নেই, মুসলিম সৈন্য এখানে এ কয়জনই আছে। আর তাদের আসল শক্তি এটাই যে, প্রাণ বাজি রেখে তারা শাহাদাত বরণ করতে এসেছে।

তারপরও রোমীয়রা প্রাণবাজি রেখে লড়তে লাগলো। কারণ, ওরা প্রাচীরের প্রহরায় ছিলো। প্রাচীরে যাতে কেউ চড়তে না পারে সেদিকে নজর রাখার দায়িত্ব ছিলো তাদের। ওরা লড়াই না করে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেলেও রেহাই পাবে না। নিজেদের অবহেলার অপরাধে ওদেরকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। ওরা লড়াই করে মরাই শ্রেয়তর মনে করলো।

বেশ রক্তক্ষয়ী লড়াই হলো। মুসলিম সেনারা কোন সুযোগ না দিয়ে চরম আক্রোশে লড়ে যেতে লাগলো। প্রাচীরের ওপর লড়তে আসা সব কটা রোমীকে মেরে কেটে খতম করে দিলো এই আত্মত্যাগী মুসলিম মুক্তিযোদ্ধারা।

যোবায়ের (রা.) এর ইউনিটের বাকি সৈন্যরা তাকবীরধ্বনি শুনে সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীরে চড়তে লাগলো। দেখতে দেখতে সবাই প্রাচীরে উঠে এলো।
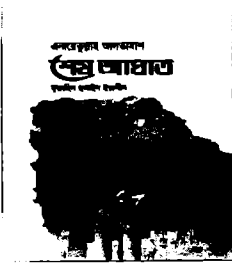
ওদিকে সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.)ও হুকুম দিলেন, সবগুলো সিড়ি পরিখার পারে নিয়ে যাও। আর তিন চার ইউনিট সৈন্য সেগুলো নিয়ে পরিখা পার হয়ে যাবে।

আমর ইবনে আস (রা.) তাকবীর ধ্বনি শোনার অপেক্ষায় অধীর ছিলেন। তিনি আর তৃতীয় তাকবীর ধ্বনির অপেক্ষা করলেন না। আক্রমণ জোরদার করতে তাৎক্ষনিক পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন।

একটু পর প্রাচীরের সঙ্গে আরো কয়েকটি জোড়া সিড়ি লেগে গেলো। এ অবস্থায় নীরবতা বজায় রাখা সম্ভবপর নয় এবং এর প্রয়োজনও নেই। মুজাহিদরা বড় তীব্র বেগে সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। আর তখনই সালার যোবায়ের (রা.) তৃতীয় তাকবীরধ্বনি উচ্চকিত করার হুকুম দিলেন।

মেঘের গর্জনের মতো এই তাকবীর ধ্বনি কবরের মৃতকেও জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট ছিলো। নিচে শহরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা রোমীয় সৈন্যরা যেন কঠিন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো।

জেনারেল থিয়োডর সেই নিঃস্পাপ সরল মেয়েটিকে পাশে নিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে। অবশ্য রাতে মেয়েটি থিয়োডরের কাছ থেকে নানা কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।

'থিয়োডরের তো জানার কথা নয়, বাইরে কি কিয়ামতের বিভিষীকা নেমে এসেছে। তার দরজায় বেশ কয়েকবার সজোরে টোকা পড়ার পর তার চোখ খুললো। শুয়ে থেকেই চিৎকার করে ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলো,

'কে রে দরজা ভেঙ্গে ফেলছে? কোন বদমায়েশ! কাকে যমদূত ধরেছে?'

'আরবী সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর উঠে পড়েছে। ওখানে লড়াই চলছে, বাইরে থেকে আওয়াজ এলো।

'এরা কী পাগল হয়ে গেলো? কি আজগুবি কথা বলছে? বিড় বিড় করে বললো থিয়োডর।

মেয়েটিও জেগে উঠেছে।

থিয়োডর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বিড় বিড় করতে করতে বাইরে বের হলো। বাইরে তার মুহাফিজ ইউনিটের কমাণ্ডার দাঁড়িয়ে ছিলো।

তার কোন ক্রমেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না, সে জাগ্রত অবস্থায় এ খবর শুনছে। সে তো নিশ্চিত ছিলো প্রাচীর তো দূরের কথা, কোন মানুষ পরিখা পাড়ি দেয়ার কল্পনা করতে পারবে না।

কমাণ্ডার তাকে প্রাচীরের ওপরের পুরো অবস্থার বিবরণ শোনালো।

তার কানে কিছু অন্যরকম শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। তার মহল থেকে সে বাইরে বের হতেই কেয়ামতের মহা হুলুস্থলের শব্দ তার কানে এলো।

ইতিমধ্যে তার পরিবারের লোকরা জেগে উঠেছে। থিয়োডর দৌড়ে নিজের কামরায় গিয়ে যুদ্ধের ইউনিফর্ম পড়লো। তারপর লোহার বর্ম পরলো। মাথায় দিলো শিরস্ত্রান।

হাতে তলোয়ার নিয়ে মেয়েটির দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো।
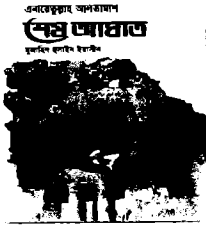
অন্যান্য জেনারেলরাও ইতিমধ্যে জেগে উঠেছে। অফিসাররা প্রথম হৈচৈ শুনেই জেগে উঠে নিজ নিজ সেনা ইউনিটের দিকে দৌড়ে গেছে।

কিন্তু প্রাচীরের ওপর তো তখন মুসলিম সেনাদলের একচ্ছত্র প্রাধান্য। বলতে গেলে প্রাচীর যোবায়ের (রা.) এর সেনাদের কব্জায়।

কেল্লার ভেতর থেকে প্রাচীরে চড়ার বেশ কয়েকটি সিড়ি রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এগুলো পাকা ইটের। মুসলিম সৈন্যরা সিড়িগুলোর ডামে বামে ঘাপটি মেরে বসে গেলো। যেই রোমীয়রা সিড়িতে পা দিতো মুজাহিদরা তাদেরকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতো।

বিভিন্ন বরুজে যে রোমীয় সেনারা শুয়েছিলো, তাদের অনেকে তো লড়াইয়েরও সুযোগ পেলো না। পুরোপুরি জেগে উঠার আগেই মুজাহিদদের তলোয়ার ও বর্শার খোরাক হয়ে গেলো। কয়েকজন মাত্র কোন রকমে পালিয়ে নিচে যেতে পারলো।

যারা নিচে যেতে পারলো তারা এতই আতঙ্কিত ছিলো যে, শহরময় দৌড়াতে দৌড়াতে এখবর শোনাতে লাগলো যে, মুসলমানদের পুরো সেনাদল প্রাচীরের ওপর উঠে এসেছে। নিচে এসে কাউকে জীবিত রাখবে না।

এভাবে পুরো শহরে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে দিলো।

ভেতর থেকে প্রাচীরের ওপরে যাওয়ার সিড়িগুলো ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়লো। এগুলো মৃত রোমীয় সৈন্যদের লাশে স্তুপিকৃত হয়ে উঠলো। সিড়িগুলো দিয়ে ওপরে যাওয়ার এবং ওপর থেকে নিচে নামার আর কোন উপায় রইলো না।

নিচে প্রাচীরের কাছে অনেকগুলো মশাল জ্বলে উঠলো। মশালের আলোয় সৈন্য ও শহরের লোকেরা যখন দেখলো সিড়িগুলো দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে নিচে নামছে তখন তো তাদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়লো। তারা চরমভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

অমুসলিম ঐহিতাসিকরাও মুসলিম সেনাদের অকৃপণ-ভাষায় প্রশংসা করে লিখেছেন,

'তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। অলৌকিকত্বকেও এটা হার মানায়'।

এতো ছিলো সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর দুআর ফল এবং তার অসাধারণ নেতৃত্বের নৈপূন্যের কুদরতী পরিণতি। সন্দেহ নেই তার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুর করেছিলেন।

নারী মহলের নারীরা যে নফল নামায পড়ে কাঁদতে কাঁদতে দুআ করেছিলো সেটাও তো ভুলবার নয়।

সেসব নারীদের একজন তো উসামা বিন আজহারীর মা-ও। যিনি জানবায মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য আকুল হয়ে কেঁদে প্রার্থনা করেছেন। ছেলের কথা মনে হতেই একবার শুধু বলেছেন, হে আল্লাহ আমার তো একটি মাত্র ছেলে রয়েছে, তাকেও তোমার নামে কুরবানীর জন্য সমর্পণ করে দিয়েছি। এখন তো আমি একেবারে একা হয়ে গেলাম।

এমন দুআ কি বিফলে যেতে পারে?

উসামাও জেগে উঠলো এবং বাইরে বের হয়ে এলো। সে লোকদের মুখে শুনলো, মুসলমানরা প্রাচীরে চড়ে প্রাচীর দখল করে নিয়েছে। এখন আর কোন রোমীয় সৈন্য ওপরে যেতে পারছে না। নিচে মশাল জ্বলে উঠার পর ওপরে মুজহিদরাও মশাল জ্বালালো। মুজাহিদদেরকে দেখে লোকদের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেলো।

উসামা তো জানতোই না এই রাতেই থিয়োডর তার ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়সালা করে ফেলেছিলো, কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা মাটির ওপরের অধিবাসীদের সব ফয়সালাকে নস্যাৎ করে দেয়।

যে থিয়োডর উসামার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলো সে এখন শহরের ভেতর উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। নিজের সেনাদলের ওপর তার আর কমাণ্ড কার্যকর হচ্ছে না। তার অধীনস্ত জেনারেল ও অফিসারদেরকে সে খুঁজে খুঁজে ফিরছে আর নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু তার সৈন্যরা উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে তার গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো।

কেউ দেখলোও না, এ সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ডার এবং মিসরের গভর্নরের মতো ক্ষমতাবান লোকটি কেমন অসহায় অবস্থায় ছুটাছুটি করছে।

উসামা প্রাচীরের ওপর গিয়ে নিজের লশকরের সঙ্গে যোগ দিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু যে সিড়ি দিয়েই ওপরে উঠতে গেলো লাশে লাশে সে সিড়ির মুখ বন্ধ দেখতে পেলো।

অবশেষে অপেক্ষাকৃত চওড়া একটা সিড়ি দিয়ে লাশের গা মাড়িয়েই প্রায় পড়িমরি করে প্রাচীরের ওপর উঠে এলো।

কয়েকজন মুসলিম সেনা তলোয়ার উচিয়ে তার দিকে ধেয়ে এলো। সে দু হাত ওপরে উঠিয়ে আত্মসমর্পনের ভঙ্গি করে উঁচু আওয়াজে তার নামটি উচ্চারণ করলো,

'আমি উসামা বিন আজহারী।'

সঙ্গে সঙ্গে মুজাহিদরা তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। উসামা সিপাহসালারকে খুঁজতে লাগলো। এখন তো তার এই কেল্লাবেষ্টিত শহরের গাইড হতে হবে।

আগেই সে জেনে নিয়েছে, অস্ত্রভাণ্ডার কোথায়, ধনভাণ্ডার কোথায় এবং এধরনের আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা সে আগেই চিহ্নিত করে রেখেছে।

প্রাচীরের চার দিক থেকে মুসলিম সেনাদের বিজয়ী ধ্বনি ও তাকবীর-মুখর শ্লোগানের আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে লাগলো।

সব ঐতিহাসিকরাই লিখেছেন, রোমীয়দের সংকল্প ও মনোবল খুব দ্রুত তলানিতে গিয়ে পৌছলো। অফিসার থেকে নিয়ে জেনারেলরা পর্যন্ত সৈন্য ও শহরের লোকদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছিলো, এখন মুসলমান কেন দুনিয়ার কোন শক্তিই পরিখা অতিক্রম করতে পারবে না।

এজন্য তাদের বিস্ময়ের শেষ ছিলো না। মুসলমানরা ব্যবিলনের এই পরিখা কি করে পার হয়ে এলো!

রোমীয়দের মধ্যে এসব আলোচনায় শোনা যেতো, মুসলমানদের সঙ্গে অশরীরি জিনের শক্তি রয়েছে। এখন ব্যবিলনের লোকেরা একথা বিশ্বাস করতে এবং অনেকে তো নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলো, মুসলমানদেরকে জিনরাই এই পরিখা পার করিয়ে প্রাচীরে পৌছে দিয়ে গেছে। কে তাদের বিরুদ্ধে লাগতে পারবে?

কিছু রোমীয় সৈন্য কেল্লার প্রাচীর সংলগ্ন ফটকের দিকে দৌড় গেলো। তারা ওখান দিয়ে পালাতে চায়। ওরা মনে করেছে ফটক থেকে বেরিয়েই নৌকা পাওয়া যাবে। নৌকায় চড়ে মাঝ নদীর দ্বীপে চলে যাবে। কিন্তু সেই ফটক খোলা যাচ্ছিলো না।

সেখানে যে রোমীয় সৈন্যরা প্রহরায় ছিলো ওরা বলতে লাগলো, এ দরজা খুললে বাইরের মুসলমানরা এদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

এছাড়াও জেনারেলরা যখন দেখলো শহরবাসীর মতো সৈন্যরা তো দিক বিদিক ছুটছে এবং পালানোর পথ খুঁজছে তখন তারা ঘোষণা করে দিলো, যে কেউ ফটক খুলতে চেষ্টা করবে তাকে হত্যা করা হবে।

ঐতিহাসিক তাবারী এও লিখেছেন, জেনারেল থিয়োডরের হুকুমে প্রাচীরের নীচ থেকে ঘোষণা দেয়া হলো, তারা লড়াই করবে না এবং সন্ধির আলোচনায় বসতে চায়। ভয়ে সংবাদবাহক ওপরে উঠতে চাচ্ছিলো না।

তাবারী এও লিখেন, সিপাহসালার আমার ইবনে আস (রা.)ও ততক্ষণে প্রাচীরে উঠে এসেছেন। তিনি নিচ থেকে ঘোষণা শোনার পর ঘোষণা করে দিলেন, জেনারেল যেন ওপরে চলে আসে এবং যা বলার এখানে এসে বলে।

'আমরা এখানকার পুরো ধনভাণ্ডার তোমাদের হাতে তুলে দেবো।' থিয়োডর ঘোষণা করে দিলো। 'এগুলো নিয়ে প্রাচীরের সেদিক দিয়ে নীচে নেমে যাও যেদিকে প্রাচীরে চড়েছো এবং পরিখার সীমানারও বাইরে চলে যাও।...এছাড়া যদি আরো কিছু চাও আমরা তাও দিতে প্রস্তুত।'

'আমরা যা কিছু চাই তা নিজেরাই নিয়ে নেবো।' আমর (রা.) ঘোষণা করালেন, 'আমরা প্রাচীরের বাইরে নয়। ভেতরে নামবো।...দু'তিনজন জেনারেল ওপরে চলে এসো।'

এর সঙ্গেই আমার ইবনে আস (রা.) ঘোষণা করিয়ে দিলেন,

'শহরের কোন একটি প্রাণীও যেন পালিয়ে না যায়। তাদের জান মালের পুরো হেফাযত করা হবে। তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। আর আমাদের কোন সৈন্যই কারো ঘরে প্রবেশ করবে না। প্রত্যেকের ইযযত-সম্ভ্রমের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হবে।'

'আমরা অবশ্যই ওপরে আসতে চাই। কিন্তু আমরা ওপরে আসলে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হবে না বা মেরে ফেলা হবে না এর কী জামানত দেবে তোমরা?'

'গ্রেফতার বা অন্য কিছু করতে চাইলে আমরা নিচে এসেও তা করতে পারবো' আমর ইবনে আস (রা.) অন্য কাউকে দিয়ে না বলিয়ে নিজেই ঝুকে পড়ে নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের হাত থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পরে এমন কেউ কি আছে?...

'আমরা মুসলমান। আমরা তাই করি যা মুখে বলি। আমরা ধোকায় ফেলে কাউকে হত্যা করি না।...নির্ভয়ে ওপরে চলে এসো।'

থিয়োডর জেনারেল জারেজকে তার সঙ্গে নিলো। কাছের সিড়ি দিয়ে ওপরে চড়তে লাগলো। কিন্তু স্তুপিকৃত লাশ বাধা হয়ে উঠলো।

থিয়োডর তার মুহাফিজদেরকে লাশগুলো টেনে হেচড়ে নীচে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলো। মুহাফিজরা দ্রুত ওখান থেকে লাশগুলো তুলে তুলে নীচে ফেলতে লাগলো। রাস্তা পরিস্কার হয়ে গেলো।

দুই জেনারেল ওপরে ওঠে এলো।

সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে আমর (রা.) দুই জেনারেলকে একটু দূরে নিয়ে গেলো। সঙ্গে সালার যোবায়ের (রা.)ও রইলেন।

‘এখন বলো তোমরা কি চাও?’ আমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন,

‘এটা মাথায় রেখে নিজেদের শর্ত পেশ করো যে, তোমাদের সৈন্যরা এখন লড়াই তো দূরের কথা, পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় স্থলও খুঁজে পাচ্ছে না।’

‘তিন দিনের সুযোগ মাত্র।’ থিয়োডর বললো, ‘আমাদেরকে তিন দিনের সুযোগ ও সময় দেয়া হোক। এর মধ্যে আমরা কেল্লা খালি করে দেবো। এরপর এই কেল্লায় তোমাদের কর্তৃত্ব শুরু হবে।’

‘এই শর্ত আমি মেনে নিচ্ছি।’ আমর ইবনে আস (রা.) সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘তিন দিনের দিন সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি একজন সৈন্যকেও কেল্লায় পাওয়া যায়, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। কিংবা যুদ্ধবন্ধি করা হবে।’

আমর ইবনে আস (রা.) এই শর্ত মেনে নিতেই সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) আমর ইবনে আস (রা.) এর হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গেলেন।

‘খোদার কসম সিপাহসালার!’; সালার যোবায়ের (রা.) বললেন, ‘আর কিছুটা সময় ধৈর্য ধরুন। ওদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করুন। আমাকে নীচে যেতে দিন। প্রথমে আমি কেল্লা ও শাহী মহল দখল করতে চাই। তারপর আমরা আমাদের শর্ত আরোপ করে ওদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চাই। ওরা যে বলছে, তিন দিনের মধ্যে কেল্লা খালি করে দেবে, এর মধ্যে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। এখনই ওদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে যাবেন না।’...

‘ওদেরকে নীচে পাঠিয়ে দিন। আমরা আমাদের মতো কেল্লা দখল করবো। আমরা এও বলতে পারি আমাদের কাছে তোমাদের অর্ধেক বা এর চেয়ে কম সৈন্য বন্দি রেখে কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাও।’

'না, ভাই যোবায়ের'! আমর ইবনে আস (রা.) তার কাধে হাত রেখে বললেন,

'আমি তোমার পরামর্শ ভালো করেই বুঝতে পারছি। আর তুমি যা বলছো তাই হওয়া উচিত। কিন্তু আমি আমিরুল মুমিনিনের হুকুমের গোলাম। তিনি হুকুম দিয়েছেন, দুশমন তোমাদের সামনে এসে মাথা নত করলে এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নেবে।'...

'দ্বিতীয় কথা হলো, অতিরিক্ত রক্তপাত না ঘটিয়ে আমরা যদি আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারি তাহলে এখনই কেন যুদ্ধ স্থগিত করা হবে না। আমাদেরকে মুজাহিদদের প্রাণ ও তাদের শক্তি ক্ষয় থেকে বাঁচাতে হবে। কেল্লা তো আমরা নিয়েই নিয়েছি।'

তারা দুজন পরামর্শ করে ঠিক করে নিলেন, কী শর্ত তাদেরকে আরোপ করতে হবে। তারপর আবার ওদের কাছে ফিরে গেলেন সিপাহসালার ও সালার যোবায়ের (রা.)।

'কেল্লা খালি হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমরা দুজন আমাদের কাছে জিম্মি হিসাবে থাকবে'। কেল্লায় যত অস্ত্র আছে, ধনভাণ্ডার আছে, অন্যান্য ধন সম্পদ যা আছে এর কিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। এ সব কিছু হবে মুসলমানদের মালেগনিমত-যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। সৈন্যরা নিরস্ত্র অবস্থায় কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাবে।'...

দুই জেনারেল বিনা তর্কে এই শর্ত মেনে নিলো। এ থেকেই বুঝা যায়, ওরা কেমন নিরূপায় ও হীনবল হয়ে পড়েছিলো। ওরা আসলে নিজেদের জান বাঁচানোর ফিকিরে ছিলো।
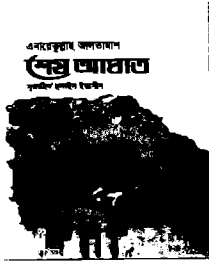
আমার ইবনে আস (রা.) ওদেরকে বললেন, ওরা যেন এখান থেকেই নিচে হুকুম পাঠায় যে,পরিখার ওপর কেল্লার সেতু বিছানো হোক। ওপর থেকে হুকুম জারি করা হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে হুকুম পালিত হলো।..

ইতিহাসে পরিষ্কার কোথাও নেই যে, ব্যবিলনের পরিখার ওপর সেতু কিভাবে বিছানো হতো এবং কিভাবে তা আবার তুলে রাখা হতো।

শুধু এতটুকু লেখা আছে, মূল ফটকের মধ্যে এমন কোন ব্যবস্থা ছিলো যার সাহায্যে সেতু ওপরেও উঠানো যেতো এবং পরিখায় স্থাপনও করা যেতো।

মুসলিম সেনাদলের অর্ধেকের চেয়েও বেশি সৈন্য এখনো পরিখার ওপারে রয়েছে। এতগুলো সৈন্য সেই ঝুকিপূর্ণ পথে আসতে বেশ কষ্ট হতো। তাই সেতু স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমর ইবনে আস (রা.) সেতু স্থাপনের নির্দেশ জারি করান।

পরিখার ওপর সেতু ফেলায় স্বল্প সময়ের মধ্যে পুরো সেনাবাহিনী পরিখা পেরিয়ে এলো। আমর ইবনে আস (রা.) প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়েই নির্দেশ দিলেন, সৈন্যরা যেন পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ওখানেই অবস্থান করে।

আমর ইবনে আস (রা.) দুই জেনারেলকে বললেন, ঘোষককে ডাকিয়ে সারা শহরে ঘোষণা দিতে বলো,

'যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। সৈন্যরা যেন অস্ত্র সমর্পণ করে এবং শহর ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে যায়'।

আর কোন সৈন্য বা শহরবাসী যেন কোন মূল্যবান জিনিস নিজেদের সঙ্গে করে নিয়ে না যায়।

ওদিকে প্রাচীরের ওপর ঘুরে ফিরে কয়েকজন মুজাহিদ ঘোষণা দিতে লাগলো, শহরের কেউ যেন পালাতে চেষ্টা না করে। তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। তাদের জান মালের হেফাজতের দায়িত্ব মুসলমানদের।

নদীর দিকে ফটকে কিছু মুজাহিদ নিয়োজিত করে দিলেন আমর ইবনে আস (রা.)। এদের কাজ হলো শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সৈন্য ও শহরবাসীর দেহ ও মালপত্র তল্লাশি করে তারপর তাদেরকে যাওয়ার ছাড়পত্র দেয়া।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, শহর থেকে সর্বশেষ রোমীয় সৈন্যটি বেরিয়ে গেলে মুজাহিদরা শহরে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রবেশ করবে এবং এই দুই জেনারেলকে ছেড়ে দেয়া হবে।

ব্যবিলন বিশাল বড় এক শহর। মিসরের প্রত্যেক বাদশাই এ শহরকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই এখানকার জনসংখ্যার পরিমান সবসময়ই ক্রমবর্ধমান থেকেছে। ব্যবিলনের এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান এখনো অটুট আছে।

যেকোন কেল্লাবেষ্টিত শহরের চেয়ে এ শহরের প্রতিরক্ষীয় ব্যবস্থা অনেক বেশি দুর্ভেদ্য। মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এ শহর।

শহরের কেল্লার অবস্থান এক প্রান্তে। এর ওপর অসংখ্য বুরুজ রয়েছে। বিশাল প্রাচীর শহরের চার দিক পরিবেষ্টন করে রেখেছে। প্রাচীরের ওপরেই বুরুজ রয়েছে।...

মুসলিম সেনারা তখনো কেল্লার প্রাচীরে। পুরো শহর তাদের দেখা হয়নি...

তারা তো শহর খালি করার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু এটা দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো না, শহর কীভাবে খালি হচ্ছে এবং লোকজন কি করছে?

সিপাহসালার তো নিশ্চিত ছিলেন, শহর থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে। শহরের শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা রোমীয়রা বেরিয়ে যাওয়ার পরই শুরু হতে পারে। কিন্তু তিনি

এটা দেখতে পেলেন না, রোমীয়রা শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় শহরের অনেকের ঘর বাড়িতে রক্তপাত ঘটিয়ে যাচ্ছে।

অসংখ্য কিবতী খ্রিস্টানকে ব্যবিলনের কয়েদখানায় রোমীয়রা বন্দি করে রেখেছিলো। কারণ, তারা হেরাকলের সরাসরি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ তো করেইনি বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছে বেপরোয়াভাবে। এ অপরাধে তাদেরকে জাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় রোমীয়রা। কয়েদখানার প্রশাসনিক সব কর্মকার্তা ছিলো রোমীয়।
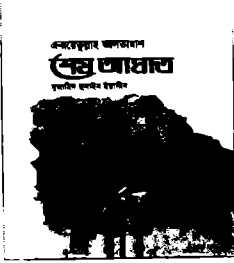
ওদেরকে যখন হুকুম দেয়া হলো শহর ছেড়ে চলে যেতে তারা এটাকে অনেক বড় অপমান ও বেদনার বিষয় মনে করলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তো কিছুই করতে পারেনি ওরা।

ওদের অক্ষম ক্রোধ গিয়ে পড়লো কিবতী কয়েদীদের ওপর। ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সব কয়েদিকে নর পিশাচের মতো হত্যা করে গেলো।

এতো কয়েদখানায় ঘটলো। শহরের কেউ তখনো এটা জানতে পারেনি। শহরের ভেতরে রোমীয় সৈন্যরা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলো মিসরীয় খ্রিস্টানদের ওপর চড়াও হয়ে।

তারা বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে যুবতী মেয়েদের ইজ্জত লুটে নিলো। যে সামান্য একটু বাধা দিলো তাকে হত্যা করলো।

অনেক কিবতী খ্রিস্টান তাদের হাতে যখমী হলো। রোমীয়রা লুট পাটও চালালো। কিন্তু ওরা তো কোন জিনিস ওদের সঙ্গে নিতে পারতো না।

যে মুজাহিদরা নদীর দিকের ফটকের প্রহরায় ছিলো তাদের মধ্যে উসামা বিন আজহারীও রয়েছে। তার সঙ্গে তিন চার জন গোয়েন্দা সঙ্গীও রয়েছে। এরা শহর ছেড়ে যাওয়া লোকদের তল্লাশি করছিলো।

একবার কিছু শহরবাসী ও কিছু সৈন্যের একটা দল র‍্যালির মতো এসে গেলো। এতগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল হয়ে গেলো। তাদেরকে পেছনে ধাক্কিয়ে সরিয়ে একজন একজন করে বের হতে বলা হলো।

তারপরও ওখানে হাঙ্গামা বাধার মতো অবস্থা হলো। এসময় উসামার কানে এমন আওয়াজ পৌছলো, যেন কোন নারী কণ্ঠ নাম ধরে ডাকছে।

উসামা এ দিক ওদিক তাকালো। আবারো সেই নারী কণ্ঠের আওয়াজ তার কানে গেলো।

এবার সে আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকিয়ে দেখলো, একটি মেয়েকে নিয়ে দুই রোমীয় সৈন্য টানা হেচড়া করছে। এই মেয়েটিই গত রাতে থিয়োডরের মহলে ছিলো এবং সেই উসামার প্রেমিকা। মেয়েটি তখনো উসামাকে ডেকে চলেছে।

লোকজন যে যার মতো শহর ছেড়ে বেরিযে যেতে ব্যস্ত, এজন্য কেউ কোন দিকে তাকাচ্ছেও না- কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে।

উসামা তার এক গোয়েন্দা সঙ্গীকে নিয়ে ভিড় ঠেলে মেয়েটির কাছে গিয়ে পৌঁছলো। ওদেরকে দেখে রোমীয় দুজন মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করলো; কিন্তু ওরা ওদেরকে ধরে ফেললো। মেয়েটি হেচকি তুলে কাঁদছিলো।

'কি হয়েছে তোমার? ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলো?' উসামা জিজ্ঞেস করলো।

'ওরা আমার বাবাকে হত্যা করেছে।' মেয়েটি কান্নার দমকে কথা বলতে পারছিলো না। থেমে থেমে বললো, 'আমাদের ঘরের টাকা পয়সাও এবং অলঙ্কার পত্রও লুটে নিয়েছে। এখন আমাকে এভাবে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

উসামা ও তার সঙ্গী দুই রোমীয় ও মেয়েটিকে পাশের একটি পুরনো বাড়িতে নিয়ে গেলো। মেয়েটিকে একটি কামরায় রেখে ওদেরকে অন্য কামরায় নিয়ে তল্লাশি চালানো হলো।

দুজনের কাপড়ের ভেতর থেকে দুটি ভারি থলে বের হলো। একটার মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার ভরা। আরেকটার মধ্যে টাকা পয়সা।

'ভাই তোমরা টাকা পয়সা ও অলঙ্কারগুলো নিয়ে নাও, আর মেয়েটিকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও। আহা, কী চমৎকার মেয়ে!' দুজনের একজন বললো।

'আর ওর বাপকে যে খুন করেছো এটা কী কোন অপরাধ নয়? একটি মেয়েকে তোমরা এতিম করে দিলে।' উসামা আক্রোশী গলায় বললো।

'এখানে তো কত মানুষই খুন হয়েছে, ওর বাপের মতো এক বুড়ো খুন হলে এমন কী কেয়ামত এসে পড়েছে।' আরেকজন বললো।

উসামা তার সঙ্গীর দিকে ইঙ্গিত করতেই সে খঞ্জর বের করে ফেললো। উসামার হাতেও খঞ্জর উঠে এলো। দুজন একই সময় দুই রোমীয়ের বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করে দিলো। পরপর দুবার করলো এমন। ওদের কাপড়েই খঞ্জরের রক্ত মুছে দুজনে বেরিয়ে এলো।

'আমি এখন কোথায় যাবো?' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে উসামাকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঘরে তো আমার কেউ নেই আর।'

'এটাও কোন জিজ্ঞেস করার কথা হলো? উসামা অলঙ্কার ও টাকা পয়সার থলেটা মেয়েটার হাতে দিতে দিতে বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে কি যাবে না? তুকি আমার সঙ্গে থাকার ওয়াদা করোনি?'

'করেছিলাম, কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে অনেক বড় বেঈমানী করেছি।' আমি আজ মরমে মরমে মরে যাচ্ছি।'

মেয়েটির কান্নার বেগ এখন আরো বেড়ে গেলো।
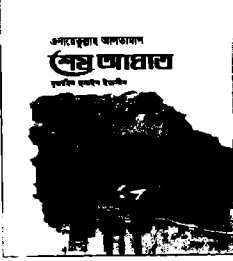
'বেঈমানী? কিভাবে?' উসামা সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে মেয়েটি গত রাতের পুরো কাহিনী তাকে শোনালো। সে কোন কথাই লুকালো না। এত বড় জেনারেল যে তাকে সম্রাজ্ঞী বানানোর অবাস্তব স্বপ্ন দেখিয়েছে একেই সে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং এটাই তার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।

'মানুষ ভুলত্রুটি করে বলেই সে সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়। এটা তোমার জীবনের নিছক একটা ভুল হিসাবেই ধরে নাও।' উসামা সান্ত্বনা দিয়ে বললো।

'এখন আমার একশ ভাগ বিশ্বাস জন্মেছে তোমাদের খোদাই সত্য খোদা।' 'মেয়েটি বললো, 'তোমাদের ধর্মও সঠিক। আর এমন না হলে তুমি এতক্ষণ বেঁচে থাকতে না। আমি তো তোমাকে ধরিয়েই দিয়েছিলাম।'...

'আমার এই নির্লজ্জ পাপ যদি ক্ষমা করতে পারো, আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করো। তারপর তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। যদি আমাকে ক্ষমা করতে না পারো, জল্লাদের হাতে তুলে দাও। এমনকি আমাকে ঘৃণা করলেও তাই করো উসামা।'

'ইসলাম মানুষকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসা দিতে শেখায়', উসামা বললো,

'কিন্তু আমি তো তোমার নিহত মা বাবাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না। এই অলঙ্কারগুলো তোমার। এটা তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। সত্য-মিথ্যা, হক বাতিলকে যদি সরল সত্য মনে বুঝে থাকো এবং আমার প্রতি অনুরাগ থেকে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে চলো।'...

'যেকোন মুসলমানের কাছে যদি সামান্য সময়ের জন্যও বসো তাহলে বলে উঠবে এতো আমার সেই পিতা যাকে রোমীয়রা হত্যা করেছে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ লুটেরা হতে পারে না। তাদের কাছে আছে কেবল সহৃদয়তা, মানবিকতা, সহমর্মিতা'।

'তোমাকে আমাদের সিপাহসালারের কাছে নিয়ে যাবো। যাতে তিনি বুঝতে পারেন, জোর করে তোমাকে নিয়ে আসেনি আমি। তুমি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে আমার সঙ্গে বিয়ের পিড়ীতে বসতে চাও।'

শেষের কথাটি বলতেই মেয়েটির সিক্ত চেহারায় লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো।

উসামা মেয়েটিকে সিপাহসালারের কাছে নিয়ে গেলো। তাকে সব কথা শোনালো।

সিপাহসালার মেয়েকে দুচারটি কথা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর সস্নেহে তাকে নারীমহলে পাঠিয়ে দিলেন। তার অলঙ্কারাদি তার কাছেই রাখতে বললেন।

দুদিনের মধ্যে রোমীয়রা কেল্লা খালি করে দিলো। সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) প্রথবার তার সালারদের নিয়ে কেল্লার নিচে নেমে এলেন। দুই রোমীয় জেনারেল থিয়োডর ও জারেজও সঙ্গে রইলো।

প্রথম থিয়োডরের বিশাল শাহী মহলে গেলেন মুসলিম নেতারা। তারপর জারেজের মহলে গেলেন। তাদের কাছে বিশালাকারের সোনারূপা ও হীরা জহরতের মজুদ পাওয়া গেলো। সেগুলো উদ্ধার করা হলো।

ব্যবিলনের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের চাবিও তাদের হাত থেকে নিয়ে নেয়া হলো। তারপর তাদেরকে বলা হলো, তারা আর বিলম্ব না করে তাদের পরিবার নিয়ে যেন শহর থেকে বেরিয়ে যায়।

শহরের ফটকগুলো খুলে দেয়া হলো। বাইরে থাকা মুসলিম সেনাদল আল্লাহু আকবার শ্লোগানে চারদিক মুখরিত করে শহরে ঢুকলো। আমর (রা.) বাইরে দাঁড়িয়ে তার সেনাদলকে স্বাগত জানাতে লাগলেন।

এসময় একদিক থেকে দুই তিনশ লোকের ভিড় আমর ইবনে আস (রা.) এর দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। এই দলে পুরুষের সঙ্গে নানান বয়সী নারীরাও রয়েছে।

মনে হচ্ছে এরা মাতম করতে করতে আসছে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে অনেকের কাপড়ে রক্তের বড় বড় ছাপ। সিপাহসালার তার এক সালারকে বললেন,

'জিজ্ঞেস করে এসো ওরা কেন এ দিকে আসছে?'

সালার দৌড়ে গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলো। তারা সালারকে জানালো, রোমীয় সেনারা শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় কিভাবে তাদেরকে রক্তাক্ত করে গিয়েছে। এখন তারা সিপাহসালারের কাছে এসেছে তাদের ফরিয়াদ নিয়ে। সালার ফিরে এসে আমর ইবনে আসকে জানালো তাদের ওপর কারা জুলম করেছে সেটা আপনাকে বলবে।'

সিপাহসালার ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'আমরা আমাদের ওপর রোমীয়দের জুলমের কাহিনী শোনাতে এসেছি।' এক বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললো, 'কিন্তু এর আগে আমরা এই ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি যে, ওরা তো আমাদের কয়েজন নারী পুরুষকে হত্যা করে এবং অনেককে আহত করে চলে গেছে'।

'এখন আপনারা আবার ঘর লুট করতে এসেছেন কিন্তু এটা তো বলুন আমাদের অপরাধটা কী? যার শাস্তি আমরা পেয়েছি এবং আরো কত শাস্তি আমাদের আপনাদের কাছ থেকে পেতে হবে'?

'আপনারা কি আমাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা শুনেননি?' আমর ইবনে আস (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বললেন,

'আমরা তো প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে একাধারে দুই দিন এই ঘোষণা দিয়েছি, শহরের কেউ যেন পালাতে চেষ্টা না করে। শহরবাসীর ইজ্জত আবরু ও জানমালের হেফাজত করবো আমরা। সবাইকে নিরাপত্তা দেবো।'

'আমরা লুট করতে আসিনি, কিছু দিতে এসেছি'।...

'যে সময় রোমীয়রা আপনাদের ঘর বাড়িতে হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে তখন আপনাদের উচিত ছিলো আমাদেরকে তা জানানো। তখন দেখতেন কিভাবে আমরা ওদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলছি।...এখন বলুন ওরা কি করে আপনাদের ওপর চড়াও হলো?'

ওরা জুলুম অত্যাচারের কাহিনী শোনাতে লাগলো। কেউ বললো, তার মেয়েকে আব্রুহীন করে দিয়েছে। কেউ বললো তার ঘরের দুজন লোককে হত্যা করা হয়েছে। কারণ, ওরা ঘরের মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাতে ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিল।

ভিড় আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। এদের মধ্যে বেশ কিছু আহত লোক দেখা গেলো। কিছু তো মারাত্মকভাবে আহত ছিলো। ওরা জানালো, সবাই তারা মিসরীয় এবং কিবতী খ্রিষ্টান।

এদের মধ্যে থেকেই একজন বললো, সে জানতে পেরেছে কয়েদখানায় যে কিবতী খ্রিষ্টানরা বন্দি ছিলো রোমীয়রা তাদের হাত কেটে দিয়েছে। কয়েকজনকে হত্যা করেছে।

আমর ইবনে আস (রা.) তখনই কয়েকজন মুজাহিদকে কয়েদখানার দিকে ছুটালেন। তাদের সঙ্গে সদ্য কয়েদখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এক হাকিমকেও পাঠালেন।

'শহর বাসীদের মধ্যে যতজন আহত হয়েছে, তাদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোক'। সিপাহলাসার এক সালারকে বললেন, 'ওদের খাবার দাবারের ব্যবস্থাও আমাদের পক্ষ থেকে করা হবে'।

এ হুকুম দিয়ে তিনি কয়েদখানার দিকে ছুটে গেলেন।

সেখানে হাতকাটা কয়েদীদের ভয়াবহ অবস্থা দেখে সিপাহসালার কেঁপে উঠলেন। অনবরত তাদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে। এর মধ্যে কিছু তো মরেই গেছে।

অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এক এক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। এক দিন আগে ওদের হাত কাটা হয়েছে। ওদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদে সিপাহসালার ও সালারদের শিড়দাড়া খাড়া হয়ে গেলো।

এদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলো তাদেরকে সিপাহসালারের হুকুমে তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবসা করা হলো। এতে বহু কয়েদীকে বাঁচানো গেলো।

সিপাহসালার কয়েদখানা থেকে ফিরে এসে তার সালারদেরকে বললেন,

'এই নিরস্ত্র অসহায় শহরবাসীর ওপর রোমীয়রা যে জুলুম করে গেছে তা খুবই দুঃখজনক। তবে তাদের এই দুঃখ বেদনা আমরা ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করবো। এটাই ইসলামের হুকুম।

ওদের মনে রোমীয়দের বিরুদ্ধে ঘৃণা ভরে উঠছে। ওদের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ঘৃণা তাদের মধ্যে জমে উঠেছে তা ওদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে অনেক দিন।'...

'আমাদের সঙ্গে মুবাল্লিগ ইসলাম প্রচারকও আছে। তাদেরকে বলো ঘরে ঘরে গিয়ে এসব লোকদের মন জয় করে নিতে। তাদের যেমন সহযোগিতা প্রয়োজন তা যেন দিয়ে যায়। তারপর তাদেরকে এটা বুঝিয়ে দেয় যে, এখন ইসলামের রহমত ও বরকত দেখে নাও।'

সিপাহসালার সেখান থেকে ব্যবিলনে অবস্থিত মিসর রাজের প্রাসাদে গেলেন। তার সঙ্গে কয়েক জন সালার ও সৈন্যও গেলো। সারা মহল তারা ঘুরে ফিরে দেখলেন।

এমন শাহী সাজ-সজ্জা ভোগ বিলাশের অত্যাশ্চার্য সব আয়োজন, দুর্লভ মূল্যের ফার্নিচার, ফানুস, ঝালর, তৈজসপত্র, সোনা-রূপার খাট পালঙ্ক, থালাবাসন ইত্যাদি দেখে আরবের এই মুজাহিদরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে রইলো।

'গভীর দৃষ্টিতে দেখো এবং শিক্ষা অর্জন করো।' সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) মুজাহিদদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

'এই শাহী জীবন, রাজকীয় আয়োজন যদি আমাদের জন্য থাকতো তাহলে আমরা পরিখা পার হওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না। আমাদের সব শক্তি, সাহস, উদ্দমতা এর মধ্যেই নিহিত থাকতো।'...

'এই শাহী জীবনই রোমীয়দেরকে পরাজয় উপহার দিয়েছে। দেখে নাও, বিশাল ধনভাণ্ডার আর রাজকীয় আয়োজন এখানে পড়ে আছে। যারা এসব উম্মাদের মতো ভোগ করতো তারা শুধু এক কাপড়ে এখান থেকে পরাজয়ের কালিমা নিয়ে বেরিয়ে গেছে।...

'যারা দুনিয়াতেই নিজেদের জান্নাত বানিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়াতেই জাহান্নামের আজাব দেখিয়ে দেন।'

'আর আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি,' আমার ইবনে আস (রা.) বললেন,

'তারা যে নিরাপরাধ কয়েদীদের এমন নৃশংসভাবে হাত কেটে দিয়েছে এবং নিরস্ত্র লোকদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে গেছে। এর বদ দুআয় ওরা এখন জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে এই দুনিয়াতেই। বিজয় তো হয় ঈমানদারদেরই। আর তারাই পারে অপার ভালোবাসা দিয়ে মানবজাতির হৃদয় জয় করতে।'
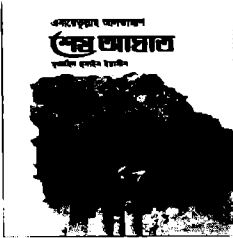
৬৪১খ্রিষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল রোমীয় সেনাদল ব্যবিলন খালি করে দেয়। সেদিনই মুসলমানরা সে শহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

একই দিনে আমর ইবনে আস (রা.) হযরত উমর (রা.) এর কাছে ব্যবিলন জয়ের সুসংবাদ জানিয়ে পয়গাম লেখান।

অবরোধ ভাঙ্গার বিস্তারিত রিপোর্ট তাতে লেখা হয়।

কী অবিশ্বাস্য কায়দায় যে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ফাঁদ পরিখা অতিক্রম করা হয় তার খুটি নাটি পয়গামে জানানো হয়।

এর পুরো কর্তৃত্ব যে সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর- তা উল্লেখ করতেও ভুল করলেন না আমর ইবনে আস (রা.)।

প্রায় বিনা রক্তপাতে এমন অবিশ্বাস্য জয় যে মুসলমানরা পাবে তা যে কেউ কল্পনাও করেনি। একথাও তিনি পয়গামে উল্লেখ করলেন।

অবশেষে তিনি লেখালেন, এখন তিনি মিসরের রাজধানী ইস্কান্দারিয়ার দিকে মার্চ করার অনুমতি চাচ্ছেন। আর খুব তাড়াতাড়ি এ অনুমতি পাওয়া দরকার। যাতে রোমীয় ফৌজ সামলে উঠার আগে তাদেরকে আবার রণাঙ্গণে নামাতে হবে।

ওরা তাজাদম হয়ে উঠলে মুসলমানাদের জন্য কঠিন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ পয়গাম লিখিয়ে আমার ইবনে আস (রা.) পত্রদূতকে বললেন,

'খুব দ্রুত তোমাকে মদিনা পৌছতে হবে এবং আরো দ্রুত এর জবাব নিয়ে আসতে হবে।'

ঐতিহাসিকরা ব্যবিলনের বিজয়কে শুধু বিস্ময়কর বলেননি তারা অকপটে স্বীকার করেছেন, ব্যবিলন বিজয় পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়কর বিজয়গুলোর একটি।

এত বিশাল ও ঐতিহ্যবাহী একটি শহর ও দুর্ভেদ্য কেল্লা বিজয়-মিসরে মুসলিম যোদ্ধাদেরকে বিজয় ধারার একটি মাইলফলকে পৌছে দিয়েছে।

ব্যবিলন বিজয়কে ঐতিহাসিকরা অর্ধেক মিসরের জয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মিসরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই ব্যবিলন এলাকা রেমেসিস যুগ অর্থাৎ ফেরাউন যুগের রাজা বাদশাহদের কাছেও অতি প্রিয় ছিলো।

এর কেল্লার প্রাচীর চূড়ায় দাঁড়ালে পিরামিডের আকাশ স্পর্শী চূড়া দেখা যায়। এক দিকে নীলের স্বচ্ছছোয়া পরিবেষ্টন ব্যবিলনকে দুনিয়ার স্বর্গীয় দৃশ্যের মনোরমা দান করেছে।

এখানেই কোথাও ফেরাউনের মানস সন্তান 'সামেরীর' হাতে গড়া সোনার গো ছানাকে মূসা (আ.) তার অলৌকিক লাঠির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জায়গায় জায়গায় ফেরাউনি যুগের বহু স্মৃতি চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে কালের স্বাক্ষ্য বহন করছে।

ব্যবিলন জয় করার কারণে নদীর মধ্যদ্বীপে অবস্থিত কেল্লা রওজাও মুসলমানদের দখলে চলে এলো। আমর ইবনে আস (রা.) হুকুম দিলেন, ব্যবিলনের নদীর দিকের ফটক দিয়ে মধ্যদ্বীপ পর্যন্ত যেন নৌকার একটি সেতু স্থাপন করা হয়।

শহরের স্থায়ী অধিবাসীরা অল্প সময়েই বুঝে ফেললো মুসলমানরা লুটপাট তো দূরের কথা তাদের ঘরের দিকেও তাকাচ্ছে না। বরং এই প্রতিকূল পরিবেশে তাদেরকে সব ধরনের সহযোগিতাই দিয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে দেখা গেলো, যখন নৌকার সেতু বানানোর কাজ শুরু হলো তখন শহরের লোকেরা দৌড়ে এলো এবং সেনাদের কাজ নিজেরাই বন্টন করে নিলো।

সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতার অভাববোধ আমর ইবনে আস (রা.) এর বরাবর লেগেই রইলো। এই হাতে গোনা সৈন্য দিয়েই শহরের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন কাজ ইত্যাদি সব কিছুই করা হতো।

ইতিমধ্যে নৌকার সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও আরো কিছু প্রশাসনিক কাজ রয়েছে যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিহিত করা জরুরী ছিলো।

সৈনিকের অতি কঠিন ও রক্তক্ষয়ী দায়িত্বপালনের পর এতসব কাজ আঞ্জাম দেয়াটা মুজাহিদদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার ছিলো।

বিশাল এই দায়িত্বের বোঝা হালকা করার জন্য এই প্রতিকার ভেবে বের করা হলো যে, রোমীয়দের শাসনকালে কিবতী নাগরিকদের মধ্যে যারা সরকারি বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত ছিলো তাদেরকে তাদের সেসব দায়িত্বে বহাল রাখা হলো।

দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার খতিয়ান দেখে কাউকে কাউকে পদোন্নিতও দেয়া হলো। কাউকে আবার দু একটা বাড়তি দায়িত্বও দেয়া হলো।

আশে পাশের এলাকায়ও কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখা জরুরি। সেটা রাখতে গিয়ে সেনা সংখ্যা আরো কমে গেলো। একারণেও কিবতীদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে রাখাটা জরুরি ছিলো। এছাড়াও সিপাহসালারের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, কিবতীদেরকে নিজেদের আস্থার মধ্যে নিয়ে তাদেরকে এভাবে মূল্যায়ন করা হলে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপচিন্তা আর করবে না।

কিন্তু কিবতী খ্রিষ্টানরা এত সহজ পাত্র নয় যে, তারা এতেই কৃতজ্ঞতা বোধের উপলব্ধিতে হলেও মুসলমানদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করবে। জাতিগতভাবেই ওদের মধ্যে অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্বেষী মনোভাব প্রবল।

কতোয়াল অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের অধিকাংশ সদস্যই ছিলো কিবতী খ্রিষ্টান। আমর ইবনে আস (রা.) পুলিশী ও শান্তি- নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের হাতেই বহাল রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সদস্যও বাড়িয়ে দেন। আর কিছু মুজাহিদকে এ বিভাগের নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব দেন।

অল্প কয়েক দিন পর সিপাহসালার রিপোর্ট পেলেন,

পুলিশ বিভাগের সংখ্যা গরিষ্ঠ কিবতীরা মুসলিম অফিসারদেরকে ভালো নজরে দেখছে না। কাউকে কাউকে একথাও বলতে শোনা গেছে, আমরা আরবের এই অশিক্ষিত লোকদের অধীনস্ত আর গোলাম হয়ে থাকতে পারবো না।

ব্যবিলনে কিবতীদের বিদ্রোহের লক্ষণ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

মানব সমাজে যখন থেকে শাসন প্রশাসনের ধারা শুরু হয় তখন থেকেই এর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে আছে বিদ্রোহ, অবাধ্যতা, হটকারিতা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত ধারা।

দ্বিগ্বিজয়ী বহু বাদশাহ বিদ্রোহীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ভীষণ শক্তিধর অনেক রাজার রাজ সিংহাসন বিদ্রোহীদের হাতের খেলনার পুতুল হয়ে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হয়েছে।

বিদ্রোহ ছোট হোক বড় হোক, একে নির্মূল করার যে পদ্ধতি ও কৌশল এ পর্যন্ত চলে এসেছে সেটা হলো, বিদ্রোহের মূল হোতাদেরকে ধরে কঠিন শাস্তি দেয়া। বিদ্রোহীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা। এতে বিদ্রোহ ও অশান্তি কিছু দিনের জন্য নির্মূল হলেও সেটা খুব বেশি দিন কখনোই স্থায়ী হয়নি।

ধিকি ধিকি ছাই চাপা অঙ্গার ভেতরে ভেতরে ঠিকই ফুলে ফেপে উঠতে থাকে। নেতাদেরকে গ্রেফতার ও তাদের অনুসারীদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিশোধের আগুন এক সময় আরো ভয়ঙ্করভাবে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে।

কোন বিদ্রোহ গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। আবার কখনো বিদ্রোহীরাও জয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

আমর ইবনে আস (রা.) যখন আভাস পেলেন কিবতীদের এই বিদ্রোহী মনোভাব সালাররা তখন ভেবে ছিলেন, সিপাহসালার এখনই হুকুম দেবেন, কিবতীদেরকে যেন এমন শাস্তি দেয়া হয় যে, তাদের মন থেকে বিদ্রোহের শব্দটুকুও মুছে যায়। কিন্তু আমর ইবনে আস (রা.) এ রিপোর্ট শুনে এ ধরনের কোন হুকুমই দিলেন না। তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থা তার বেশি সময় স্থায়ী হলো না। একটু পরেই তার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো।

অবশ্য এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয়। রোমীয়রা সেখানে পূর্ণাঙ্গ এক পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলো। ইসলামী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা তখনো পুলিশি ধারায় গড়ে উঠেনি।

এই ঘটনার কিছু দিনপর আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) এক পুলিশী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। একে বলা হতো 'আহদাস'। পুলিশ অফিসারদেরকে বলা হতো 'সাহিবুল আহদাস'।

আমর ইবনে আস (রা.) তখনই সব সালারকে ডেকে কিবতীদের মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন,

'আগামীকাল কিবতীদেরকে সেনা ছাউনিতে খাবারে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। একটা জরুরি কথা সবাই শুনে নাও। সেনাদলের প্রত্যেক মুজাহিদকে বলে দেবে, তারা যেন এমনভাবে খাবার খায় যেমন লড়াইয়ের ময়দানে খাবার খেয়ে থাকে। এ সময় তারা যেন যুদ্ধ পোশাক পরে থাকে।'

একজন সা রও বুঝতে পারলেন না, আমর ইবনে আস (রা.) এর আসল মতলবটা কী।

পরদিন সকালে অসংখ্য উট যবাই করা হলো। এর গোশত পাক করা হলো। গোশতে ঝোলের পরিমাণ একটু বেশিই রাখা হলো। পুলিশ বিভাগে কর্মরত সব কিবতীকে এই খাবারে দাওয়াত করা হলো। এই খাবারে কিবতী ও মুজাহিদদেরকে সামনাসামনি বসানো হলো।

খাওয়ার পর্ব শুরু হলো। মুজাহিদরা খুব দ্রুত খেতে লাগলো। গোশতের রসালো টুকরোগুলো ওরা এমনভাবে দাতে ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে যে ঝোলের ছিটা সামনে বসা কিবতীদের গায়ে গিয়ে পড়ছে।

মুজাহিদদের খাবারের এমন অসভ্য দৃশ্য দেখে কিবতীরা নাক কুচকে উঠলো। ওদের মনে এ ধারণা জন্মালো যে, আরবের এই মুসলমানরা জংলী এবং ভদ্রতা ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে ওরা খাবার খেতে পারে না।

মুজাহিদরা খাবারের পাত্রগুলো মুখে লাগিয়ে ঝোলগুলো সুর সুর আওয়াজ তুলে খাচ্ছে যেন ওরা আর কখনো এমন খাবার খায়নি।

যে কেউ এ দৃশ্য দেখলে বলতো, আরবের এই লোকগুলো কখনো ভালো খাবার খায়নি এবং খাবারের শিষ্টাচারও ওরা শিখেনি।

খাবারের পাঠ শেষ হওয়ার পর কিবতীরা চেহারায় ঘৃণার ভাব নিয়ে চলে গেলো।

ওরা এসে আমার ইবনে আস (রা.) এর কাছে রিপোর্ট করলো, কিবতীরা প্রকাশ্যে মুজাহিদের ব্যাপারে ঘৃণাসূচক মন্তব্য করছে। ওরা বলছে এই অশিক্ষিত আরবদের অধীনে ওরা আর কাজ করবে না।

'কাল আবার আগের মতো খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা হবে। কিবতীদেরকে দাওয়াত করা হবে। মুজাহিদেরকে বলবে, শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যেভাবে খাবার খায় সেভাবে যেন খাবার গ্রহণ করে। আর সবাই ঘরোয়া পোশাক পড়ে থাকে।'
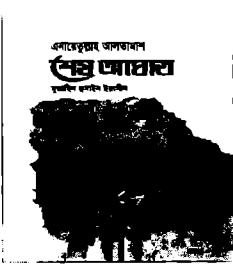
ঐতিহাসিক মিকরিজী লিখেছেন, সিপাহসালার আমার ইবনে আস (রা.) মুজাহিদদেরকে একথাও বলে দেন যে, সবাই যেন মিসরীয় পোশাক পড়ে খেতে আসে। খাবারের সময় সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মিসরীয় পোশাক পড়ে আসে।...কিন্তু মিকরিজীর একথা সঠিক মনে হচ্ছে না।

কারণ, মুজাহিদরা মিসরে প্রবেশের পর থেকে তো অনবরত লড়াইয়েই কাটিয়েছে। তারা মিসরীয় পোশাক বানানোর সুযোগ পেলো কোথায়? তা ছাড়া মুজাহিদরা বাহাড়ি পোশাকাদিও পছন্দ করতো না।

যা হোক মুজাহিদরা মোটামুটি ভালো পোশাক পরেই খাবারের দস্তারখানায় যোগ দিলো। এবারও কিবতীরা ও মুজাহিদরা পরস্পর সামনাসামনি বসলো। এবার মুজাহিদরা বেশ মার্জিত কায়দায় খুব ধীরে ধীরে খেতে লাগলো। মাঝে মধ্যে কিবতীদের সঙ্গে দু একটা কথাও বললো। হাসি ঠাট্টাও করলো।

কিবতীরা বেশ বিস্মিত হলো যে, আজ মুজাহিদদের মধ্যে এমন ভদ্রতা ও সভ্যতা কোত্থেকে এলো?

আগেরবার তো খাবার শেষে কিবতীরা মুজাহিদরদের ব্যাপারে বেশ ঘৃণাসূচক মন্তব্য করেছিলো। কিন্তু আজ কী মন্তব্য করবে সেটাই ওরা ভেবে পাচ্ছে না।

রাতে আমার ইবনে আস (রা.) হুকুম দিলেন, কাল সকালে পুরো মুসলিম সেনাদল যেন ঘোড় দৌড়ের ময়দানে একত্রিত হয়। সিপাহসালার সেনাদলের পরিদর্শিনে আসবেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা যায়, মুসলমানদের নিয়মিত কোন সেনাবাহিনী তখনো গড়ে ওঠেনি। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নির্ধারিত ভাতারও প্রচলন তখনো হয়নি।

মুজাহিদরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সেনা দলে যোগ দিতো। তীর, তলোয়ার ও বর্শা চালনা এবং ঘোড় সওয়ারীতে তো মুসলমানরা পারিবারিক ভাবেই দক্ষ হয়ে উঠতো।

কোন মুজাহিদ দলে যোগ দেয়ার পর তাদেরকে শুধু বুঝিয়ে দেয়া হতো এক সালার বা কমাণ্ডারের নেতৃত্বে কেমন শৃঙ্খলা ও লড়াইয়ের কৌশল রপ্ত করে লড়তে হয়। ডিসিপ্লিনের জন্য তাদেরকে আয়োজন করে লেকচার দিতে হতো না।

পরদিন সকালে মুজাহিদ বাহিনীর সঙ্গে কিবতী পুলিশ সদস্যরাও ঘোড় দৌড়ের ময়দানে সমবেত হলো। কিবতীরা জানতো, মুসলমানরা তাদের সেনাদলের মহড়া দিচ্ছে। কিবতীরা এটাও জেনে গেছে, মুসলমানদের এই লস্কর নিয়মিত ফৌজ নয়। এদের সবাই এক প্রকার স্বেচ্ছাসেবক।

কিবতীরা এটা দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো যে, যে বাহিনীকে তারা অশিক্ষিত এক লড়াকু দল মনে করতো তারা এখন সুশিক্ষিত ও দারুন সুশৃঙ্খল এক সেনাবাহিনীর ডিসিপ্লিন নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে আছে।

সালার বা কমাণ্ডারদের ইঙ্গিতে তারা নড়াচড়া করছে বা স্থির থাকছে। ওদের পোশাকও কিবতীদেরকে বেশ প্রভাম্বিত করছে।

আমর ইবনে আস (রা.) সেনাদলের মহড়ার আয়োজন কোন এক পরিকল্পনার অংশ হিসাবেই করেছিলেন। আর তার লশকর তার সেই প্রত্যাশাও পূরণ করে দিয়েছে।

তিনি কিবতীদের মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন মুসলিম বাহিনী সেটা পূর্ণ করে দিয়েছে। অথচ কোন মুজাহিদকে কেউ বলে দেয়নি তাদেরকে এটা করতে হবে এবং ওটা করতে হবে না।
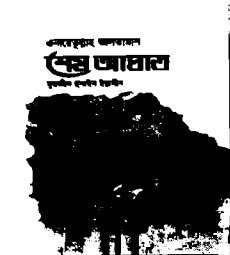
আমর ইবনে আস (রা.) কিছুক্ষণ ঘোড়ায় থেকে পুরো দল পরিদর্শন করে ঘোড়া নিয়ে দাঁড় করালেন কিবতীদের ভিড়ের সামনে।

'কিবতী ভাইয়েরা! আমর ইবনে আস (রা.) কিবতীদের উদ্দেশ্য করে উঁচু আওয়াজে বললেন,

'আমি জানতে পেরেছি তোমরা নিজেদেরকে অনেক বড় সভ্য ও আমার সেনাদলকে জঙ্গী ও অসভ্য মনে করো। তোমরা মুজাহিদদের ব্যাপারে যে সমালোচনা করেছো এবং যে সব কুটুক্তি করেছো তার সবই আমি শুনেছি। কিন্তু যারা অন্যকে অসভ্য ও অভদ্র বলে তাদের চেয়ে বড় অসভ্য আর মুর্খ আর কে হতে পারে?'

'এরাই তো সে মুজাহিদ যাদের সঙ্গে তোমরা বসে দুই দুইবার খাবার খেয়েছো। প্রথমবার তাদের খাবারের উড়ন্ত ঝোলের ছিটায় তোমাদের কাপড় নষ্ট হয়েছে।....

'তোমাদের ধারণা মতে ওরা অসামাজিকদের মতো খাবার খেয়েছে। তোমাদেরকে আমরা এটাই দেখাতে চেয়েছিলাম। ওদেরকে বলা হয়েছিলো যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খাবার খাওয়া হয় সেভাবে যেন ওরা খাবার খায়।'

'যুদ্ধের ময়দানে ওরা কোন সামাজিক রীতিনীতির ধার ধারে না। কারণ, তখন তাদের সামনে থাকে এরচয়ে আরো বড় কোন লক্ষ্য। খাবারের প্রতি তখন তাদের কোন পরোয়া থাকে না। আর খাবার খেলেও এমন দ্রুত খেয়ে তাদের সেই দায়িত্বে ঝাপিয়ে পড়ে যা মহান আল্লাহ তাদেরকে সপে দিয়েছেন।'

'আমার কিবতী ভাইয়েরা! তারপর আমি তোমাদেরকে মুজাহিদদের সেই রূপও দেখিয়েছি যার মধ্যে মার্জিত রুচি ও সৌজন্যতা রয়েছে। রয়েছে ভদ্রতাও। তাদেরকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, এখন আর তোমরা লড়াইয়ের ময়দানে নেই। তাই এভাবে খাবার খাও যেমন নিজের ঘরোয়া পরিবেশে খেয়ে থাকো। আর খেয়াল রেখো তোমাদের সঙ্গে মেহমানরাও খাবে।'...

'মুজাহিদদের এই রূপ দেখে তোমরা বিস্মিত হয়েছো। তোমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছো এরাই কি সেই মুজাহিদ যাদেরকে আমরা গতকাল অভদ্র বলে কুটুক্তি করেছিলাম। মাত্র এক দিনের ব্যবধানে এরা এমন সভ্য ভদ্র, সুশৃঙ্খল হয়ে গেলো কী করে। কিন্তু এদেরকে কেউ বলেনি, আজ ভদ্রতা বজায় রেখে চলো। জন্মগত সভ্য-ভদ্র জাতি একেই বলে।'...

'তারপর তোমরা তাদের তৃতীয় আরেকটি রূপ দেখেছো। আমি জানি তোমরা ওদেরকে শিক্ষা দীক্ষাহীন একটি ঝটিকা লড়াকু দল মনে করো। যারা শুধু লড়তেই জানে। আর কিছুই জানে না। তোমরা খোলা চোখেই দেখেছো, ওরা সুশৃঙ্খলতার কী দারুন প্রদর্শনী করছে।'...

'এই সুশৃঙ্খলতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সালার, কমাণ্ডারদের ইশারায় পদক্ষেপ ফেলা তাদের স্বভাবজাত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা যখন এক সেনাদলের রূপ নিয়ে সমবেত হয় তখন নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিও নিজের আমীর বা সালারদের কাছে সোপর্দ করে দেয়।....

'ওদের মধ্যে থেকে যদি তিন চারজন বা এর চেয়ে বেশি সৈনিক কোন কাজে দল থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলেও নিজেদের এক সঙ্গীকে দলের আমীর বানিয়ে নেয়। তারপর তার হুকুম মতো পথ চলে। এটাই ইসলামের বিধান। এ বিধান তারা যে কোন মূল্যে রক্ষা করে।'...

'আমি তোমাদেরকে তাদের এই তিনটি রূপ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তোমরা ওদেরকে গোয়ার, মূর্খ ও অভদ্র মনে না করো এবং নিজেদেরকে এমন আত্মতুষ্টি ও ধোঁকার মধ্যে যেন না রাখো যে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তোমরে ঘৃণা ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদেরকে বিদ্রোহী করে তুলবে। তখন মুজাহিদরা তোমাদের কাবুতে চলে আসবে।'...

'ওদের সঙ্গে তোমরা যদি ভদ্রতা ও সামাজিকতা বজায় রেখে চলো তাহলে ওরা তোমাদেরকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করবে। কারণ, ভদ্রতা, সৌজন্যতা ও সামাজিকতা ওদের স্বভাবজাত বিষয়।'

'আর যদি তোমরা ভিত্তিহীন কোন আত্মতুষ্টিতে ভুগে ওদেরকে অশিক্ষিত ও জঙ্গী মনে করে যা ইচ্ছা তাই করে যাও তাহলে ওরা তোমাদের কাপড় চোপড় ঝুলের ছিটায় যেমন নষ্ট করে ছিলো তেমনি তোমাদের কাপড় রক্তে রাঙ্গা করে তুলবে। ভেবে দেখো, তোমরা কোন পথ গ্রহণ করবে?'

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সিপাহসালার আমার ইবনে আস (রা.) এর এই কথাগুলো অধিকাংশ কিবতীকেই আলোড়িত করলো। এমনকি কিবতীদের বড় এক অংশ তো তখন মুসলমান হয়ে গেলো।

তবে কিছু লোক একে বিদ্রূপাত্মক বিষয় মনে করে নিজেদের জন্য অপমানজনক ব্যাপার মনে করতে থাকে।

'হে কিবতীরা! আরবরা তোমাদেরকে একটা ঠোকরের ওপর রেখেছে।' তাদের একজন বললো! আরেক কিবতী লিডার বললো,

'আমরা সে জাতি যাদেরকে কোন জাতি পরাজিত ও কাবু করতে পারে না। সেই জাতিই আজ তোমাদেরকে তাদের পায়ের নিচে পিষে ফেলেছে।'

তবে এসব কথায় অধিকাংশ কিবতীই কান দেয়নি। যারা ইসলাম গ্রহণ করলো তাদের জিযিয়া কর আমার ইবনে আস (রা.) মাফ করে দিলেন। আর ঘোষণা করে দিলেন, আজ থেকে ওদেরকে মুসলমানদের সমান সব কিছুর সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে।

এভাবে কিবতীরা এক প্রকার মুসলমানদের অনুগত হয়ে গেলো। আর এটা আমর ইবনে আস (রা.) এর জন্য সুবিধা হয়ে গেলো যে, যখন আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে ইস্কান্দারিয়ায় অভিযানের মঞ্জুরি এসে যাবে তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে ইস্কান্দিরিয়ার দিকে অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন। ব্যবিলনে বিদ্রোহের আর কোন আশঙ্কা থাকবে না।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা.) যখন কিবতীদের এই ঘটনা জানতে পারলেন, তখন এক ঐতিহাসিক মন্তব্য করলেন। তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! ইবনে আসের রণ কৌশল অতি হিমশীতল বরফের মতো ও নমনীয় হয়ে থাকে। নিজের মধ্যে তিনি কখনোই উত্তেজনা সৃষ্টি হতে দেন না। অন্য যোদ্ধারা তো লড়াই করে তলোয়ার দিয়ে। আর ইবনে আসের মুখের কুশলী ভাষা তলোয়ারের চেয়ে অধিক কার্যকারী হয়ে থাকে'।
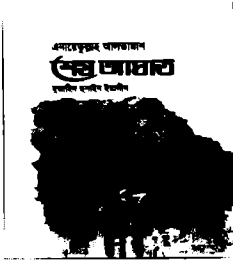
ইস্কান্দারিয়ার দিকে অভিযানের মঞ্জুরি আসার প্রতীক্ষায় রইলেন আমর ইবনে আস (রা.)। শুধু তিনিই নন পুরো সেনাদল এই অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইলো কখন আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে ইস্কান্দারিয়ায় অভিযানের অনুমতি আসে।

অনবরত লড়াই করে এসেছে এই দলটি। একবারই শুধু সেনাসাহায্য এসেছে। এরপর একটি সৈন্যও দলে বাড়েনি। বাড়বে তো দূরের কথা শহীদ ও অধিক যখমীদের কারণে সেনা সংখ্যা আরো কমে গেছে।

এ অবস্থায় তো এই দলটি দৈহিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পরার কথা। কিন্তু আল্লাহর এই মহান সৈনিকদের দেহমন দিন দিন যেন আরো সজীব সতেজ হয়ে উঠতে লাগলো।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আবদুল হাকাম লিখেছেন,

ব্যবিলনের বিজয় যেন মুজাহিদদেরকে বিদ্যুৎতের ক্ষিপ্রতা এনে দিয়েছিলো। ওরা আসলে নিজেদের দেহ-মনকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়। আত্মিক শক্তিতেই ওরা লড়াই চালিয়ে যায়।

ব্যবিলনের মতো কেল্লাবেষ্টিত অতি দূর্ভেদ্য এই ঐতিহাসিক শহর জয় করতে পারবে এমন ভাবনা একজন মুজাহিদের কল্পনায়ও আসেনি। কিন্তু আল্লাহর বিস্ময়কর সাহায্য ওদের সঙ্গী হয়ে যাওয়াতে ওদের দ্বারা অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে।

আর এটা ওদের আত্মবিশ্বাস এতই বাড়িয়ে দিয়েছে যে, ওদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে, ওদেরকে কেউ আর পরাজিত করতে পারবে না।

ব্যবিলনের কাছেই ফাতাহ নামে অনেক বড় এক উপসানালায় আছে। এর পূজারীরা এখানে সূর্যের পূজা করে। একটু দূরে এমনই আরেকটি উপাসনালয় আছে যাকে সারাবিউম বলা হয়। গরুর বাছুরের একটি মূর্তি রয়েছে এখানে। এর পূজারীরা এখানে সূর্যের একটি মূর্তি রয়েছে এখানে এর নাম আবীস। উপসনালয়ের পেছনে অনেকগুলো কবর রয়েছে।

মুজাহিদরা যখন ব্যবিলন সংলগ্ন প্রচীন পরিত্যক্ত শহর দেখতে যায় তখন তারা এই উপাসনালয় আবিস্কার করে। তাদেরকে বলা হয় উপসনালয়ের পেছনের কবরগুলো সেসব গরুর বাছুরের যেগুলোর পূজা করা হতো। এদেরকেই এখানে করবস্থ করা হয়।

রোমের খ্রিষ্ট শক্তি যখন মিসর হামলা করে এখানে তাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তখন এসব উপনাসলয় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এর পূজারীরা গোপনে তাদের পুজার কার্যক্রম চালু রাখে।

কিন্তু গোপনীয়তা যতই নিশ্চিদ্র হোক সেটা একদিন না একদিন তার বদ্ধ কপাট খুলে বেরিয়েই পড়ে। সীমিত বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী মানুষের চোখকে অনেক সময় আড়াল করে রাখা যায়।

কিন্তু অসীম শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহর কাছে তো অনুপরিমাণ বস্তুও গোপন থাকার কথা নয়। তাই আল্লাহ তাআলা বাতিলের এই অপ-উপসনার আস্তানার খবর মুসলিম সেনাদের কাছে ফাঁস করে দেন।

বাতিল আর মিথ্যা এভাবেই হক আর সত্যের আমোঘাতার কাছে তার উদ্ধত শির নত করতে বাধ্য হয়।
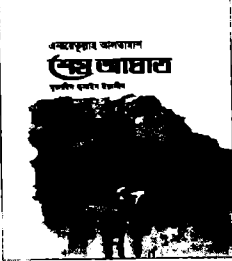
ব্যবিলনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনাসহ অন্যসব নাগরিক শৃঙ্খলও মুসলমানরা দারুন নিপুনতার সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে। কোথাও কোন বিদ্রোহের লক্ষণ নেই। বরং কিবতী খ্রিষ্টানরা কার্যত নিজেদের আনুগত্যই প্রকাশ করছে।

মুসলিম সেনাদের হামলার সময় যে সব খ্রিষ্টানরা শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো তারা আবার শহরে ফিরে এসেছে।

ওরা এখানে রয়ে যাওয়া সমগোত্রীয় খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে জানতে পারে, ওরা অযথাই মুসলমানদেরকে এত দিন ভয় পেয়ে এসেছে। নিরাপত্তা ও শান্তি তো মুসলমানরা প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতি সাধারণ নাগরিককেও তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার দিয়েছে মুসলমানরা।

একদিন এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে হেঁটে এসে সিপাহসালার আরম ইবনে আস (রা.) এর সাক্ষাতে এলো। আমর ইবনে আস হুকুম দিয়ে রেখেছেন, তার

সাক্ষাতে কেউ এলে তাকে যেন অনতিবিলম্বে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সাক্ষাতপ্রার্থী যতই সাধারণ কেউ হোক না কেন।

সিপাহসালার সেখানে না থাকলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কেউ যেন তার কথা শুনে। কোন অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তার প্রতিকার করা হয়।

বৃদ্ধকে এক মুহাফিজ জিজ্ঞেস করলো, তিনি কেন সিপাহসালারের সঙ্গে দেখা করতে চান।

'আমার এক সদ্য যুবতি নাতনি লাপাত্তা হয়ে গেছে। তার মাত্র ষোল বছর'। বৃদ্ধ বড় কাতর গলায় বললেন।

সিপাহসালারের এই মুহাফিজ তখনই আরেক মুহাফিজের মাধ্যমে সিপাহসালারের কাছে খবর পাঠালেন। আমর ইবনে আস (রা.) তখনই তাকে ডেকে পাঠালেন।

বৃদ্ধ তাকে কম্পিত কণ্ঠে জানালেন, যখন রোমীয় বাহিনী ও শহরের কিছু লোক এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো তখনই তার নাতটি নিখোঁজ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধের ধারণা, কোন সৈন্য বা শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া সাধারণ কেউ তার নাতনিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এর আগ পর্যন্ত তার নাতনি তার ঘরেই তার হেফাজতে ছিলো।

'আমি তোষামোদ করে বলছি না! বৃদ্ধ সিপাহসালারকে বললেন, 'আমি বাস্তব অবস্থার কথা স্বীকার করছি। কোন মুসলমানের ওপর আমার সন্দেহ হচ্ছে না। কোন মুসলমান আমার নাতনিকে অপহরণ করতে পারে না মাননীয় সিপাহসালার!'...

'মাননীয় সিপাহসালার! আপনারা তো আমাদের ইযযত আবরুর মুহাফিজ। তারপরও আমি আমার নাতনিকে এতদিন ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। ও যদি আর পাঁচ দশটা মেয়ের মতো দেখতে হতো তাহলে তো আমার কোন ভয় থাকতো না।'...

'মাননীয় সিপাহসালার! আমার নাতটি ভারী সুন্দরী। ওকে যে কেউ উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা আমার বরাবরই ছিলো। আপনার সৈন্যদের ব্যাপারে আমি এত ভীতু ছিলাম না'।

'কিন্তু এই এক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি মুসলমানদেরকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। সামান্য সময়ের জন্য মেয়েটিকে আমি বাইরে যেতে দিতাম না। কালই মাত্র সামান্য সময়ের জন্য বাইরে গেলো। আর ফিরে এলো না।'
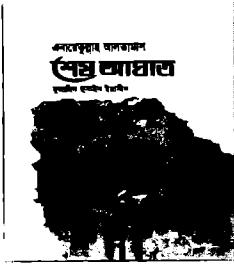
বৃদ্ধের গলা ধরে এলো। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো। ক্রমেই সেটা হেচকির রূপ নিলো। বৃদ্ধ আর কিছু বলতে পারলেন না।

'আপনি কোন চিন্তা করবেন না।' আমর ইবনে আস (রা.) বড় মমতা মাখা গলায় বললেন,

'আপনার নাতনিকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হবে। ইনশাআল্লাহ তাকে পাওয়াও যাবে। তারপর যারা ওকে অপহরণ করেছে তাদেকে আপনার সামনেই কঠিন শাস্তি দেয়া হবে'।

বৃদ্ধ আরো শোকাহত গলায় জানালেন, তার নাতনির মাও দারুন রূপবতী ছিলো। তার এই একমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কোন সন্তান ছিলো না। মুসলমানরা যখন ব্যবিলনে বিজয় বেশে প্রবেশ করে তখন রোমীয় সৈন্যরা শহর থেকে পালাতে শুরু করে। তখনই চার রোমীয় তার ঘরের ওপর চড়াও হয়।

বৃদ্ধ তার নাতনিকে কোথাও লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু সৈন্যরা তার মাকে ধরে ফেলে। মেয়েটির বাবা স্ত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে যায়। সৈন্যরা তাকে এলোপাথারি তলোয়ার মেরে হত্যা করে। তারপর তার মায়ের সঙ্গে ওরা সবগুলো মিলে পশুর মতো আচরণ করে। সেখানেই সে মারা যায়।

তারপর সেই ডাকাত সৈন্যরা ঘরে যে সামান্য সোনাদানা ও টাকা পয়সা ছিলো সব লুটে নিয়ে যায়।

'মাননীয় সিপাহসালার!' বৃদ্ধ আবেগ কাপা গলায় বললেন, 'কালের অনেক উত্থান পতন দেখেছি আমি। তখনকার কথাও মনে আছে যখন অগ্নিপূজকরা মিসর জয় করে। তারপর তাদেরকে হটিয়ে এলো রোমীয়রা। আর রোমীয়দেরকে বিদায় করতে এলেন আপনারা।'...

'না, অগ্নিপূজকদের মনে মানবতার প্রতি সামান্যতম উপলব্ধি ছিলো, না ছিলো এই রোমীয়দের মনে। না প্রজাদের জন্য এতটুকু দরদ ভালোবাসা। ওদের দরবারে যখন কোন অনুযোগ আর ফরিয়াদ নিয়ে এসেছি, মহলের দরজা থেকেই ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে।'...

'আপনার দরবারেও এমনই গলা ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আপনার সাক্ষাত দেন। আপনাদেরকে দেখে তো আমি চরম হয়রান যে, এদেরকে তো মানুষের মতোই দেখা যায়। কিন্তু এরা তো সাক্ষাত ফেরেশতার মতোই আচরণ করছে...

'তারপর যেভাবে আপনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে এবং এর চেয়ে বেশি সহানুভূতি নিয়ে আমার কথা শুনেছেন এতে আমি আরো অধিক বিস্মিত এবং পেরেশান।'

'আমার শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ! আমর ইবনে আস (রা.) তাকে বাঁধা দিয়ে বললেন,

'হয়রান হবেন না। পেরেশানও হওয়ার দরকার নেই। আপনি এখন আসলে কি চাচ্ছেন সেটাই কি আমাকে জানালে ভালো হবে না? কে ভালো কে মন্দ সেসব এখন না বললেও চলবে। এমন কোন সূত্র বা তথ্য দিন যার সাহায্যে আমরা আপনার নাতটিকে খুঁজে বের করতে পারবো।'
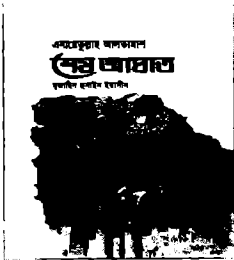
বৃদ্ধের নাতনিকে কে অপহরণ করে নিয়ে গেছে সে ব্যাপারে তো তার কোন ধারণাই ছিলো না। কিংবা সে তার নিজ ইচ্ছায় কারো সঙ্গে চলে গেছে কি-না এটাও তো বৃদ্ধের জানার কথা নয়।

নিজের নাতনির ব্যাপারে তিনি খুবই আবেগপ্রবণ-বেদনাহত। দু চোখ বেয়ে তার অশ্রুবন্যা বইছে। তিনি বলতে শুরু করলেন, তার নাতটিকে তিনি কেমন ভালো বাসতেন। নাতটি তো প্রায়ই বলতো, তার দাদা যত দিন দুনিয়ায় আছে ততদিন সে বিয়েও বসতে পারবে না।

দাদার তো এটা বিশ্বাসই হতো না তার নাতনির পনের ষোল বছর হয়ে গেছে। তিনি তাকে দু তিন বছরর শিশু মনে করে সব সময় নিজের বুকে আগলে রাখতেন।

'আমি ওকে ছাড়া বাঁচবো না সিপাহসালার! বৃদ্ধ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমার মৃত্যুর আগে এক পলকের জন্য হলেও ওকে আমি দেখতে চাই। আমি নিশ্চিত হতে চাই ও কোন নিরাপদ হাতে আছে।

সিপাহসালার আমার ইবনে আস (রা.) তার মুহাফিজ ইউনিটের কমাণ্ডারকে ডেকে বললেন,

'এই বৃদ্ধকে সসম্মানে এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আর পুলিশের উর্ধ্বতন এক অফিসারকে ডেকে নিয়ে আসো'।

পুলিশের বড় অফিসার একটু পরেই সেখানে এসে উপস্থিত হলো। পুলিশের এ অফিসার কিবতী খ্রিষ্টান। এই বৃদ্ধও কিবতী। আমর ইবনে আস (রা.) কঠোর ভাষায় তাকে নির্দেশ দিলেন, বৃদ্ধের নাতনিকে খুজে বের করতে। পুলিশ অফিসারের নাম যোসেফ।

'একটা কথা শুনে নাও যোসেফ'! আমার ইবনে আস (রা.) পুলিশের এই অফিসারকে বললেন,

'জানি না হেরাকলের শাসনামলে তোমরা এ ধরনের নালিশের বিরুদ্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে। কিন্তু আমাদের কাছে একটি মেয়ের হারিয়ে যাওয়া বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সাধারণ কোন ঘটনা বা মামুলি অপরাধ নয়।'

'একজন সাধারণ নাগরিকের সমস্যা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে এর অর্থ আমরা এটাই ধরে নিই যে, আমরা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করছি এবং নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছি।'

'মহামান্য সিপাহসালার! যোসেফ বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি আপনার আগে এ ধরনের অনুযোগ বা নালিশ কখনো ওপর মহল পর্যন্ত পৌছতে পারতো না। আসলে কারো এমন সাহস ছিলো না যে, এ ধরনের অভিযোগ নিয়ে কোন বড় হাকিমের কাছে যাবে। কারণ, সবাই জানতো তার নালিশের কথা তো কেউ শুনবেই না বরং তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হবে'।

'এখন এটা মাথায় গেঁথে নাও'। সিপাহসালার গম্ভীর গলায় বললেন, রোমীয়দের শাসন কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন এখানে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই আইন চলবে। যেখানে কোন ধরনের ভেদাভেদ না মেনে সবাইকে সুবিচার দেয়া হয়...।'

'আমি চুল পরিমাণ অবহেলাও সহ্য করবো না। আমাকে সর্বোচ্চ একদিনের মধ্যে বলতে হবে কতটা শক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া গেছে কিনা। বৃদ্ধকে নিয়ে যাও। আর কোমর বেঁধে অনুসন্ধানের কাজে নেমে পড়ো।'

যোসেফ সিপাহসালারকে নিশ্চয়তা দিলো, সে তার দায়িত্ব পালনে এতটুকু ত্রুটি করবে না। তারপর সে তার একটা ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করলো।

'মেয়েটি যেহেতু সুন্দরী যুবতী। হতে পারে ওর সঙ্গে কারো ঘনিষ্ঠতা আছে। সে তার সঙ্গে চলে গেছে'। যোসেফ বললো।

'এটা জানা তোমার কাজ। তোমার নিয়োজিত সোর্সরাই এটা এদিক ওদিক থেকে জেনে নিতে পারবে যে, মেয়েটির সঙ্গে কারো আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কি না। এসব সম্পর্কের কথা গোপন থাকে না।' সিপাহসালার বললেন।

'মুহতারাম সিপাহসালার! যোসেফ কিছু একটা মনে পড়েছে এমনভাবে চকিত কণ্ঠে বললো,

'আরেকটি সম্ভাবনা আছে সেদিকটি নিয়ে অনেকেরই ভাবার কথা। আমি যেহেতু গোয়েন্দা বিভাগেও দায়িত্ব পালন করছি তাই এ ধরনের ঘটনায় সব দিকই ভেবে দেখে থাকি এবং গভীর পর্যন্ত ঘাটাঘাটি না করে ক্ষ্যান্ত হই না'।

'এটা ঠিক যে আমি যে আশঙ্কার কথা বলছি সেটা ঘটে থাকলে এর বিরুদ্ধে সাধরণত; কোন পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে না। আমার অভিজ্ঞতা হলো প্রতি তিন বছর পর পর এমন বয়সের একটি করে মেয়ে অপহৃত হয়ে যায়। তারপর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না।...

'এর আগে যে সব মেয়ে অপহৃত বা নিখোঁজ হয়েছে ওরা কেউ ব্যবিলনের ছিলো না। অন্যসব শহর বা গ্রাম থেকে সেসব মেয়েরা এতদিন অপহৃত হয়েছে। এই প্রথম ব্যবিলনের একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে'।

'আমার মনে হয় আমাদের ভিকটিম যে মেয়েটি তার নিখোঁজ হওয়ার পেছনেও একই চক্রের হাত রয়েছে'।

আমর ইবনে আস (রা.) এত লম্বা চওড়া কথা শুনতে অভ্যস্ত নন। ভূমিকা ছাড়া সরাসরি কথা শুনতে তিনি পছন্দ করেন এবং নিজেও সেভাবেই কথা বলেন। তিনি যোসেফকে বললেন,

'যেটা বলতে চাও সেটা কেন বলছো না'?
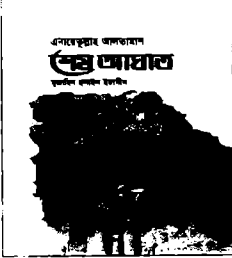
'গোস্তাখী মাফ করুন মাননীয় সিপাহসালার!' যোসেফ হাত জোড় করে বললো, 'বিষয়টির আগাগোড়া ধারণা দেয়ার জন্যই আমি কথা দীর্ঘ করছি। কারণ, আপনার জন্য এটা এক নতুন ব্যাপর। এখান থেকে কিছুটা দূরে সারাবিউম নামে এক প্রাচীন উপসনালয় আছে। আপনি হয়তো সেই উপসনালয়ের পোড়া এলাকায় গিয়েছেন। হয়তো ভেতরেও গিয়েছেন'।...

'ঐ পোড়া এলাকার মধ্যে দিয়ে অন্য দিকে ভিন্ন আরেকটি রাস্তা চলে গেছে। বলতে গেলে প্রায় কেউ জানেই না। সেটা একটা গুহা বা সুড়ঙ্গ পথের মতো। বিশাল এক সুড়ঙ্গ আরেক পৃথিবীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে রযেছে ভিন্ন আরেক জগত।'

'হ্যাঁ, যোসেফ! আমি ঐ পোড়া এলাকায় গিয়েছি', আমার ইবনে আস (রা.) বললেন, 'তবে বেশি দূর পর্যন্ত যাইনি। এতটুকু জানি এটা কোন সম্প্রদায়ের

উপসনাস্থল এবং একে সারাবিউম বলে।...এখন সুযোগ বুঝে সেই গুহার জগতেও একবার হানা দিবো, ইনশাআল্লাহ।'

'এমন দুঃসাহস কখনো করবেন না সিপাহসালার! যোসেফ প্রায় আঁতকে উঠে বললো, 'আপনি ওখানে যেতে তো পারবেন কিন্তু ফিরে আসতেন পারবেন না।...

আমি জানি সম্ভবত শাহ হেরাকল এবং তার পুত্র কস্তুন্তীনেরও এই গুহা সম্পর্কে, এর ভয়াবহ রহস্য সম্পর্কে জানা ছিলো। সেখানে এখনো পূজা বা উপসনা চলছে। এই সম্প্রদায়ের কিছু অনুসারী এখনো ওখানে বেশ প্রতাপের সঙ্গেই বাস করছে।'

'সে উপাসনালয়ে নিশ্চয় 'আবীস' নামে এক বাছুরের পূজা করা হয়।' আমর ইবনে আস (রা.) বললেন।

'জ্বি মুহতারাম সিপাহসালার! যোসেফ বললো, 'আপনি তাহলে সেই পোড়া এলাকায় 'আবীস' বাছুরের প্রতিমা দেখেছেন। আমি শতভাগ তথ্য-তালাশের পর পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, সেখানে এখনো আবীস মুর্তির পূজা করা হয় এবং তিন বছর পর পর একটি বাছুর ও এর সঙ্গে ষোড়ষী কুমারী মেয়েকে বলি দেয়া হয়।'

'তোমরা তো খ্রিষ্টান, শাহ হেরাকলও কট্টর খ্রিষ্টান ছিলেন'। আমর (রা.) বললেন,

'তিনি কি এই অমানুষিক পূজা প্রথা বন্ধ করেননি? আমাকে বলা হয়েছে মিসরে খ্রিষ্টীয় শাসনের শুরু থেকেই এ ধরনের সব উপাসনালয় বন্ধ করে দেয়া হয়। এর মধ্যে সারাবিউম উপসনালয়ও ছিলো।
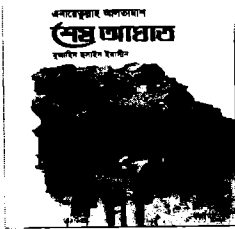
মিসর সম্পর্কে আমর ইবনে আস (রা.) এর এমন খুটিনাটি বিষয়ের অগাধ জ্ঞান দেখে যোসেফ বেশ মুগ্ধ হলো। সে এটা স্বীকারও করলো।

'মাননীয় সিপাহসালার! যোসেফ বললো, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন যে, শাহ হেরাকল এ ধরনের সব উপাসনালয় এবং সব মন্দির বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সারাবিউমকে একেবারে বন্ধ করতে পারেননি। বন্ধ করতেও পারতেন; কিন্তু শাহে হেরাকল কু সংস্কারে বিশ্বাসী লোক ছিলেন।'...

'আসলে তার আসল ধর্ম ছিলো রাজত্ব আর শাহেনশাহী। আর এটাও তার ধর্মের অংশ ছিলো যে, তিনি চাইতেন বাদশাহ সিকান্দারের মতো সারা দুনিয়া জয় করে তার

রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে। খ্রিষ্টবাদ তার দৃষ্টিতে মূলতঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের, বরং তাৎপর্যহীন একটা বিষয় ছিলো।

'শাহে হেরাকল সারাবিউমের উপসনালয়ও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, এ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বই মুছে গেছে। কিন্তু কিছু দিন পর টের পাওয়া গেলো, সারাবিউমের ধ্বংস্তুপের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে থাকা একটা পথ গিয়েছে। যে পথ দিয়ে সামনে এগুলে আরেকটি উপাসনালয়ের দেখা মিলে। সেখানে আবার বাছুর পূজা চালু হয়েছে।'...

'শাহ্ হেরাকল সালিকুস নামে এক জেনারেলকে হুকুম করেন, সে যেন প্রয়োজনীয় সৈন্য নিয়ে গিয়ে সেই পূজামণ্ডপ ধ্বংস করে দেয় এবং যাকেই ওখানে পাবে তাকে ধরে নিয়ে আসে।'...

'জেনারেল সালিকুস কিছু সৈন্য নিয়ে সারাবিউমের পোড়া এলাকায় অভিযান চালালেন। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় হেরাকলকে জানানো হলো, জেনারেল তার দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলো ঠিক; কিন্তু আচমকা অজ্ঞাত স্থান থেকে একটা তীর এসে তার পাজরে বিদ্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল মারা যায়। আর তার দলের সৈন্যরা সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে।'

'পরদিন শাহে হেরাকল এমন কঠিন অসুখে পড়েন যে, তার বাচারই কোন আশা ভরসা ছিলো না। ডাক্তাররা বড় কষ্টে তাকে সুস্থ করে তুলে।

'এক সৈন্য তখন তাকে জানায় সেই অন্ধকার ধ্বংস্তুপের ভেতর থেকে সেদিন একটি আওয়াজ ভেসে এসেছিলো'ঃ

'এই উপসানালয়ের ওপর যে বাদশাই হাত উঠাবে সে আর জীবিত থাকবে না। আর তার রাজত্ব ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'...

'শাহে হেরাকলের মনের মধ্যে তখন থেকেই এটা গেঁথে যায় যে, সেখানে হামলার কারণেই তাকে এই হঠাৎ অসুস্থতায় পড়তে হয়েছে। না হয় সালিকুসের মতো এমন অভিজ্ঞ জেনারেল কোন প্রতিরোধের আগেই এভাবে মারা পড়তো না।'...

'তারপর তো অনেক কিছুই ঘটে গেলো। শাহে হেরাকল শাম দেশ জয় করলেন। তারপর তিনি ইরান ও আরব দখলের পরিকল্পনা করতে লাগলেন।'

'পারস্য তো বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি ছিলো। যাদেরকে আপনারা টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। সেই পারসিকদেরকে মিসর ও শাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন শাহে হেরাকল। এর আগে কিন্তু রোমের চেয়ে পারসিকদের যুদ্ধ শক্তি ছিলো অনেক বেশি অপ্রতিরোধ্য।'...

'কিন্তু শাহে হেরাকল পারসিকদেরকে পরাজিত করে নিজেকে এমন অজেয় শক্তিমান যোদ্ধা ভাবতে লাগলেন যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, তার সামনে কোন যুদ্ধ শক্তি বা পরাশক্তি আর দাঁড়াতে পারবে না। তিনি এখন সারা বিশ্বের বিজয়ী এক শাসকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন।'
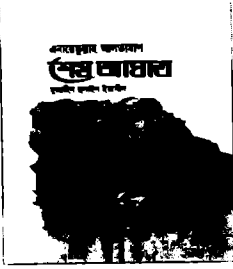
'কিন্তু যোসেফ! আমর ইবনে আস (রা.) যোসেফকে বাঁধা দিয়ে বললেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রোম পারসিকদের সমপাল্লার যুদ্ধশক্তি ছিলো; কিন্তু রোমক ও পারসিকদের ওপরও যে আরেক বিশ্ব শক্তি আছে সেটা তারা তাদের কল্পলোকেও স্থান দেয়নি। সে এমন শক্তি যে, যাকে ইচ্ছা তাকে শক্তিশালী এবং যাকে খুশি তাকে নরকের কীটেরও অধম বানাতে পারেন। সেই মহাসত্য তারা বেমালুম ভুলে যায়।'...

'আচ্ছা, আমরা মুসলমানরা কি নিছক যুদ্ধাশক্তি হিসাবে আলোচনায় আসার মতো কোন অবস্থানে আছি?'

'আমি তো এটাই বলতে চাচ্ছিলাম মুহতারাম সিপাহসালার! সারাবিউমের উপাসনালয়ের কথাটা আগে শেষ করে নিই।...শাহে হেরাকল তখন শামে। তার ছেলে কস্তন্তীন তখন মিসরে। মিসর রাজ ও প্রধান জেনারেলের মতোই তার দাপট ছিলো।...

তখন কস্তন্তীন টগবগে যুবক। জেনারেল হওয়ার মতো সব যোগ্যতাই তার ছিলো। তার কানে যখন সারাবিউমের রহস্যজনক পূজা অর্চনা ও তিন বছর পর পর যুবতী মেয়ে বলিদানের কথা পৌঁছলো; সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুকুম জারি করলেন, কুসংস্কারে ভরা ঐ ইবাদতখানা সমূলে ধ্বংস করে দাও। গরুর বাছুরের প্রতিমা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দাও। আর যারা ঐ উপাসনালয়ের হর্তা কর্তা তাদেরকে খতম করে দাও।'...

'সৈন্যরা সারাবিউমের ওপর হামলা চালালো এবং শুধু ব্যর্থ হয়েই ফিরলো না; বরং চার পাঁচজন সৈন্য রহস্যজনকভাবে মারা পড়লো। আর বাকীরা এমন আতঙ্কিত অবস্থায় ফিরে এলো যে, ওরা কয়েক দিন মুখ ফুটে কথাই বলতে পারলো না।'...

'ওরা যখন কথা বলার মতো অবস্থায় পৌঁছলো তখন সবাই একটা কথাই বললো, কোত্থেকে এক আওয়াজ ভেসে এসেছিলো, যে কেউ এই ইবাদতখানা ধ্বংস করতে চাইবে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। বাঁচতে চাইলে যেখানে আছো সেখান থেকেই ফিরে যাও।'...

'কিন্তু আমাদের কেউ কখনো এটা ভাবেনি যে, আরবের মুরু-বিয়ান থেকে এমন জাতির উত্থান ঘটবে দেখতে দেখতে যারা সর্বত্র তাদের বিজয় কেতন উড়াবে'।

আমার মনে আছে, মুসলমানদের মাত্র সাত আট হাজার সৈন্য যখন শামে হামলা চালায়, হেরাকল তখন ঘৃণাভরে বলেছিলেন,

‘গুটি কয়েক শেয়াল বাঘের মোকাবেলায় নেমে পড়েছে।’

‘কিন্তু হেরাকল যাদেরকে শেয়াল বলে গালিগালাজ করেছিলেন তারাই শাহে হেরাকলকে শাম থেকে এমনভাবে হটিয়ে দিয়েছে যে, তার অধিকাংশ ফৌজই রক্ত গঙ্গায় ভেসে গেছে’।....

‘আর বাকিরা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পালিয়ে গেছে। আপনি সম্ভবত জানেন না, আমাদের এক জেনারেল শাম গিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তখন সেখানে পৌছেন যখন আমাদের ফৌজ পিছু হটতে শুরু করেছে।’...

‘সেই জেনারেল শাহে হেরাকলকে জানাল, কস্তুন্তীন সারাবিউমের উপাসনালয়ে হামলা চালিয়ে সেটা উৎখাত করতে চেয়েছিলো। এ কারণে আমাদের এ অবস্থা।’

‘শাহে হেরাকল কস্তন্তীনকে ডেকে খুব ভর্ৎসনা করে বলেন,

‘সেই উপাসনালয়ে কেন তুমি হাত উঠাতে গেলে? এর পরিনামে তো নামধামহীন হাতে গোনা একদল শিয়াল কুকুর আমাদের পা উপড়ে দিয়েছে। পুরো শাম আজ ওরা দখল করে নিয়েছে। এই পরাজয় তো সেই উপসনালয়ের ওপর হামলার শাস্তি।
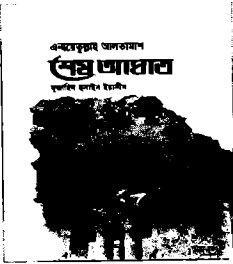
‘যোসেফ! আমার ইবনে আস (রা.) বললেন, মানুষ দৈহিকভাবে যতই শক্তিশালী হোক তার মনে যদি শুধু একটি কাল্পনিক অবাস্তব কিছু বানিয়ে নেয় তাহলে তার এই দৈহিক শক্তি কোনই কাজে আসে না। আমরা যে আল্লাহর পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, ‘সারা দুনিয়ায় একমাত্র তারই রাজত্ব চলবে। এটাই আসল শক্তি। এর মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। নেই কোন কল্পিত ধারণা বা বিশ্বাস’।

‘তুমি নিশ্চয় দেখেছো আমার সঙ্গে যে পরিমাণ সৈন্য আছে তা কতই না নগন্য। অথচ ওদের সাফল্য দেখে নাও।...এটা আমার শক্তি নয়। না কোন সেনাদলের শক্তি এটা।...এটা একমাত্র আল্লাহর শক্তি। আমাদের ওপর কোন অসম্ভব ধারণাও আশ্রয় নিতে পারে না।’

‘শুধু আমি নই সিপাহসালার!’ যোসেফ বললো, ‘আমার সঙ্গীরা এবং আমার উপরস্থ কিবতী অফিসাররা ইসলাম গ্রহণ করুক আর না করুন তারা একথা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে, আরবের এই মুসলমানদের কাছে নিশ্চয় আত্মিক শক্তি আছে। না হয় রোমক ও পারসিকদেরকে কেউ এভাবে পরাজিত করতে পারতো না’।...

'কিসরায়ে ইরানের তো এখন শুধু নামটাই রয়ে গেছে। আপনি তো এখন শামের পর মিসরের অনেকটা দখল করে নিয়েছেন। এখন দেখুন মিসরের অবশিষ্ট অংশ কোস্তান্তীন আপনাদের থেকে বাঁচাতে আসে কি না।...

যাক, আমরা এক নিখোঁজ মেয়ের ব্যাপারে কথা বলছিলাম। এখন মনে হয় অন্যকোন ব্যাপারে আর কথা বাড়ানো উচিত হবে না।'

'প্রয়োজনীয় কথা হলে সংক্ষেপে সেটা বলতে পারো। পরে বিস্তারিত শোনা যাবে'। আমর (রা.) বললেন।

'কথা তো বেশ দীর্ঘ মাননীয় সিপাহসালার! যোসেফ বললো, 'সামান্য ইঙ্গিত দিচ্ছি মাত্র এখন। শাহে হেরাকল মারা যাওয়ার পর বযনতিয়ার শাহী মহলে সিংহাসন ও রাজমুকুট নিয়ে অবস্থা রক্তারক্তির পর্যায়ে চলে গেছে। এটা ক্রমেই গৃহযুদ্ধের রূপও নিতে পারে।...

'মালিকায়ে মার্টিনাকে তো আমি জাদুকর বলবো। তিনি নিজে যা চান তা তো করেনই এবং অন্যদেরকে দিয়ে তা করিয়ে নেন। নুতন খবর হলো, শাহে হেরাকলের বানানো আসকাফে আজম কীরাসকে নির্বাসন থেকে মুক্ত করে বযনতিয়ায় নিয়ে এসেছে কস্তন্তীন।..'

'এটা ঠিক যে, মিসরের ব্যাপারে যদি করো কোন দুশ্চিন্তা থাকে তো একমাত্র রয়েছে কস্তন্তীনের। অন্যদিকে মালিকায়ে মার্টিনা তার একমাত্র সন্তানকে সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছেন। এ পরিস্থিতে মিসরে অবস্থিত রোমীয় ফৌজরা সম্ভবত সেনা সাহায্য পাবে না।'
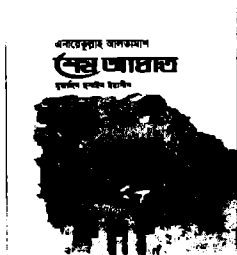
সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) বযনতিয়া সম্পর্কে তো প্রতিটি কথাই শুনতে চান। কিন্তু এ মুহূর্তে তার মাথায় অপহৃত মেয়েটির নিখোঁজ সংবাদ বড় এক যন্ত্রণা হয়ে সওয়ার হয়ে আছে।

তবে বযনতিয়ার শাহী মহলে যা ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি একেবারে বেখবর ছিলেন না। তার নিয়োজিত গোয়েন্দারা নিয়মিত তাকে বিভিন্ন সংবাদ দিয়ে যাচ্ছেন।

মেয়েটির ব্যাপারে যোসেফের মতামত তিনি জানতে চাইলেন।

'আমার মতে মেয়েটিকে ঐ রহস্যজনক ইবাদতখানায় পাওয়া যাবে'। যোসেফ বললো,

'আমার মনে আছে তিন বছর আগে এমন একটি মেয়ে রওজাদ্বীপ থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, সে মেয়ের বাবা ও অভিভাবকদের ফরিয়াদ সেদিন কেউ শুনেনি। কিন্তু এখন কি সেই ভয়ঙ্কর পোড়া এলাকায় অভিযান চালানোর ঝুঁকি নেবেন?'

'তুমি সম্ভবত: বুঝতে পারছো না যোসেফ! আমাকে যদি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিতে হয় তাহলে আমি তাই নেবো। আমি এই মেয়ের বাবা নয়। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। এছাড়াও আমীরুল মুমিনিনের কাছেও আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'...

'আর মেয়েটির দাদা যখন মেয়েটির নিখোঁজ হওয়ার ফরিয়াদ নিয়ে আমার কাছে এসেছে তখন থেকে তো ঐ মেয়েকে আমি আমার মেয়ের স্থান দেয়াটা অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করছি। আমি এতো দীর্ঘ কথা আর কখনো শুনিনি। আজ শুধু এ আশায় শুনেছি যে, এর মধ্যে হয়তো আমার দায়িত্ব পালনে কোন তথ্য বেরিয়ে আসবে। যা আমার কতর্ব্য নির্ধারণে আমাকে সাহায্য করবে।'

আমর ইবনে আস (রা.) তখনই তার সবচেয়ে নির্ভীক দুঃসাহসী এবং যেকোন পরস্থিতিতে ঝুঁকি নিতে পারে এমন সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) কে ডাকালেন।

তিনি তাকে মেয়েটির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা সংক্ষেপে শুনিয়ে বললেন,

'আপনি যোসেফকে সঙ্গে রাখুন এবং সেই পোড়া এলাকা সম্পর্কে জানে এমন দু একজনকেও দলে নিয়ে নিন। তারপর যতজন মুজাহিদ দরকার আপনার পছন্দ মতো বাছাই করে নিয়ে নিন। তারপর সেখানে ঝটিকা হামলা চালান। আর যদি মেয়েটিকে ওখানে পাওয়া না যায় তাহলে সেই আড্ডাখানা ধ্বংস করে দেবেন। আর যাকেই পাওয়া যাবে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসবেন'।
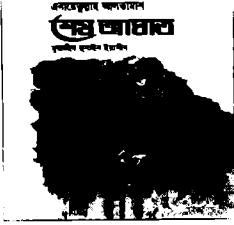
সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) আটজন সৈন্য নিয়ে সারাবিউমের পোড়া এলাকায় চলে গেলেন। পুলিশের বড় কর্তা যোসেফ এই দলের সঙ্গে যায়নি। সে দুই গাইড দিয়ে ছিলো। যে সারাবিউম এলাকা সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ।

সারাবিউমের ধ্বংসস্তুপ ও পোড়া এলাকা তো অসংখ্য মানুষই দেখেছে। মুজাহিদরাও এ এলাকায় তাদের বিজয় কেতন উড়িয়েছে। কিন্তু এর গোপন আস্তানা সম্পর্কে হাতে গোনা কয়েকজনই জানতো।

'যেখানে পূজা ইত্যাদি করা হয় এবং উপাসনালয় রয়েছে সে জায়গা সম্পর্কে তোমরা কতটা জানো?'

'আমরা কখনো এর ভেতরে যাইনি। আমাদের জানা মতে কেউ গিয়েছে বলেও আমরা জানি না। তবে সে জায়গাটা কোন দিক থেকে শুরু হয়েছে আমরা এতটুকু বলতে পারবো।'

সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) শুধু দুঃসাহসিক ও নির্ভীক সেনাই ছিলেন না, মুসলিম সেনাদলে বিচক্ষণতা ও সুক্ষ্মদর্শিতায় তাঁর জুড়ি খুব একটা ছিলো না।

তিনি যোসেফকে একান্তে বসিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে নেন, এখানে হামলা করতে এসে আগে যারা নিহত হয়েছে তারা কীভাবে আক্রান্ত হয়েছিলো?

এ ছাড়াও যোবায়ের (রা.) আরো টুকিটাকি বিষয়ে তার কাছে থেকে জেনে নেন। তারপর সেখানে অভিযানে বের হওয়ার দু একদিন আগে সারাবিউম ঘুরে আসেন।

তিনি সেখানে গিয়ে এমন নির্বিকারভাবে ঘুরে বেড়ালেন যেন ভিনদেশী কেউ এমনিই এখানে ঘুরতে এসেছে। তিনি ধ্বংসস্তুপের ওপরের অংশে গিয়েও ভেতরে যতটা পারা যায় খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নেন।

এই পোড়া এলাকা শুধু দু চারটা কামরা আর কয়েকটা প্রাচীরেই সীমাবদ্ধ নয়। এতো অসংখ্য ভাঙ্গা ঘর-বাড়ি দালান কোটা ও দেউরীর এক রহস্যময় জগত। ভেতরটা অনেকটা তাই গোলক ধাধার রূপ পেয়েছে ওখানে। যে কেউ ওখানে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

কোন এক সময় এখানে সুবিশাল অট্টালিকা, বিশাল বিশাল দালান কোঠা, সুদৃশ্য, বাগ-বগিচা নিয়ে মনোরম এক শহর গড়ে উঠেছিলো ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার অসংখ্য

প্রাচীর, হেলে পড়া ছাদ, কারুকার্য খচিত দরজা জানালার কাষ্ঠ কপাট তারই নিরব স্মৃতি বহন করে আছে। হঠাৎ এগুলোর দিকে চোখ পড়লে ভয়ে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে যায়।

অধিকাংশ দেয়াল বা প্রাচীরের পলেস্তারা সেই কবে খসে পড়েছে। আবার কোথাও কোথাও দু একটা প্রাচীর এখনো তার গাত্রের পলেস্তারা ধরে রেখে মজবুত অবকাঠমোর সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

একদিকে বিশাল বড় এক হল রুম দেখা গেলো। এর অর্ধেক ছাদ ধ্বসে গেছে। ধ্বসে পড়া ইট সুরকির গুড়ো এক দিকে স্তুপিকৃত হয়ে আছে। হলের এক দিকে উচু ষ্টেজ বা মঞ্চের মতো রয়েছে। পুরো মঞ্চ ও মঞ্চের দেয়াল জুড়ে নানান কারুকার্য ও মনুষ্য প্রতিমার চিত্র অঙ্কিত আছে।

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, এটা এক সময় কোন উপসনালয় ছিলো। এর বেশ কয়েকটি কপাটবদ্ধ দরজা রয়েছে। একটি দরজা খুলে দেখা গেলো, ওপাশে ছোট একটি কামরা রয়েছে।

কামরার জুড়ে একটি বেদি রয়েছে। বেদির চার দিকে অনেকগুলো হাড় গোড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলো যে মানব দেহের হাড় গোড় এতে কোন সন্দেহ নেই।

কে জানে এখানে কত অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে?

কয়েক জায়গায় খণ্ডিত সিড়ি দেখা গেলো। সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) খুব সাবধানে ওপরে গেলেন। পা খুব সন্তর্পণে ফেলতে হচ্ছে। কারণ, জায়গায় জায়গায় ছাদ ভেঙ্গে আছে, না হয় নিচের দিকে ঝুঁকে আছে।

কোন কোন ছাদ অবশ্য অক্ষত পাওয়া গেলো। তবু যে কোন সময় ধ্বসে পড়ার আশঙ্কায় এসব জায়গায়ও সাবধানে ফেলতে হলো।

সালার যোবায়ের (রা.) আসলে চাচ্ছেন, আগে যে সব লোক মারা গেছে তাদের ওপর তীর কোত্থেকে ছোড়া হয়েছে এটা অনুমান করতে। এটা নিশ্চিত যে, তীরান্দায কোন মোক্ষম আড়াল নিয়েই তীরগুলো ছুড়েছিলো।

যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এর নজর কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গায় পড়লো। যেমনই হোক তীরন্দাযকে পাকড়াও করতে হলে তার দু একজন লোককে হারাতেই হবে।

দু একদিন আগে সালার যোবায়ের (রা.) এই পোড়া এলাকার এমন স্থানেও ঘুরে গেছেন যেখানে সাধারণ পর্যটকরা মোটেও যাওয়ার সাহস করবে না। তবে তিনি এমনভাবে ওসব স্থানে গিয়েছেন যেন ভুলে ওখানে চলে গেছেন। কারণ, তিনি জানতেন কেউ না কেউ তাকে দূর থেকে অনুসরণ করছে কিংবা কোন দৃষ্টি তাকে গিলে খাচ্ছে।
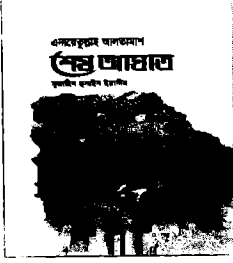
প্রায় মাঝ রাতের দিকে সালার যোবায়ের (রা.) দশজন মানুষের দলটি নিয়ে পোড়া এলাকায় গিয়ে পৌছলেন। তখনো ভেতরে ঢুকেনি দলটি। খোলা চত্তর দিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

এর সামনের এলাকার টিলা টক্কর আর প্রান্ত ভাগের। এই প্রান্তর ভাগের মাঝখানেই সারাবিউমের পোড়া এলাকা।

চাঁদ এতক্ষণে দিগন্ত রেখার বেশ ওপরে উঠে এসেছে। পূর্ণ চাঁদই উঠেছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় বেশ দূর পর্যন্ত দৃষ্টি শক্তি কাজ করছে।

যোবায়ের (রা.) বেশ এগিয়ে গেছেন। তার দল তার পেছনে। তিনি তাদেরকে শেষ বারের মতো দিক নির্দেশনা দিতে যাচ্ছেন। এসময় তার কানে ছুটন্ত ঘোড়ার খুর ধ্বনি ভেসে এলো। ঘোড় সওয়ারকে এখনো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। একটু পর সওয়ারকে দেখা গেলো।

সওয়ার যদি বেশ কয়েকজন হতো তাহলে যোবায়ের (রা.) ও তার সঙ্গীরা তলোয়ার বের করে ফেলতো। কিন্তু ঘোড়া ও তার সওয়ার মাত্র একজন তাদের কাছে এসে সওয়ার ঘোড়ার লাগাম এমন জোরে টেনে নিলো যে ঘোড়ার সামনের দু পা প্রায় শূন্যে উঠে গেলো। এবং পর মুহূর্তে ঘোড়া দাড়িয়ে পড়লো।

সওয়ার এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে যোবায়ের (রা.) এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কে তুমি? এখানে এসেছো কেন?' যোবায়ের (রা.) জিজ্ঞেস করলেন সাওয়ারকে।

'আমি আইলীকে খোঁজতে এসেছি।' সে হাপাতে হাপাতে বেশ তীব্র সুরে বললো। জিজ্ঞেস করছেন আমি কে?... আমি আইলির সব কিছু। আর আইলীও আমার জন্য সব কিছু। আমরা একে অপরকে ছাড়া প্রায় নিস্প্রাণ হয়ে যাই।'...

'আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। আইলী যদি এই পোড়া এলাকায় থেকে থাকে তাহলে ওকে উদ্ধার করার জন্য আমার প্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো তার অপহরণকারীদের ওপর।'

সওয়ার এক কিবতী যুবক। অপহৃত মেয়ে আইলীকে এই যুবক ভালোবাসতো। আইলীও ওকে পাগলের মতো ভালোবাসতো। আইলীর দাদাই ওকে জানিয়েছে, আজ

রাতে মুজাহিদরা সারাবিউমের ধ্বংসস্তুপে যাচ্ছে। তারপরই সে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে মুজাহিদদের পিছু পিছু এখানে চলে আসে।

কিবতী যুবক যোবায়ের (রা.) কে জানায়, আইলী ও তার মধ্যকার সম্পর্কের কথা ভালো করেই জানতেন তার দাদা।

দাদা তাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আইলীকে মিশতে দিতেন না। আর আইলীও এমন নিস্পাপ চরিত্রের ছিলো যে, কারো দিকে চোখ তুলে পর্যন্ত তাকাতো না।

যুবক আবেগে একেবারে দিক বিদিক হয়ে রোমাঞ্চকর কথাবার্তা বলা শুরু করে দিলো।

যোবায়ের (রা.) তাকে বড় নরম গলায় বুঝালেন, তারা যে কাজে যাচ্ছে সে কাজে তার যাওয়া উচিত হবে না। কারণ, আবেগ উত্তেজনায় কখন এমন কাজ করে বসবে, যে কারণে তাদের এ অভিযান সফল হতে হতেও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। তখন পুরো দলই মৃত্যুর মুখে পড়বে।

কিন্তু ছেলেটি ভারি জেদি। কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলো, 'আমি আপনাদের সঙ্গে না গেলে আইলীর সাথে বিশ্বাসঘতকতা হবে। তখন এই শোকে আমি আর বাঁচতে পারবো না।'

অগত্যা ওকে সঙ্গে করে নিতে হলো। তবে যোবায়ের (রা.) কিছু দিক নির্দেশনা দিলেন এবং বললেন, সে যেন যোবায়ের (রা.) এর সঙ্গ ছাড়া পৃথক না হয়।

এ দলটি মূলত জানবাজ একটি দল। চার মুজাহিদের কাছে তলোয়ার ছাড়াও তীর ধনুক রইলো। অন্য সবার কাছে রয়েছে শুধু তলোয়ার। আর দুজনের কাছে তলোয়ার ছাড়াও রয়েছে বর্শা।

এদের কাছে চার পাঁচটি মশালও রয়েছে। তবে এগুলো সালারের নির্দেশ পেলেই কেবল জ্বালানো হবে।

দলটি আবার চলতে শুরু করলো। ঐ যুবকের সঙ্গে ঘোড়া ছিলো। একটু আগে যেখানে প্রান্তরভাগ শুরু হয়েছে সেখানে গাছপালা রয়েছে। একটা গাছের সঙ্গে ঘোড়াটি বেঁধে দেয়া হলো। দলটি যখন পোড়া এলাকায় ঢুকতে যাবে সালার যোবায়ের (রা.) তখন দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'শেষ কথা শুনে নাও'; যোবায়ের (রা.) বললেন, 'এটা মাথায় রেখো আমরা যেখানে এখন প্রবেশ করছি এর অনেকগুলো চোখ রয়েছে এবং যে কোন একটি বা একাধিক চোখ আমাদেরকে দেখছে;'

'কিন্তু ওদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আরেকটা কথা মনে রেখো, আমাদের মধ্যে এমন কয়েকজনও থাকতে পারে যারা হয়তো জীবিত আর ফিরে আসবে না। আল্লাহর নাম নাও এবং দৃঢ়পদে সামনে অগ্রসর হও।'
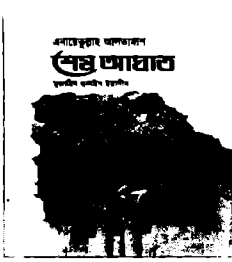
গাইড দু' জন সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সালার যোবারে (রা.) একদিন আগে যে পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে ছিলেন গাইড তাদেরকে সে পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। ভিন্ন পথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সালার বড় চাপা শব্দে সবাইকে বললেন,

'যার যার ধনুকে তীর ভরে নাও এবং তলোয়ারগুলোও কোষমুক্ত রাখো।'

চাঁদের স্বচ্ছ আলো তো ভাঙ্গা পাচিল, ছাদ, প্রাচীর ও কার্নিশের ফাক ফোকর দিয়ে ভিতরে আসছিলো; কিন্তু কোন গলিপথ তার পরও ভীষণ অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। ভেতরে ছমছম নীরবতা এমন ভয়াবহ নিঃশব্দের মধ্যে হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে পেঁচা ডেকে উঠলো।

একবার নয় তিনবার ডেকে উঠলো পেঁচা। এ ধরনের পোড়া এলাকায় পেঁচাই এভাবে ডেকে উঠতে পারে।

'এটা পেঁচার ডাক'; যোবায়ের (রা.) বললেন, 'তবে এটা কোন মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া আওয়াজও হতে পারে। হতে পারে এই রহস্যময় উপাসনালয়ের প্রহরীরা পেচার ডাক ডেকে তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে সতর্ক করছে।'

গলি-ঘুপরির কয়েকটা মোড় ঘুরে খোচা একটা রাস্তা এসে গেলো। হঠাৎ এবং আচমকা তীব্র বাতাসের ঝাপটা এসে লাগলো। এর সঙ্গে লঘু চিৎকার ধ্বনি শোনা গেলো। গাইড সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলো

'তোমরা সবাই বসে যাও।' গাইড সবাইকে দ্রুত বসে যেতে বললো।

মনে হলো বাতাসের তীব্র ঝাপটা সবার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আসলে মাথার ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো বড় বড় পেঁচার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। যেগুলো ছাদের ভাঙা ফাক ফোকর, তাক, কার্নিশ ইত্যাদিতে ঝুলছিলো।

এদের দুনিয়ায় কারো হস্তক্ষেপ ঘটলে ওরা এভাবে ঝাকে ঝাকে হাজার হাজার জট বেধে উড়ে যায়। এবং সবগুলোর রুখ এক দিকেই থাকে।

প্রাণবাহিত এই আচমকা ঝড় বাইরে বেরিয়ে গেলে জানবাযরা সবাই উঠে দাঁড়ালো।

এই পোড়া এলাকা বা ধ্বংস্তুপে এখন আর খোলা চত্তর বা বাড়ির আঙ্গিনার খুব একটা অস্তিত্ব নেই। শুধু খণ্ডিত অখণ্ডিত ছাদ আর ছাদ।

দু তিনটা প্রশস্ত কামরা ও হল ঘর দিয়ে অতিক্রম করার পর দেখা গেলো ভাঙা একটা ছাদ গলে চাঁদের আলো আসছে। চাদের আলোয় ভেতরটা পুরো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একদিকে অক্ষত সিড়ি। ছাদের দিকে উঠে গেছে।

সালার যোবায়ের (রা.) আগের দিন এসে এই সিড়ি দিয়ে ওপরটা দেখে গেছেন। তিনি সিড়িটা চিনতে পারলেন। এর কথা সবাইকে আগেই বলে রেখেছিলেন।

তাই এক মুজাহিদকে সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে বললেন। ওপরে গিয়ে সে কোথায় যাবে কি করবে এসব তিনি তাকে আগেই বলে রেখেছিলেন এই জানবায মুজাহিদ তীরন্দায।

এভাবে আরো দুই সিড়ি দিয়ে দুই জানবাজকে তিনি ওপরে পাঠিয়ে দিলেন। তাদেরকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন কোন কোন ছাদ এমনভাবে ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে যে, সামান্য চাপ পড়লেই ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়বে।

আবার কোথাও ছাদ নিচের দিকে ঝুকে রয়েছে। মুহূর্তের অসতর্কতায় নিচে পড়ে যাওয়ার নির্ঘাত সম্ভাবনা রয়েছে।

চার দিক থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসছে। কখনো তো চিৎকারের মতো শব্দ আসছে; যেন কোন প্রেতাত্মা চিৎকার করে উঠেছে।

সামান্য পা উঠানোর শব্দও মনে হচ্ছে কোন পাপিষ্টের আত্মার ফিসফিসানি। যে কোন সময় কোন প্রেতাত্মা ভয়ঙ্কর রূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে– এমন লোমহর্ষক চিন্তাও কারো কারো গায়ে কাটা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওখানে ইট সুড়কির স্তুপ ছাড়া অন্য কিছু কারো নজরে পড়ছিলো না।...
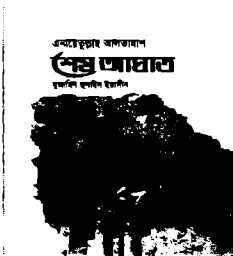
অবশেষে এই জানবাযের দলটি সেই হলের মতো কামরায় গিয়ে পৌছলো যার একদিকের দেয়ালের সঙ্গে ষ্টেজের মতো বেদী রয়েছে। এই হলের মাঝখানে এবং এর সামনেও ইট সুড়কির স্তুপ পড়ে আছে।

গাইড দুজন একটু এগিয়ে গিয়ে ইট সুড়কির স্তুপের ওপর উঠে পড়লো। তখনই দুজনের যে কোন একজন চিৎকার করে উঠলো। অন্যজন দৌড়ে স্তুপের নিচে চলে এলো। কোন দিক থেকে চাঁদের আবছা আবছা আলো আসছে।

এর সঙ্গেই ওপর থেকে কারো গড়িয়ে পড়ার ধূপ শব্দ হলো। কি-বা কে পড়েছে তা দেখার জন্য চাঁদের এতটুকু আলো যথেষ্ঠ নয়।

'তাড়াতাড়ি মশাল জ্বালাও'। সালার যোবায়ের (রা.) মশালধারী একজনকে নির্দেশ দিলেন।

মশালধারী মুজাহিদ তখনই মশাল জ্বালালো। মশালের আলোয় দেখা গেলো, দুই গাইডের একজন পড়ে আছে। তার ঘাড়ের একদিকে তীর বিদ্ধ হয়ে অপর দিক দিয়ে সামান্য একটু ফলা বেরিয়ে পড়েছে।

গাইড কাটা মুরগির মতো ছট ফট করছে।

সালার যোবায়ের (রা.) দেখলেন, তীরের সামনের দিকের ফলা বেরিয়ে এসেছে। তিনি তাই অপর দিকের তীর মাঝখান দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন এবং ফলা ধরে এক ঝটকায় বিদ্ধ তীর টেনে বের করে ফেললেন।

কিন্তু এই আহত গাইডের বেঁচে থাকার আশা করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। রক্তের ফোয়ারা ছুঠছে তার ক্ষত থেকে। নিঃসন্দেহে শাহরগ কেটে গেছে।

এক জনাবায মুজাহিদ সালারের নির্দেশ ছাড়াই আরেকটি মশাল জ্বালিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেলো যেদিক থেকে কারো গড়িয়ে পড়ার শব্দ এসেছে।

সেদিকে গিয়ে দেখা গেলো, এক লোক তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। এ লোক এদের জন্য অপরিচিত। লোকটি পিঠে তীর খেয়েছে। তীরের ফলা এত গভীরে বিদ্ধ হয়েছে যা দেখে অনুমান করা যাচ্ছে এর খুব কাছ থেকে তীর ছোড়া হয়েছে।

লোকটি ব্যথায় ছটফট করছে। কিন্তু এ লোক এখন ক্ষণিকের মেহমান মাত্র। তারপরই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে।

যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) তার তলোয়ার লোকটির বুকে ঠেকিয়ে বললেন, 'জানে বাঁচতে চাইলে বলো তুমি কে? আর এখানে কী হচ্ছে? কতজন লোক আছে ভেতরে?'

'কিছু বলবো না। তীরবিদ্ধ আহত লোকটি বললো, 'তলোয়ার আমার বুকে বিদ্ধ করে দাও, তুবও একটি শব্দও মুখ থেকে বের হবে না। আমি তো এমনিই মারা যাচ্ছি। আমাকে বাঁচার লোভ দেখিয়ে লাভ নেই। আমাদের দেব দেবীরদেরকে অসন্তুষ্ট করে এখন মরতে চাই না।'

সালার যোবায়ের (রা.) বুঝে গেলেন এলোকের কাছ থেকে আসলেই কিছু জানা যাবে না।

এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, গাইড সে প্রান্ত দিয়ে ওদেরকে নিয়ে এসেছে যেখান থেকে উপসনালয়ের দিকে গোপন পথটি গিয়েছে। এ লোক কোন ছাদের ওপর বসে ওদের দিকে চোখ রেখেছে। তারপর সুযোগ বুঝে এক গাইডকে তীরের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে।

এরপর সে দ্বিতীয় গাইডকে তীরবিদ্ধ করতো। কিন্তু সালার যোবায়ের (রা.) আগেই জায়গা মতো তার জানবায মুজাহিদদেরকে মোতায়েন করে রাখেন।

তিনি একদিন আগে এখানে যখন আসেন তখন ওপরে গিয়ে দেখে নেন তীরান্দায কোথায় পজিশন নিয়ে নিচে কাউকে লক্ষ্যস্থল বানাতে পারে।

তাই তিনি এক জানবাযকে সে জায়গা থেকে একটু দূরে আড়াল থেকে মোক্ষম পজিশনে বসিয়ে দেন। যখনই শত্রুপক্ষ গাইডকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই জানাযাব তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ে মারে এবং সে লোক তীর খেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ে।
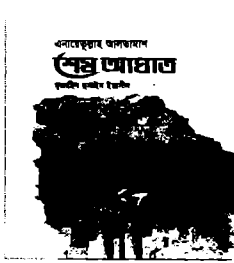
ওপর থেকে এমন ধুমধাম শব্দ আসতে লাগলো যেন দু তিনজন লোক পরস্পর লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের শব্দ আসাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তবে এ আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, অশরীরি জিন বা রহস্যজনক কোন কিছুর কাণ্ডও হতে পারে এসব।

যদি ব্যাপার তাই হয়ে থাকে তাহলে ওপরে যে কয়জন জানবায মুজাহিদ আছে তাদের বেঁচে থাকর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

যোবায়ের (রা.) সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন,

'ওপরে আমাদের মুজাহিদদের সাহায্যে কয়েকজন চলে যাও। তবে খুব সাবধানে।'

কিন্তু সেখানে সিড়িসহ অন্যান্য জায়গায়গুলো এত নড়বড়ে যে, দ্রুত সিড়ি বেয়ে উঠা বা হাটা চলা করা সম্ভব নয়। কারণ ভেঙ্গে পড়া ঝুর ঝুরে ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

'হে আল্লাহ! ওপরের মুজাহিদদেরকে আপনার কাছে হাওলা করে দিলাম'। যোবায়ের (রা.) বললেন।

যোবায়ের (রা.) বেঁচে থাকা গাইডকে বললেন, এখন সম্ভবত ওপরের বিপদ কিছুটা কমেছে। আমাকে সেখানে নিয়ে যাও, যেখান দিয়ে গুপ্ত উপাসনালয়ে যাওয়া যায়।'

গাইড আরেকবার ইট সুড়কির স্তুপের ওপরে গিয়ে চড়লো এবং ওপাশ দিয়ে নেমে পড়লো। তখন ভাঙ্গা ছাদ থেকে দুজন লোক নিচে এসে পড়লো। এগিয়ে দেখা গেলো, দুজনের একজন জানবায মুজাহিদ, আরেকজন সারাবিউমের পূজারী।

দুজনই আহত। দুজনের হাতে এখনো তলোয়ার ধরা। এর অর্থ হলো এরা লড়তে লড়তে একে অপরকে যখমী করেছে। এত ওপর থেকে পড়াতে দুজনই অজ্ঞান হয়ে গেছে। স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এই অচেতন অবস্থাতেই দুজন এই দুনিয়া থেকে চলে যাবে।

এ সময় গাইড কেমন চাপা স্বরে সালার যোবায়ের (রা.)-কে ডেকে উঠলো। যোবায়ের (রা.) তখনই সেখানে পৌঁছে গেলেন। আগে সুড়কির স্তুপে উঠে ওপারে গিয়ে নামলেন। তার ধারণা ছিলো এই স্তুপের ওপাশে এই দালানের দেয়াল ছাড়া অন্য কিছু নেই।

কিন্তু সেখানে এক জায়গায় দেয়াল এমনভাবে ভাঙ্গা রয়েছে বা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে যেন কোন ডাকাত বা লুটেরা সিদ কেটেছে। এটা এখন একটা গুহা মুখের মতো দেখা যাচ্ছে।

আস্ত একটা মানুষ সামান্য ঝুকে অনায়াসে ভেতরে যেতে পারবে। যোবায়ের (রা.) ভেতরে পা দিতে যাবেন তো একটি আওয়াজে তার পা আটকে গেলো।

'এখান থেকেই ফিরে যাও।' সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে একটি আওয়াজ গর্জে উঠলো, 'আর এক পা অগ্রসর হলে তোমাদের বাদশাহী টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে যবে। আর এই পরিনাম তোমাদের অনাগত প্রজন্মেরও হবে।

এই ভারী ও গুঞ্জরন ওঠা আওয়াজে পুরো পোড়া এলাকা গম গম করতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে এই আওযাজ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেলো।

সালার যোবায়ের (রা.) এক দমও পিছু না হটে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং জানবাযদেরকে বললেন,

'তোমরা আমার পেছন পেছন এসো।'

'হেরাকল এর পরিনামের কথা স্মরণ করো।' আবার সেই আওয়াজটি গম গম করে উঠলো। 'রোমীয় সালতানাতের ধ্বংস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।'

সুড়ঙ্গের মতো পথ দিয়ে যোবায়ের (রা.) তার জানবাযদেরকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার পর আবারো সেই কণ্ঠটি গর্জে উঠলো।
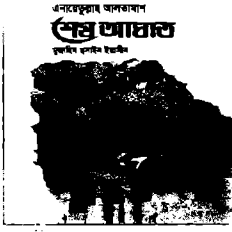
'আমরা এই দুনিয়া থেকে নয়'; কণ্ঠটি এবার আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো। 'আমরা ভিন্ন জগত থেকে কথা বলছি। এখনো সময় আছে। আর যদি দু তিন পা অগ্রসর হও, তাহলে আর জীবিত ফিরে যেতে পারবে না।'

যোবায়ের (রা.) তার জানবাযদেরকে বললেন, সুড়ঙ্গেই যেন ওরা তার জন্য অপেক্ষা করে। তিনি সুড়ঙ্গের বাইরের মুখে এসে দাঁড়ালেন।

'তোমরা জীবিত থাকতে চাইলে আমার সামনে এসে দাঁড়াও।' যোবায়ের (রা.) উঁচু আওয়াজে গর্জে উঠলেন, 'তোমাদেরকে জীবিতই রাখা হবে। আর আমাদের কোন বাদশাহী নেই। বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর। যে বাদশাহীকে কোন মানুষ ধ্বংস করতে পারবে না।'...

'তোমরা এর কিছুই করতে পারবে না। আমরা পাপিষ্ট ও পথহারাদেরকে আল্লাহর পথ দেখাতে এসেছি। একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করা হয়। যদি আমার সামনে তোমরা নিজেরা এসে আত্মসমর্পণ না করো তাহলে বেঁচে থাকতে পারবে না'।

যোবায়ের (রা.) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোন জবাব এলো না। তিনি আবার সুড়ঙ্গের ভেতর চলে এলেন। এক মুজাহিদের হাতে জ্বলন্ত মশাল রয়েছে। সবাই মশালের আলোয় সুড়ঙ্গ পথে হাটা দিলো। একটু পরই সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়ে গেলো।

সুড়ঙ্গের সামনের পথ বন্ধ। তবে ডানে ও বামে দুটি পথ বেরিয়ে গেছে। ডান দিকের পথটিও সুড়ঙ্গ পথ এবং এটি একটু লম্বাও। এর শেষ মাথা যেখানে এই সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে সেখানে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। সালার যোবায়ের (রা.) ডান দিকের রাস্তার দিকে ঘুরে গেলেন।

'জানবায মুজাহিদরা! ঘাবড়ানোর কিছু নেই।' যোবায়ের (রা.) সবার উদ্দেশে বললেন,

'ভেতরে কোন ফৌজের সঙ্গে তোমাদের লড়তে হবে না। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইবাদত আর উপসনার একমাত্র যোগ্য সত্তা মহান আল্লাহ। আমরা এখানে এই সত্য পয়গামই পৌছাতে এসেছি'।

সুড়ঙ্গ পথ পাড়ি দেয়ার সময় আর কোন ঘটনা ঘটলো না। সুড়ঙ্গ পথ শেষ হতেই ওরা এক বড় সড় কামরার সামনে গিয়ে পড়লো। কামরার এক কোণে ছোট একটি ফানুস জ্বলছে। সুবেশী কারুকাজ করা চার পাঁচটি খাট কামরার ভেতর রাখা।

কামরার মাঝখানে এক বৃদ্ধ। লম্বা আল খেল্লা পড়া। মাথায় মিসরীয় টুপি এবং টুপির ওপর রুমাল। দাঁড়িয়ে নিস্পলক যোবায়ের (রা.) এর দিকে তাকিয়ে আছে। বৃদ্ধের পেছনে চার পাঁচজন সস্তা মার্কা লোক তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি বেশ বৃদ্ধ। কিন্তু কোন যুবকের মতো সটান দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহের কোথাও মেদও নেই এবং তকও ঝুলে নেই কোথাও। সালার যোবায়ের (রা.) এখনো তার জানবাযদেরকে এদের সামনে আনেনি। কামরায় তিনি একাই ঢুকেছেন।

'এখানে মরতে এসেছো?' বৃদ্ধ রুক্ষ স্বরে বললেন, 'আমরা তোমার এই মনের বাসনা অবশ্যই পূরণ করতে পারবো। কিন্তু এই বয়সে যদি এই পাপ থেকে আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো তাহলে তোমার অনেক বড় পূণ্য হবে।' কারো রক্ত ঝরানোকে আমি অনেক বড় পাপ মনে করি।'

'কারো রক্তপাত করা আমিও বড় পাপ বলে মনে করি।' যোবায়ের (রা.) গম্ভীর গলায় বললেন,

'আমি বুঝতে পারছি তুমি এই উপাসনালয়ের পাদ্রী বা পুরোহিত। আমি এই পয়গাম নিয়ে এসেছি যে, একমাত্র আল্লারই ইবাদত করা যায়। তোমাদের ইবাদত বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা এসব বন্ধ করে আমার সঙ্গে চলো। যথাযথ সম্মানের সঙ্গে তোমাদেরকে রাখা হবে।'

'আরে মুর্খ মানুষ'। পুরোহিত বললেন, 'তুমি হেরাকলের চেয়ে বড় নও এবং শক্তিশালীও নও। তারপরও তুমি এ পর্যন্ত পৌছে গেছো। হেরাকলের লোকেরা এর গোপন পথের মুখেই এসে শেষ হয়ে যায়। তীরন্দাযদের তীর ওদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়'।...

'তারপর সালতানাতের রোমের পরিনাম কি হয়েছে তা তো নিজ চোখেই দেখেছো। এরপর তো হেরাকলকেও আমরা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছি।...

'আমি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দিচ্ছি এবং তুমি এ পর্যন্ত পৌছতে পেরেছো বলে তোমার সাহসের প্রশংসা করছি। যাও, ফিরে যাও। না হয় আমার লোকেরা তোমার দেহকে কয়েক টুকরো করে এই পোড়া এলাকায় গুম করে দেবে।'

'তাহলে মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দাও। তারপর তোমাদেরকেও হাওলা করে দাও।' যোবায়ের (রা.) অনড়-অবিচল গলায় বললেন।

বৃদ্ধ পুরোহিত সম্ভবত ভেবেছেন, যোবায়ের (রা.) একাই এখানে এসেছেন। পুরোহিত কোন কথা বললেন না। তার কাছে দাঁড়ানো চার জনের দিকে তাকিয়ে মাথা হালকা ইশারা করলেন।

চারজন এক ঝটকায় তলোয়ার কোষমুক্ত করে যোবায়ের (রা.) এর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসলো। যোবায়ের (রা.)ও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ওরা চারজন সালার যোবায়ের (রা.)-কে ঘিরে ফেললো। এসময় আচমকা জানবাযরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এলো এবং এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

জানবাযদের সঙ্গে বেঁচে থাকা গাইড ও সেই যুবকও এখানে এলো; যে অপহৃত মেয়ের প্রেমিক বলে দাবি করেছিলো।

'থামো সবাই!' বৃদ্ধ পুরোহিত গলা ফাটিয়ে বললেন।

তার কথায় কেউ কান দিলো না। তার লোক চারজন মুজাহিদদের আক্রমণে ততক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। আর সালার যোবায়ের (রা.) এর তলোয়ারের ফলা বৃদ্ধ পুরোহিতের পাজর ছুঁয়ে ফেলেছে।

'মেয়েটিকে হাওলা করে দাও।' যোবায়ের (রা.) বৃদ্ধকে বললেন।

বৃদ্ধ পুরোহিত হতভম্ভ হয়ে নির্বাক মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন কারো কোন কথাই শুনতে পাননি।

'এই যে আমি এখানে'। একটি মেয়ের চিৎকারের মতো কণ্ঠ শোনা গেলো।

সবাই ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালো। পনের ষোল বছরের অতি রূপসী একটি মেয়ে একটি দরজা দিয়ে বের হচ্ছে। মুজাহিদদের কেউ তো ওকে চেনার কথা নয়।

আইলীর সন্ধানে আসা তার প্রেমিক যুবকটি তাকে দেখেই পাগলের মতো তার দিকে ছুটে গেলো। এবং তাকে জড়িয়ে ধরলো। মেয়েটিও তার বাহুবন্দী হয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

হারিয়ে যাওয়া মেয়ে ওরা পেয়ে গেছে।

সালার যোবায়ের (রা.) দুই তিনজন জানবাযকে নিয়ে সেই দরজায় গিয়ে ঢুকলেন যে দরজা দিয়ে মেয়েটি বের হয়েছে।

বলতে গেলে দরজার পাল্লা একেবারেই নেই। ঘুনে খেয়ে ফেলেছে।

এটিও একটি কামরা। একটি খাট পাতা রয়েছে ভেতরে। খাটের কাছে একটি খামের সঙ্গে একটি গুরুর বাছুর বাঁধা রয়েছে। বাছুরটির বয়স সম্ভবত হপ্তাখানের বেশি হবে না। পশমগুলো মশালের আলোয় বেশ চক চক করছে। দেখে বেশ মায়া লাগছে।

এই বাছুরটির সঙ্গে ঐ মেয়ে আইলীকে 'আবীস' নামক গো-বৎস প্রতিমার নামে বলি দেয়া হতো। যোসেফ যা বলেছিলো সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো।...

ঐ কামরায় তাল্লাশি চালাতে গিয়ে খাটের নিচ থেকে লুকিয়ে থাকা এক পূজারীকে পাওয়া গেলো।...

নিজের সঙ্গীদের শোচনীয় অবস্থা দেখে এখানে এসে লুকিয়েছে।

বন্দিকে নিয়ে সালার যোবায়ের (রা.) আগের বড় কামরায় ফিরে এলেন। যেখানে তরতাজা চারটি লাশ পড়ে আছে। এই লাশগুলো থেকে একটু দূরে বৃদ্ধ পুরোহিত উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

'একে কে মেরেছে?' সালার যোবায়ের (রা.) তার জানবাযদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। 'তোমাদেরকে কে হুকুম দিয়েছেন যে, ওকেও মেরে ফেলো?'

মুজাহিদরা হতভম্ভ হয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। একজন মুজাহিদ এগিয়ে এসে বললো,

'আসলে এই পুরোহিত তার সঙ্গীদের একজনের পড়ে থাকা তলোয়ার উঠিয়ে নেয়। মনে হচ্ছিলো, তিনি বুঝি মুজাহিদদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামবেন। কিন্তু তিনি তলোয়ারের বাট দু হাতে ধরে তলোয়ারের ফলা নিজের বুকে ঠেকালেন এবং সর্বশক্তিতে চেপে নিজের বুকে গেঁথে নিলেন। এভাবেই তিনি আত্মহত্যা করেন।'

যোবায়ের (রা.) দেখলেন বৃদ্ধ এখনো বেঁচে আছেন। তিনি দৌড়ে বুড়োর কাছে গিয়ে তার বুক ও পেটের মাঝখানে গেঁথে থাকা তলোয়ারটি এক ঝটকায় টেনে বের করলেন। কিন্তু পুরোহিতের বেঁচে উঠারও সম্ভাবনা নেই। কারণ, তলোয়ার পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

যখম এত গভীরে পৌঁছে গেলে যখমীর মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু মারা যেতেও ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। সালার যোবায়ের পুরোহিতকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি এভাবে আত্মহত্যা কেন করতে গেলেন?'

'আমি কারো হাতে গ্রেফতার হতে চাই না।' বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, 'আমার উপাসনালয় ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের প্রিয় ধর্মকে তোমরা শেষ করে দিয়েছো। এখন আর আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?...'

'আমি জানি তোমরা মুসলমান। তোমাদের ধর্ম সম্পর্কেও আমি কিছুটা জানি। কিন্তু একথা বলো না যে, আমাদের এই ধর্ম বাতিল। নব্বই বছর আমি এই উপাসনলয়ে উপাসনা করেছি এবং অসংখ্য পূজারীকে উপাসনা করিয়েছি।'

পরে অবশ্য ঐ মেয়ে আইলী বলেছে, ওকে এমন কিছু পানীয় পান করানো হতো যে, যার প্রভাবে সে সজাগ সচেতনও থাকতো। আবার তার এমনও মনে হতো না যে, সে বন্দি হয়ে আছে।

রাতে যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতো তখন সে বন্দিত্বের কথা অনুভব করতে পারতো। কিন্তু ওকে এমন ভয় ভীতির মধ্যে রাখা হয় যে, সে পালানোর কথা চিন্তাও করতে পারতো না। তা ছাড়া সে এও জানতো না তাকে কোথায় রাখা হয়েছে এবং এখান থেকে পালানোর পথই বা কোনটা?

ঘণ্টা খানেকের আগেই পুরোহিত মারা গেলো। যোবায়ের (রা.) তাদের সবার লাশ ওখানে রেখে আইলী ও সেই বাছুরকে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন।

যে লোকটিকে খাটের নিচ থেকে পাওয়া গিয়েছিলো তাকেও হত্যা করে দেয়া হলো।

দোতলায় এক জানবাযের সামনে এক তীরন্দায এসে পড়ে এবং তার ওপর আক্রমণ করে। সেই মুজাহিদ তাকেও হত্যা করে দেয়। এই মুজাহিদ যখমী ছিলো, কিন্তু সম্মুখ লড়াইয়ে তারই জয় হয়।
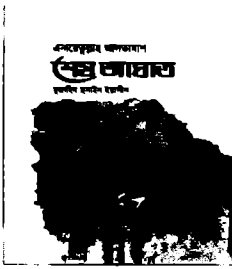
'শুধু একটা কথা বলুন'; সালার যোবায়ের (রা.) বললেন, 'আমার বা আমাদের এই মুসলিম জাতির যে হুকুমত বা শাসন-এর পরিনাম কি আসলেই খুব মন্দ হবে? হেরাকলের পরাজয় কি এজন্যই ঘটেছে যে, তিনি আপনাদের ধর্ম ও উপাসনালয়ে হস্ত ক্ষেপ করেছেন?'

পুরোহিত ব্যথায় কুকড়ে যাচ্ছিলেন। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে বললেন,

'হ্যাঁ,...ঠিকই বলেছি। তবে তোমরা হেরাকলের মতো ভীতু নও। তাই একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল করে নিয়েছো। এই বিশ্বাসের সঙ্গে তোমাদের আত্মিক মেলবন্ধন রয়েছে। যাদের মধ্যে এ ধরনের নিখাঁদ আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাদের পরিনাম ভালো ছাড়া মন্দ হতে পারে না।'

যোবায়ের (রা.) বৃদ্ধ পুরোহিতকে আরো কিছু কথা জিজ্ঞেস করতেন; কিন্তু বৃদ্ধ এখন মৃত্যুপথ যাত্রী। তাই জিজ্ঞেস করলেন,

'ঐ মেয়েটিকে অপহরণ করা হয়েছিলো কেন?'

যোসেফ সালার যোবায়ের (রা.) কে এ ব্যাপারে যা বলেছিলো বৃদ্ধ পুরোহিতও তাই বললেন।

'আচ্ছা, বলিদানের আগে বলির মেয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহারা করা হয়?' সালার যোবায়ের (রা.) বললেন।

'এমন আপত্তিকর ধারণা মনে স্থান দিয়ো না যে, বলিদানের মেয়েকে কোন আপত্তিজন বা অর্থহীন উদ্দেশ্যে রাখা হয়। এই বলিদানের জন্য কুমারী নিষ্পাপ মেয়ের প্রয়োজন হয়; যার চেহারা দেখলেই আমরা বুঝতে পারি।'...

'তারপর সেই মেয়েকে এখানে এমন পবিত্র আর পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয় যেন সে আকাশ থেকে অবতীর্ণ কোন অপসরী।'...
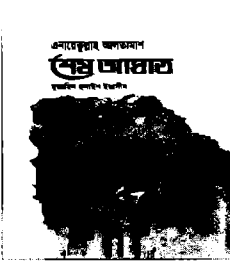
জানবায মুজাহিদদের এই দলটি রাতের শেষ প্রহরে ব্যবিলন এসে পৌঁছে।

ফজরের নামাযের সময় সালার যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) কে জানান, অপহৃত মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। তিনি এই অভিযানের পুরো ঘটনা তাকে শোনালেন।

সকাল হতেই মেয়েটির দাদাকে ডেকে দাদার কাছে নাতনিকে সোপর্দ করে দেয়া হলো। তার দাদাকে বলে দেয়া হলো, তার নাতনিকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাদের দুজন লোককে চিরতরে হারাতে হয়েছে।

তারপর বৃদ্ধের পিড়া পিড়িতে তাকে এই অভিযানের পুরো ঘটনাও শোনানো হলো।

এই ঘটনা শুনে আইলীর দাদা এতই মুগ্ধ হলেন যে, যাকেই সামনে পেলেন তাকেই এঘটনা শোনাতে লাগলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এ অভিযানের ঘটনা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। পর দিন বেশ কয়েকজন সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর কাছে আবেদন জানালো, তাদেরকে মুসলমান বানাতে হবে।

'এমন জাতি এই প্রথম আমরা দেখলাম যাদের মধ্যে এমন মানব হিতৈষী গুণ আছে, আছে এমন চমৎকার বিচারবোধ ও মানুষের প্রতি চরম মমতা।'

প্রায় একশত এগারজন খ্রিষ্টান পর দিন সন্ধ্যা নাগাদ মুসলমান হয়ে গেলো।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) হুকুম দিলেন, সারাবিউমের পোড়া এলাকা যেমন আছে তেমনই রাখা হবে। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এর ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। তবে সেই উপসনালয়ের অংশকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।
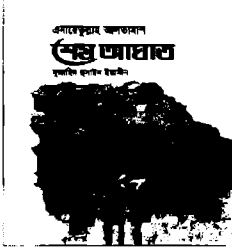
ব্যবিলনে মুজাহিদীনে ইসলাম মহান আল্লাহর দান করা বিজয় ও অপার সাহায্য ধারায় দারুন উজ্জীবিত হয়ে আছে। মিসরে তাদের পায়ের তলায় যে এত দিনে শক্ত খুঁটির ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এই বাস্তব চিন্তা মুসলমানদেরকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলছে।

ওরা এখন ইস্কান্দারিয়া অভিযানের জন্য দারুন জোশ-জযবায় উজ্জীবিত হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। শুধু ব্যবিলনই নয়, বিজিত প্রতিটি এলাকাতেই প্রশাসনিক শৃঙ্খলা-সম্মৃদ্ধি মুসলমানরা বেশ সাফল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে এনেছে।

সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো, সিপাহসালার আমর ইবনে আস (রা.) এর কৌশলতগত আচরণ কিবতী খ্রিষ্টানদের চিন্তা ভাবনা থেকে বিদ্রোহের সব মানসিকতা দূর করে দিয়েছে। বলা যায় তিনি এখন তাদের হৃদয় রাজ্যও জয় করে নিয়েছেন।

ওদিকে বযনতিয়ায় হেরাকলের শাহী মহলে কুদরতের অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে।

হেরাকল মারা গেছেন বেশি দিন হয়নি। এর মধ্যেই পুরো শাহী খান্দান জুড়ে ইবলিস নৃত্য জুড়ে দিয়েছে। পুরো শাহী খান্দান প্রায় দু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

হেরাকলের সব চেয়ে প্রিয় ও যোগ্য ছেলে কস্তন্তীনকে ঘিরে রয়েছে শাহী খান্দানের প্রভাবশালী একটি মহল। সালতানাতে রোমের প্রতি এদের সত্যিকারের আনুগত্য রয়েছে।

যারা সারা বিশ্বকে জয়ের স্বপ্ন দেখে এসেছে এতদিন, কিন্তু এখন রোমের বিশাল এক অংশ হারিয়ে কস্তন্তীন আজ দিশেহারা। অক্ষম ক্ষোভ তার সব সময় তার রক্ত উত্তেজিত করে রাখে।

কস্তন্তীনের সমর্থক জেনারেলরা তাকে প্রতিদিনই দু একটি করে নতুন খবর শুনিয়ে চাঙ্গা রাখতে চেষ্টা করতো। আর সে সব খবর হতো অধিকাংশই মালিকায়ে মার্টিনার কোন পরনিন্দা বা সমালোচনা। এসব জেনারেলরা আসলে তোষামদে ছিলো। এমন এমন অবাস্তব আর মিথ্যা ঘটনা শোনাতো যে, কস্তন্তীনের রক্ত টগবগ করে উঠতো।

হেরাকল মৃত্যুর আগে মিসরের পতিত গভর্ণর মুকাওকিসের সঙ্গে তারই বানানো আসফাকে আজম কীরাসকেও দেশান্তরিত করে যান। এই কীরাস কস্তন্তীনের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে উঠেন।
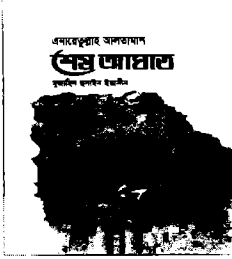
কস্তন্তীন সেই কীরাসকে দেশান্তর থেকে ফিরিয়ে আনেন। বয়নতিয়ায় যেদিন কীরাস আসেন সেদিন তাকে কস্তন্তীন বড় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নেয়। তারপর তাকে নিয়ে একান্তে বৈঠক করে।

'সবার আগে আমি যেটা বলতে চাই সেটা শুনুন' কস্তন্তীন বললো কীরাসকে 'কখনো কিন্তু আপনাকে আমি বিদ্রোহের দায়ে অপরাধী মনে করিনি। আসল অপরাধী ছিলো তো মুকাওকিস। কিন্তু আমার সম্রাট পিতা আপনাকেও তার সঙ্গে দেশান্তর করেন। সত্যিই এটা তার এক ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো।...

'আমার পূর্ণ আশা ও আস্থা রয়েছে যে, সালতানাতে রোমের ব্যাপারে আপনার ততটুকুই আন্তরিকতা রয়েছে যতটা রয়েছে আমার। আমি আপনার আসফাকে আজমের সম্মানিত পদকে আবার বহাল করছি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে আমার পবিত্র পিতা বলেও মনে করি।'

তারপর কস্তন্তীন মিসরের পুরো অবস্থা ও বয়নতিয়ার মহল ষড়যন্ত্রের কথাও কীরাসকে শোনায়।

'আমি তো মিসরে সেনা সাহায্য পাঠাতে চাই। কিন্তু সেখানে কিছু চরম স্বার্থপর বেঈমানরা সেনাবাহিনীকেও দ্বিধা বিভক্ত করে রেখেছে। বাইরে থেকে তো দেখা যায় সৈন্যদের মধ্যে কোন কোন্দল নেই। আসলে ওরা পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠছে'। কস্তন্তীন বড় আক্ষেপের সুরে বললো,

'এত কথার দরকার নেই। আমাকে শুধু একটা কথা বলো, আমি এ পরিস্থিতিতে কি করতে পারি এবং আমাকে কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে?'

'যতটা সম্ভব সংক্ষেপে বলছি' কস্তন্তীন বললো, 'সবার আগে আপনি মালিকায়ে মার্টিনাকে বলবেন, 'তিনি যেন তার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর চিন্তা ভাবনা ভুলে যান। আমাদেরকে যেন আরবের ঐ বেদুঈনদের মিসর থেকে বের করে দেয়ার সুযোগ দেন। এখানে গৃহযুদ্ধের যে কালো বাতাস বইছে সেটা সুবাতাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।...

'যদি অবস্থা এ পর্যায়ে উন্নীত হয় তাহলে আপনার নেতৃত্বে মিসরে সেনা সাহায্য পাঠানো হবে। আমার কাছে নিয়মিত রিপোর্ট আসছে। কিবতী খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের পরম বন্ধু হয়ে উঠছে। ওদেরকে সব ধরনের সহযোগিতা করছে।'...

'আমার তো আশঙ্কা হচ্ছে, মিসরের যে সব এলাকা এখনো আমাদের কব্জায় আছে সে সব এলাকায় কিবতীরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। আপনি কয়েকজন ধর্ম প্রচারকও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ওদেরকে সালতানাতে রোমের প্রতি আন্তরিক করে তুলবে ধর্ম প্রচারকরা।'

'তুমি ভুলে যেয়ো না।' কীরাস বললেন, কিবতীদের মনে আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। শাহে হেরাকল যে নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে কিবতী খ্রিষ্টানদের নির্বিচারে আমাদের হাতে হত্যা করিয়েছেন সেটা কিবতীরা কখনো ভুলবে না।'

'কিবতীদের সমর্থন পেতে হলে একটা কাজ করতে পারো, সেটা হলো, সরকারিভাবে ঘোষণা করে দাও যে, শাহে হেরাকল যে সরকারি ধর্মের উদ্ভাবন করেছিলেন সে ধর্ম বাতিল করা হলো। ঈসা মসীহ (আ.) যে খ্রিষ্ট ধর্ম আমাদের জন্য নিয়ে এসেছিলেন সেটাই বহাল করা হলো'।...

'আমি মালিকায়ে মার্টিনার সঙ্গে সাক্ষাত করবো। তিনি যাতে সিংহাসনের চিন্তা বাদ দেন এবং দেশে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির কারণ হয়ে না দাঁড়ান। আর নিজেকেও সালতানাতে রোমের মালিকা আর সম্রাজ্ঞী বলে না ভাবেন।'

দুজনে ঠিক করলেন, আগামীকাল জেনারেলদের একটা কর্মশালা ডাকা হবে। তাদের মতামত নেয়া হবে এ ব্যাপারে।
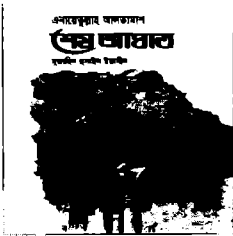
কস্তুন্তীনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শেষে কীরাস যখন বাইরে বের হলেন সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে আসছে। কীরাস বাইরে বের হলে নিজের জালে জড়িয়ে নেয়ার জন্য মালিকায়ে মার্টিনা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তার এক লোককে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন।

কীরাস নিজেও মালিকায়ে মার্টিনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। লোকটি কীরাসকে দেখে দ্রুত কাছে এসে সালাম দিয়ে ফিস ফিস করে বললো,

'মালিকায়ে মার্টিনা আপনাকে এখনই ডাকছেন।'

কীরাসও দেরি না করে মার্টিনার সাক্ষাতে চলে গেলেন।

প্রত্যেক ঘটনার খুঁটি নাটি যে সব কাহিনীকার ও ঐতিহসিকরা লিখে থাকেন তাদের বর্ণনা পাওয়া যায় যে, কীরাস যখন মালিকায়ে মার্টিনার কামরায় পা রাখলেন তখন তাকে এমন সুগন্ধির স্নিগ্ধ ঝাপটা অভ্যর্থনা জানালো যে, এমন সুবাস তিনি আর কখনো পাননি। এর প্রভাবে তার ভেতর যে অনুভূতি হলো এটাও তার কাছে নতুন মনে হলো।

মালিকায়ে মার্টিনা দরজার ওপাশে মন আবেশ করা দেহ আর রূপের আগুন নিয়ে কীরাসকে বরণ করে নিলেন। মুহূর্তেই কীরাসের মনে হলো। তিনি কোন স্বর্গীয় অপসরীর সামনে এসে পড়েছেন।

মার্টিনাকে সবসময় তার আসল বয়সের চেয়ে অনেক কম বয়সী মনে হতো। পুরুষ মানুষকে তার মনোহরী জাদুর জালে ফাসাতে দারুণ দক্ষতা ছিলো মার্টিনার। মার্টিনা বেশ খোলা মনে ও খোলা বদনে কীরাসকে অভ্যর্থনা জানালেন।

পৌঢ় কীরাস এই মরা যৌবনেও নিজের মধ্যে যৌবনের উষ্ণতার আঁচ অনুভব করলেন। মালিকায়ে মার্টিনা কীরাসকে এক শাহী কুরসীতে বসালেন। এ সময় প্রায় উলঙ্গ দুটি তরুণী দৌড়ে এলো।

'তাড়াতাড়ি খাবার পরিবেশন করো।' মার্টিনা হুকুম করলেন।

মেয়ে দুটি দৌড়ে বাইরে চলে গেলো। আর কীরাসকে এমন জাদু আক্রান্ত করলো যে, তার দৃষ্টি সেই দরজার ওপর আটকে রইলো যে দিক দিয়ে তরুনীরা এসেছিলো এবং কয়েক মুহূর্ত থেকে আবার চলে গিয়েছে।

মালিকায়ে মার্টিনা যখন তার মায়াবী জাল আরো প্রসারিত করলেন কীরাস সামান্য সময়ের ব্যবধানেই ভুলে গেলেন, তিনি রোমের অনেক বড় এক ধর্মীয় নেতা এবং শাহে হেরাকল তাকে আসফাকে আজম প্রধান পাদ্রী বানিয়েছিলেন।

তার সব মানবীয় দুর্বল দিকগুলো একে একে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। সেগুলো তার এত দিনের লালিত ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করতে শুরু করলো।

বিচিত্র স্বাদের ও বর্ণের খাবার এলো। সেই দুই রূপসী তরুনী শরাব ঢেলে দিলো। মার্টিনা তখন লক্ষ্য করলেন, কীরাসের দৃষ্টি মেয়ে দুটির দেহের ওপর আঠার মতো লেগে গেছে।

ভোজন পর্ব শেষ হওয়ার পর মার্টিনা আসল কথায় এলেন। তিনি এমন কোন কথা বললেন না যাতে এটা প্রকাশ পায় যে, তিনি তার ছেলে হারকিলিউনাসকে সালতানাতে রোমের রাজমুকুট পরাতে চাচ্ছেন।

মার্টিনার কথায় সালতানাতে রোমের ব্যাপারে এক রাশ বেদনা ঝরে পড়ে। সব পরাজয় ও ব্যর্থতার দায়ভার হেরাকল ও কস্তুন্তীনের ওপর চাপিয়ে দেন। তার প্রতিটি কথা কীরাসের মনে রেখাপাত করতে থাকে।

একটু পর কীরাস অনুভব করতে লাগলেন, তিনি এই দুনিয়াতে নেই বেহেশতে পৌছে গেছেন। যেখানে হুর পরীরা তার সেবায় নিয়োজিত।...যেন কীরাস মালিকায়ে মার্টিনার গোলাম হয়ে গেছেন।

মার্টিনা কীরাসের জন্য যে কামরা প্রস্তুত করেন সেটা তার নিজের কামরা থেকে আরো মনোরম ও আকর্ষণীয় সাজে সুসজ্জিত। এ আকর্ষণে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিল মালিকায়ে মার্টিনা। তিনি সেই দুই তরুণীর একজনকে কীরাসের কামরায় পাঠিয়ে দিলেন।...

সকালে যখন কীরাসের চোখ খুললো তখন তার মাথায় মার্টিনা ছাড়া আর কিছুই রইলো না। তিনি ফায়সালা করে ফেললেন, রোমের সিংহাসন ও রাজ মুকুটের উত্তরাধিকার হারকিলিউনাসই হবে।

তিনি ঠিক করলেন, প্রকাশ্যে তিনি কস্তন্তীনেরও থাকবেন এবং সেনাসাহায্য নিয়ে মিসরেও যাবেন।

একটু পরই কীরাসের কামরায় মালিকায়ে মার্টিনা এলেন। কীরাসের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে মার্টিনা বুঝতে পারলেন, এ লোক তার মুঠোতে এসে গেছে।

তারপর মার্টিনা কীরাসের মাথায় এটা ঢেলে দিলেন যে, তিনি সেনাসাহায্য নিয়ে মিসর যাবেন এবং জেনারেল থিয়োডরের সঙ্গে মিলে মিশে মুসলমানদেরকে মিসর থেকে বের করে দেবেন। এরপর মার্টিনা সেখানে পৌছে নিজেকে মিসরের সম্রাজ্ঞী বলে ঘোষণা করবেন।

কীরাস তাকে আশ্বস্ত করলেন, তিনি এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টিই হতে দেবেন না; বরং কস্তন্তীনের জন্যই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে, সে নিজেই বলতে বাধ্য হবে- হারকিলিউনাসকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়া হোক।

ইতিহাসের নিরপেক্ষধারা এ সত্য একেবারে খুলে প্রকাশ করেছে যে, কীরাস ছিলেন একজন প্রধান ধর্মীয় নেতা বা পাদ্রী এবং যিনি যে কোন রায় বা ফতওয়া দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতাধারী ছিলেন।

সেই কীরাস দৈহিক ও মানসিকভাবে এক বিপথগামী স্বার্থান্বেসী নারীর পুতুল বনে গেলেন।

'আপনার আসফাকে আজম পদ তো বহাল আছেই। আমি মিসরের সম্রাজ্ঞী হলে আপনাকে ওযীরে আজমও বানাবো। মালিকায়ে মার্টিনা কীরাসকে এই টোপও গিলিয়ে রেখেছেন।

সেদিনই পূর্বে নির্ধারিত মন্ত্রী পরিষদ ও জেনারেলদের নিয়ে বৈঠকে বসলো কস্তন্তীন। কীরাস তো সেখানে বিশেষ আসন অলংকৃত করলেন।

কস্তন্তীন তার বাবার মতো এতটা জাদরেল হাভভাব বা ব্যক্তিত্বের আধিকারী ছিল না। সভায় তাকে কিছুটা অপ্রতিভ ও হীনবল দেখা যাচ্ছিলো। অথচ সব সময় তাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখা যেতো। তবে তার মধ্যে রাজ রাজাদের গরুগাম্ভীর্য না থাকলেও সমীহ্ পাওয়ার মতো এক ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব তাকে বেশ উজ্জল করে রাখতো।

সভায় জেনারেলরা ছাড়াও বিভিন্ন শহর প্রধানরাও অংশগ্রহণ করে। এদের কেউ কেউ তো কস্তন্তীনের গোর সমর্থক। আবার কেউ কেউ মালিকায়ে মার্টিনার। কস্তন্তীন সবার আগে মিসরে পরাজয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলো। যে শব্দ দিয়ে সে বক্তৃতা শুরু করলো সেটা হলো,

'বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু ভেতরের শত্রু থেকে জাতির ইজ্জত আবরু ও দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখা কখনোই সম্ভব হয় না। বাইরের শত্রু থেকে ভেতরের শত্রু শতগুণ ভয়ঙ্কর।'

একথার কেউ কোন প্রতি উত্তর করলো না। কস্তন্তীন সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বললো,

'আমি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একথা মুখে আনতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা দু দলে আজ বিভক্ত হয়ে পড়েছি। এই বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতাকে রোখা যেতো, কিন্তু পরিস্থিতি এতই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে, আমরা পরস্পর প্রাণের শত্রু হয়ে উঠেছি। আর এর পরিনাম তো আমাদের সবার সামনেই আছে।'...

'সেনা সাহায্য পাঠাতে পারিনি আমরা। এর ফায়দা কড়ায় গণ্ডায় উঠিয়ে নিয়েছে আরবের ঐ বুদ্ধুরা। ওরা মিসরের অর্ধেকের চেয়ে বেশি অংশ দখল করে নিয়েছে। আসল বিরোধ তো সিংহাসন আর রাজমুটুক নিয়ে। এই বিরোধকে এক দিকে রেখে চলুন আমরা সালতানাতের হারানো সম্ভ্রম ও সর্বভৌমত্ব ফিরিয়ে আনি।'

'পদ মর্যাদায় আপনি একজন জেনারেল ছাড়া কিছুই নন।' মালিকায়ে মার্টিনার এক সমর্থক জেনারেল বললো, 'সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে কোন বিরোধ নেই। মালিকায়ে মার্টিনাকে আমরা রোমের সম্রাজ্ঞী বলে মেনে নিয়েছি।'

এই জেনারেলের কথা শেষ হতেই কস্তন্তীনের সমর্থক জেনারেলরা এক সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো।

মার্টিনার দলের জেনারেলরা প্রতিবাদের জবাবে হৈচৈ শুরু করে দিলো। বহু কষ্টে কস্তন্তীন ও কীরাস এই মৌখীক কুরুক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণে নিতে পারলো।

'শাহে হেরাকল মিসরের গভর্নর শাহে মুকাওকিসকে লাঞ্চিত আর অপমানিত করে দেশান্তরিত করেছিলেন কীরাস গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তাকে একমাত্র এ কারণে দেশান্তরিত করেছিলেন যে, তার কথায় ও কাজে কর্মে বিদ্রোহের গন্ধ পাওয়া যেতো। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলছি তোমরা সবাই বিদ্রোহী।'...

'তোমরা প্রত্যেকে পদের অধিকারী। কেউ জেনারেল এবং কেউ বড় প্রশাসক আর সেই তোমরাই গৃহযুদ্ধের পর্যায়ে দেশকে নিয়ে গেছো। এটা শাহী ফরমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়তো কী?'

'কস্তন্তীন তো এই দাবী করেনি যে, সে রোমের একচ্ছত্র বাদশাহ। সে শুধু বলেছে, আপাততঃ এই বিরোধ ভুলে আমরা এক সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করি। কিন্তু তেমরা এতই নিচে নেমে গেছো যে, পরস্পরের চরম শত্রু তো হয়েছোই এমনকি যুক্তির ধারে কাছেও যাচ্ছো না।'

'আরবের মুসলমানরা তোমাদের থেকে শাম ছিনিয়ে নিয়েছে এবং মিসরও ছিনিয়ে নিচ্ছে। আর তোমরা একে অপরের রক্ত পানের তৃষ্ণায় মেতে উঠেছো। ছিঃ তোমাদের আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় গেলো?' 'কোথায় গেলো তোমাদের জাতীয়তাবোধ? লড়তে থাকো। তারপর মুসলমানরা একদিন এখানেও চলে আসবে এবং তোমরা হবে তাদের যুদ্ধবন্দি।'

সবাই নির্বাক হয়ে রইলো। কীরাস সবার দিকে পালা করে তাকালেন। এভাবে কিছুক্ষণ নীরব রইলেন।

'আমি না কস্তন্তীনের পক্ষ নিয়ে বলছি, না মালিকায়ে মার্টিনার পক্ষে বলছি, কীরাস কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, 'আমাদের শাহী খান্দানের নয় বরং রোমের সম্ভ্রম ও সার্বভৌমত্বের প্রতি দায়বদ্ধ হতে হবে। এর চেয়ে প্রিয় আমাদের কাছে আর অন্য কিছু হতে পারবে না।'...

'রোমের সিংহাসন ও রাজমুকুট কারো একার নয়। আমাদের সবার। এটা আমাদের জাতীয় সম্ভ্রমবোধের সবচেয়ে বড় ও পবিত্র প্রতীক। তাই সবার আগে এখন সেনা সাহায্যের কথা বলো, যাদেরকে খুব দ্রুত মিসর পাঠাতে হবে। মন থেকে সব ব্যক্তিগত রেষারেষি, বিদ্বেষ ও বিরোধ দূর করে দাও।'
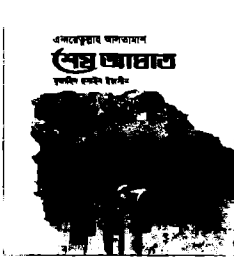
মালিকায়ে মার্টিনার সবচেয়ে বড় সমর্থকই নয়; বরং প্রধান মুখপাত্র তো এই কীরাসই। কিন্তু বিচক্ষণতা ও চতুরতার কৌশল খাঁটিয়ে কীরাস এমনভাবে কথা বললেন যে, কেউ তার কথায় সামান্য সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারলো না।

কীরাস বলেই যাচ্ছিলেন। এসময় এক মুহাফিজ দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো এবং সোজা কস্তন্তীনের কাছে চলে গেলো। তার কানে কানে কিছু একটা বললো। কস্তন্তীনের মাথায় হালকা ইশারা করলেন। দারোয়ান বাইরে চলে গেলো।

ভেতরে এলো এক শাহী কাসেদ বা রাজকীয় সংবাদ বাহক। কাসেদ কুর্নিশ করে কস্তন্তীনের হাতে কিছু একটা দিলো।

এই কাসেদ মিসর থেকে জেনারেল থিয়োডরের পয়গাম নিয়ে এসেছে। কস্তন্তীন পয়গাম পড়তে শুরু করলো। কিন্তু সবাই লক্ষ্য করলো তার মুখের বর্ণ ক্রমেই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিবর্ণ হতে হতে এক সময় লাশের মতো রক্ত শূণ্য হয়ে গেলো।

কস্তন্তীন সোজা হয়ে বসা ছিলো। মনে হলো তার হাত পা সব ছেড়ে দিয়েছে। মজলিসের সবাই বুঝতে পারলো, কাসেদ তাদের জন্য কোন ভালো খবর নিয়ে আসেনি।

'তোমরা সবাই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও।' কস্তন্তীন এমন সুরে বললো, যাতে প্রাণের কোন ছোঁয়া নেই আছে মৃদু কাঁপুনি, 'আরবের বেদুইনরা ব্যবিলন ও তার আশে পাশের বিশাল অঞ্চল এবং 'জাযীরায়ে রওজা'ও জয় করে নিয়েছে।'...

'জেনারেল থিয়োডর ও জেনারেল জারেজ মুসলসমানদের সঙ্গে সন্ধি করে কোন ক্রমে নিজেদের সৈন্যদেরকে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে।...তারপরও তোমরা সেনা সাহায্যের ব্যপারটি গুরুত্ব দেবে না।?'

ঐতিহাসিকরা লিখেন, এই প্রথমবার কিছু সময়ের জন্য হলেও সব জেনারেল ও অন্যান্য হাকিমরা কোন ব্যপারে একমত হলো এবং মিসরের সেনা সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো। সবাই কস্তন্তীনের এ পরামর্শও মেনে নিলো যে, কীরাস এই সেনাসাহায্যের নেতৃত্ব দেবেন।
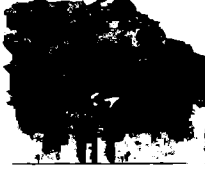
এমন নির্মম দুঃসংবাদ শুনে সভায় উপস্থিত সবাই প্রায় নির্বাক হয়ে পড়ে। পরক্ষণেই সবার নজর গিয়ে পড়ে কস্তন্তীনের ওপর। কারণ, কস্তন্তীনের মাথা এক দিকে ঢলে পড়েছে। হঠাৎ করে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কীরাস ও দুই জেনারেল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, কস্তন্তীন একেবারে অজ্ঞান না হলেও তার অবস্থা বেশি সুবিধানজনক নয়। ভেতরে কোন এক জটিল রোগ তার মধ্যে এত দিনে বাসা বেঁধেছে। ব্যবিলনের খবর তার ভেতরের ক্ষীণ শক্তিটুকুও নিঃশেষ করে দিয়েছে।

কস্তন্তীনকে কয়েকজন ধরে দরবার কক্ষ থেকে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে শুইয়ে দিলো।

তখনই ডাক্তার চলে এলো। কিন্তু ব্যবিলন হারানোর শোক ও আঘাত কস্তন্তীনকে এমন জটিল ও মুমূর্ষু রোগে আক্রান্ত করলো, সে কথাই বলার উপযুক্ত রইলো না।

সিংহাসন নিয়ে লড়াই যুদ্ধ আর মিসরে সেনাবাহিনী পাঠানোর বিষয়টি এক দিকে পড়ে রইলো।

মালিকায়ে মার্টিনা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারলেন, কস্তন্তীনকে খুবই নাজুক অবস্থায় দরবার কক্ষ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। শুনেই মার্টিনা দৌড়ে গিয়ে কস্তন্তীনের শয়ন কক্ষে উপস্থিত হলেন এবং তার পালঙ্কে বসে দু তিনবার প্রায় ফুপাতে ফুপাতে কস্তন্তীনের কপালে চুমু খেলেন।

এমন ব্যাকুল ভাব দেখালেন যেন তিনিই তার আপন মা।

'হে খোদা!' মার্টিনা দুহাত আকাশের দিকে উঠিয়ে মুখটিও উর্ধ্বমুখী করে কান্না সিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও। আমর প্রাণ নিয়ে নাও। আমার সন্তানকে সুস্থ করে দাও। আমি যেন ওকে আবার ঘোড়ার পিঠে দেখতে পারি। ওর চেহারায় যেন আবার যৌবনের চমক দেখতে পারি।'

ডাক্তার এসে মার্টিনাকে কস্তন্তীনের ওপর থেকে উঠালো। কস্তন্তীনের নাড়ি দেখে নিলো আগে। এ সেই ডাক্তার যে মার্টিনার ইঙ্গিতে হেরাকলকে চিকিৎসার আড়ালে বিষ দিয়েছিলো।

'কান খুলে শুনে নাও ডাক্তার!' মার্টিনা বেদনা কাতর ও কিছুটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'আমার ছেলেকে দ্রুত সুস্থ করে তোল। না হয় তোমাকে আমি জল্লাদের হাতে তুলে দেবো। বেঁচে থাকার জন্য তোমাকে ছেড়ে দেবো না। এ মুহূর্তে আমি আমার ছেলের জীবন ফিরে পেতে চাই।'

কামরায় যে কয়জন জেনারেল ও উচ্চ পদস্থ লোকেরা ছিলো তারা মার্টিনার এই আবেগভরা ব্যাকুলতা দেখে হয়রান হয়ে গেলো। মার্টিনার দু' চোখে যেন অশ্রুরবান ডেকেছে। তার কান্না দেখে ওখানকার সবার চোখ ভিজে উঠলো।

সবাই তো জানতো, মার্টিনা তো কস্তন্তীনের চরম শত্রু। তিনি তো সব সময় কামনা করেন, কস্তন্তীনের মৃত্যু। যাতে তার ছেলে হারকিলিউনাসকে বিনা বাঁধায় রাজার আসনে বসানো যায়।

'আশা করি ঔষধগুলো ঠিক মতো সেবন করালে দ্রুতই আরোগ্য লাভ করবেন।' ডাক্তার তার জন্য ঔষধ দিয়ে মৌখিক সান্ত্বনা দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো।

'আমি এই ডাক্তারকে আরেকবার সতর্ক করে দিচ্ছি।' ডাক্তার বের হয়ে যেতেই মার্টিনা একথা বলতে বলতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন। 'সে যদি মনোযোগ দিয়ে চিকিৎসা না করায় তাকে আমি জীবিত ছাড়বো না।'

ডাক্তার ধীরে ধীরে হাটছে আর ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। ডাক্তার নিশ্চিত জানে মার্টিনা তার পেছন পেছন আসবে। একটু পরই মার্টিনাকে দেখা গেলো। ডাক্তারের রুখ ঘুরে গেলো মার্টিনার শাহী কামরার দিকে।

সেই কামরায় ডাক্তার আগে ঢুকলো। তারপর ঢুকলো মার্টিনা। এরপর ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

'কী দিয়ে এসেছো?' মার্টিনা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে?'...

'না, ডাক্তার এক গালে হেসে বললো, 'কস্তন্তীনের রোগের ধরনটা কি তাও নির্দিষ্ট করে বুঝা যাচ্ছে না। তবে বুকের অবস্থা খুবই খারাপ। বড় কষ্টে কিছুটা সুস্থ হতে পারে। তবে খুব বেশি আশাও করা যায় না'।...

মার্টিনাকে তার বাহুবন্দি করে নিজের এক গাল মার্টিনার মুখের সঙ্গে লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওহে সম্রাজ্ঞী! তুমি কি চাও তা কি বলবে না?'

'তুমি কি তা জানো না?' মার্টিনা উল্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি তাই চাই যা হেরাকলের অুসস্থতার সময় চেয়েছিলাম। তার চিকিৎসাও সেভাবেই করো।...ওকে খুব দ্রুত এবং খুব যত্নের সঙ্গে ওর বাপের কাছে পাঠিয়ে দাও। সেই পর জগতেই তার বাপ তাকে সিংহাসনে বসাবেন।'

'চমৎকার বলেছো, আজ তো ওকে আমি সঠিক ঔষধই দিয়েছি। তবে কাল থেকে ওর বাপের মতোই সেরা চিকিৎসা সে পাবে।'

'তবে খুব দ্রুত।'

'বেশি তাড়াতাড়ি হলে আমরা ধরা পড়ে যাবো।' কয়েকটি দিন যেতে দাও তাড়াহুড়া করলে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। তোমার মনের খাহেস অবশ্যই আমি পূর্ণ করবো। তবে কিছুটা রয়ে সয়ে কাজ করতে দাও।'

মালিকায়ে মার্টিনা তাকে সোনার দুটি বড় বড় টুকরো দিলেন।

'এতটুকুই যথেষ্ট নয়। তুমি তো জানোই আমার আরো নজরানা চাই।'

'তাও পেয়ে যাবে।' মার্টিনার মুখে শয়তানি হাসি খেলে গেলো। 'রাতে আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী নজরানা পাঠিয়ে দেবো।'
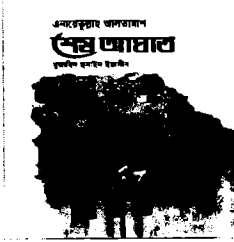
নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, এই ডাক্তার সাত আট দিন কস্তন্তীনের চিকিৎসা করে। প্রতিদিনই এসে তাকে দেখে এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে এই সান্ত্বণাও দিতো,

'আপনি খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।'

একদিন ডাক্তার কস্তন্তীনকে ঔষধ দেয়ার সময় মার্টিনাও সেখানে উপস্থিত রইলেন। প্রতি দিনের মতো ডাক্তারকে হত্যার হুমকি ধমকি দিতে লাগলেন। ডাক্তার কাতর ও জড়ো সড়ো হয়ে মাথা নিচু করে রাখলো, যেন ভয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে।

'আমি হয়তো আর কোন দিন সুস্থ হবো না।' কস্তন্তীন ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, আমার রোগ আসলে শারীরিক নয়। যে চরম যখম হয়েছে আমার অন্তর-এর কোন চিকিৎসা নেই।

মার্টিনা যেন ফুপাতে ফুপাতে তার ওপর গড়িয়ে পড়লেন। দুঃখে বেদনায় আকুল হয়ে কস্তন্তীনকে চুমু খেতে লাগলেন।

'বেটা আমার! মার্টিনা দু চোখে অশ্রুসিক্ত করে বললেন, 'আমার ছেলে! এমন কথা মুখেও এনো না। আমার মন এভাবে কেটে টুকরো করে দিয়ো না। তাহলে তো আমিও বাঁচবো না রে বেটা।'

কস্তন্তীনের চোখও ছলো ছলো হয়ে উঠলো।

'বেটা! তুমি অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে। নিজেকে এমন হতাশ মনে করো না" মার্টিনা বললেন।

কস্তন্তীনের জন্য যদি কেউ সত্যিকার অর্থে বেদনাহত হয়ে থাকে সে হলো তার যুবক ছেলে কোস্তানিস। সে জানে তার বাপ যে আঘাত পেয়েছে মানসিকভাবে এটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে।

হেরাকল যেভাবে কস্তন্তীনকে অনেক বড় যোগ্য জেনারেল করে তুলে কোস্ত নিসকেও তেমন যোগ্য করে গড়ে তোলে কস্তন্তীন। এই চিন্তাও কস্তন্তীনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে যে, হেরাকল ও কস্তন্তীনের পর সিংহাসনের উপযুক্ত এবং সত্যিকার দাবীদার তো কোস্তানিসই। কিন্তু মালিকায়ে মার্টিনা কঠিন শিলা পাহাড় হয়ে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

কস্তন্তীন কেন শাহী খান্দানের সবাই জানে, মার্টিনার ছেলে হারকিলিউনাস বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতা তো দূরের কথা শাহী মহলেও থাকার উপযুক্ত নয়। তার ছেলে যে এক আওয়ারা শাহজাদা-এতো মার্টিনাও মনে মনে স্বীকার করেন।

বাপের এই অবস্থার কারণে কোস্তানিস ইদানিং মীরার সঙ্গে দেখা করতে পারছে না। মীরা শাহী মহলের মেয়ে হলেও কস্তন্তীন যে কঠিন রোগে আক্রান্ত সেটা সে জানে না। সেটা তার জানার কথাও নয়। কারণ, শাহী মহলের কারো অসুস্থতার খবর কাউকে জানতে দেয়া হতো না। রাজরাজাদের নিয়ম এটা।

একদিন শাহী মহলের এক মধ্য বয়স্কা পরিচারিকা কোস্তানিসকে এসে জানালো, মীরা আজ রাতে অমুক সময় অমুক জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করবে।

'মীরাকে গিয়ে বলো আমি সময় মতো এসে যাবো।' কোস্তানিস পারিচারিকাকে কিছু বখশিষ দিয়ে বললো।

রাতে শাহী মহলের বাগানের এক কোণে দুজনের সঙ্গে দুজনের দেখা হলো। কোস্ত ানিসকে দেখে মীরা তার বুকে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো যেন হারানো স্বামীকে তার স্ত্রী বহু দিন পর খুঁজে পেয়েছে। মীরার মনে হলো কোস্তানিস কিছুটা চিন্তিত এবং অন্যমনস্ক।

'আমার কাছে এসে তুমি এমন উদাস ও অন্যমনস্ক হয়ে গেলে কেন?' মীরা জিজ্ঞেস করলো কোস্তানিসকে।

'আমার বাবা বড়ই অসুস্থ। দিন দিন তার অবস্থা খারাপের দিকেই যাচ্ছে। বাঁচে কি না খোদাই জানেন।' বলতে বলতে কোস্তানিসের গলা ধরে এলো।

মীরা ব্যকুল হয়ে এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেললো,

'কী অসুখ? কবে থেকে তিনি অসুস্থ?..তার চিকিৎসা করছে কে?'

'সেই ডাক্তারকে তুমি মনে হয় চেনো। এই ডাক্তারই আমার দাদা হেরাকলের চিকিৎসা করেছে।'

'না...না, এ হতে পারে না।' মীরা ভীষণভাবে চমকে উঠে কোস্তানিসের কাঁধ খামচে ধরে তীব্র সুরে বললো, 'আজই সেই ডাক্তারকে সরিয়ে দাও তার জায়গায় অন্য কোন ডাক্তারের চিকিৎসা করাও।...

'তুমি আগেও আমার কথা বিশ্বাস করোনি এবং উড়িয়ে দিয়েছিলে। এই ডাক্তার যখন শাহে হেরাকলের চিকিৎসা করেছিলো তখনো তোমাকে বলেছিলাম ডাক্তার ভুল চিকিৎসা করাচ্ছে। ভুল ঔষুধ দিচ্ছে। সম্ভবত: সেই ঔষধে বিষ মেশানো থাকে। তুমি আমার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলে। আর এর কয়েকদিন পরই তোমার দাদার মৃতু হয়।'...

'আজো আমি বিশ্বাস করি , সেই ডাক্তারই শাহে হেরাকলকে বিষাক্ত ঔষধ দিয়ে মেরে ফেলেছে। তোমার বাবাকেও এভাবে মেরে ফেলবে। এটা মালিকায়ে মার্টিনার চক্রান্ত। তোমার বাবাকে মেরে তার ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে। তোমার বাবাই তো তার পথের সবেচেয়ে বড় কাঁটা।'

কোস্তানিস আগের মতো এখনো মীরার কথায় খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছিলো না। কিন্তু মীরার অন্তরে কোস্তানিসের যে উন্মুক্ত ভালোবাসা আর প্রেম তার উক্ত আচে অবশেষে কোস্তানিস মীরার কথা মানতে বাধ্য হলো।

পর দিন সকালে কোস্তানিস তার বাবা কস্তন্তীনকে বললো সে বর্তমান ডাক্তারকে বদলাতে চায়। সে তার বাপকে আর কোন কথা বললো না। মীরার সন্দেহ বরং তার নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা তার বাবার কান পর্যন্ত পৌছালো না।

কস্তন্তীন তো অনেক আগেই নিজের সুস্থতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। তাই নিজের ছেলেকে অনুমতি দিয়ে দিলো ডাক্তার পাল্টানোর।

কোস্তানিস নিজে গিয়ে আরেকজন শাহী ডাক্তার নিয়ে এলো। এই ডাক্তারকে নিয়োগ দিয়ে আগের ডাক্তারের কাছে খবর পাঠিয়ে দিলো, তাকে আর চিকিৎসার জন্য আসতে হবে না।

নয়া ডাক্তার তিন চার দিন চিকিৎসা করলো। কিন্তু কস্তন্তীনের সামান্য উন্নতিও হলো না। দিন দিন রোগ বাড়তেই লাগলো।

একদিন কোস্তানিস নয়া ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলো,

'আমার বাবার সুস্থতার কি আসলে কোন আশা আছে?'

ডাক্তার নিজের ধারণা বা অনুমান কাউকে বলতে চাচ্ছিলো না। কিন্তু এখন বলে দেয়াটাই উপযুক্ত মনে করলো। ডাক্তার বললো,

'তোমার বাবার যে অবস্থা এটা বিষাক্ত বা ভুল কোন চিকিৎসায় কিংবা বিষাক্ত কোন জিনিস খাওয়ার কারণেই এ অবস্থা হতে পারে। তবুও আমি আমার সবটুকু অভিজ্ঞতা দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছি। তার শরীর থেকে যেন বিষের প্রভাব ক্রিয়া নেমে যায়।'

ডাক্তারের এই মন্তব্যের পর কোস্তানিসের মনে হলো মীরা তাহলে যে আশঙ্কা করেছিলো সেটাই সত্য।

নতুন ডাক্তার তার জীবনের সব অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে চিকিৎসা চালিয়ে গেলো। ডাক্তার দিন রাত একাকার করে কস্তন্তীনের কামরায় উপস্থিত রইলো বেশ কয়েকদিন।

এত কিছুর পরও একদিন কস্তন্তীনের অবস্থা এতটাই বিগড়ে গেলো ডাক্তার আর কিছুই করতে পারলো না।

কস্তন্তীন মারা গেলো। কস্তন্তীন তার বাবা হেরাকলের মৃত্যুর পুরো একশ দিন পর মারা গেলো।
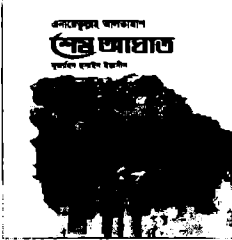
রোম হাতছাড়া হওয়ার পর মিসরে একের পর এক পরাজয়ের তিক্ত সংবাদ যখন রোমীদেরকে ক্রামগত আঘাত হেনে যাচ্ছে সেখানে কস্তন্তীনের মৃত্যু রোমীদের জন্য ছিলো দ্বিতীয় ধাক্কা। রোমীয়রা এখনো হেরাকলের মৃত্যুর শোক ভুলে উঠতে পারেনি।

শাহ হেরাকলের পর কস্তন্তীনই রোমীয় শাহী খান্দানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মহল ষড়যন্ত্র, শাহী খান্দানের বিপর্যয় ইত্যাদি যাই হোক কস্তন্তীনকেই

সাধারণ মানুষ হেরাকলের আসল স্থলাভিষিক্ত মনে করতো। সঙ্গে সঙ্গে পিতার সমতুল্য জেনারেলও মনে করতো সবাই।

কস্তন্তীনের মৃত্যুর খবর খুব দ্রুত বযনতিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। সব জেনারেল ও মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা সংবাদ পেয়েই কস্তন্তীনের মহলে ছুটে এলো। সবার আগে এলেন কীরাস।

এমন আকস্মিক শোকে সবাই যেন পাথর হয়ে গেছে। বিশেষ করে তার ছেলে কোস্তানিস বেশ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। কিন্তু মালিকায়ে মার্টিনা এমন শোক স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন তার পেটের ছেলে মারা গেছে। কান্না ছাড়া কোন কথাই বলতে পারছিলেন না।

কান্নাসিক্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে এমনভাবে এটা ওটার হুকুম দিতে লাগলেন যেন তিনিই এখন রোমের সম্রাজ্ঞী।

কস্তন্তীনের ছেলে কোস্তানিস নির্বাক হয়ে এক দিকে বসে আছে। তার চোখে মুখে শোকের গভীর ছায়া থাকলেও মুখের পেশীগুলো টান টান হয়ে আছে। সেটা যে ক্ষোভ আর আক্রোশের কারণে এটা চেহারা পড়লেই বুঝা যায়।

যুবক শাহজাদা কোস্তানিস। নিজের অদৃশ্য রাগকে সামলে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

জেনারেল, বড় বড় হাকিমরা, ওযীর মন্ত্রীরা, বড় বড় শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞজনরা এবং শীর্ষ প্রজ্ঞাজনরা একে একে কাতারবন্দি হয়ে কস্তন্তীনের লাশের সামনে দিয়ে যাচ্ছে এবং উচ্চ কিংবা অনুচ্চ শব্দে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু বলছে।

'আজ রোমের ইস্কান্দারে আজম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন।'

'সালতানাতে রোম এক কিংবদন্তী জেনারেল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।'

'রোমের শত্রুদের জন্য কস্তন্তীনের নাম ছিলো এক ত্রাস।'

'কস্তন্তীন মরতে পারে না। তার আত্মা সালতানাতে রোমের দুশমনদের ধ্বংস করে দেবে।'

'কস্তন্তীন কোস্তানিসের রূপে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।'

'এক মহান জেনারেল এমন সময় চলে গেলেন যখন রোমের জন্য তার উপস্থিতি বড় প্রয়োজন ছিলো।'

'কস্তান্তীন ছাড়া সালতানাতে রোম তো অর্থহীন হয়ে পড়লো।'

'কস্তন্তীন ছিলেন রোমকদের গর্ভ আর অহঙ্কারের প্রতীক।'

'কস্তন্তীনবিহীন সালতানাতে রোম যেন খুঁটিবিহীন ঘর।'

মালিকায়ে মার্টিনা শোকে বিহ্বল হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছেন। তার কাঁধ সামনের দিকে এমনভাবে ঝুকে রয়েছে যেন বড় কষ্টে তিনি এই শোকের আঘাতের বোঝা কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন।

তিনি দেখলেন সবাই কস্তন্তীনের লাশের সামনে দিয়ে যাচ্ছে আর কিছু না কিছু বলছে। মার্টিনাও কস্তন্তীনের লাশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন,

'হে খোদা! তুমি আমার একমাত্র ছেলে হারকিলিউনাসের প্রাণ নিয়ে নিতে। কস্তন্তীনকে জীবিত রাখতে আমি আমার পুত্র হারানোর শোক সয়ে যেতাম। কিন্তু কস্তন্তীনের শোক তো আমি সইতে পারছি না।'

'তুমি এক মিথ্যাবাদী ও প্রতারক নারী!' কোস্তানিস উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত ও উঁচু গলায় বললো, 'মার্টিনা আমার বাবাকে তুমিই বিষ দিয়ে মেরেছো। আমার দাদা হেরাকলকেও তুমি বিষ প্রয়োগ করে মেরেছো। তোমার চোখে যে অশ্রু সেটা আসলে হিংস্র খুনির চোখের পানি।'
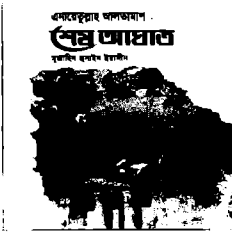
আকাশের দিকে উত্তোলিত মার্টিনার হাত দুটো নিচে নেমে এলো। তিনি কিছুই বলতে পারলেন না।

সেখানে যারা এসেছিলো সবার সাড়া শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। কোস্তানিস যা বললো, সেটা ছিলো অনেক বড় অপবাদ। এই নিঃশব্দ থেকে কত বড় তুফান পাকিয়ে উঠবে সেটা অনুমানও করা যাচ্ছে না।

কীরাস একটা চেয়ারে বসা ছিলেন। উঠে ছুটে গেলেন কোস্তানিসের দিকে। কোস্তানিসকে ধরে সস্নেহে জড়িয়ে ধরলেন।

'আমার প্রিয় বেটা!' কীরাস নরম সুরে কোস্তানিসকে বললেন, 'অসহনীয় এক শোকতপ্ত অবস্থায় তুমি রয়েছো। এ সময় ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়। এ ধরনের অর্থহীন কথা মুখ থেকে বের করো না।'

'আমি যা কিছু বলছি সজ্ঞানে ও ঠাণ্ডা মাথায় বলছি।' কোস্তানিস এক ঝটকায় কীরাসের হাত থেকে ছুটে বললো,

'ঐ প্রতারক নারী আমার দাদা ও আমার বাবাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করেছে। সে সালতানাতে রোমের রগ রেশায় হাড়-মজ্জায় বিষ ঢেলে দিয়েছে।'

সেখানে হারকিলিউনাসও রয়েছে। কোস্তানিসের কথা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালো এবং তলোয়ার বের করে ফেললো।

'আমার মায়ের ওপর এত বড় অপবাদ।' হারকিলিউনাস চ্যালেঞ্জ করলো 'এদিকে আমার সামনে আয়। আমি তোকে এই অপবাদের জবাব দিচ্ছি।'

কোস্তানিস তো আগে থেকেই রাগে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। সেও তলোয়ার বের করে হারকিলিউনাসকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লো।

এ সময় এক বর্ষীয়ান লোক দৌড়ে এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়ালেন। সঙ্গে কীরাসও ওখানে এসে গেলো। এরা না এলে দুই শাহজাদা এতক্ষণে রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেতো।

'থামো তোমরা!' মার্টিনা বড়ই গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমার হুকুম মানো তোমরা দুজন। তলোয়ার কোষ বন্ধ করো।'

'তুমি সালতানাতে রোমের মালিকা নও।' কোস্তানিস দাঁত কিড়মিড়িয়ে বললো, 'তুমি মালিকা এমন কোন শাহী ফরমান জারি হয়নি। কে সিংহাসনের উত্তরাধিকার হবে এর ফয়সালা এখনো হয়নি। হুকুম দেয়ার অধিকার আমারও আছে।'

ওখানে যারা আছে সবাই দেশের উচ্চপদস্থ হর্তা কর্তা। দায়িত্বশীল সবাই। পরিস্থিতির নাজুকতা সবাই বুঝতে পারছে। সবাই নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

দুই শাহজাদার মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। এক বিশাল হট্টগোলের মতো অবস্থার সৃষ্টি হলো।

কোস্তানিসকে কেউ শান্ত করতে পারছে না। সে বার বার বলছে, ঐ ছেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছে। আর ঐ চরিত্রহীন মহিলাকে বলো নিজেকে যেন মালিকায়ে রোম না বলে।...

দু জনকে বেশ দূরত্বে বসিয়ে দেয়া হলো।

যে বর্ষিয়ান লোকটি সবার আগে দুই শাহজাদার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি সবার মধ্যমনি হয়ে সবাইকে হাত নেড়ে নেড়ে শান্ত করতে লাগলেন। বাধর্ক্যের অশক্ত হাত বার বার কেঁপে উঠছে।

তার শ্বেত-বাদামী বর্ণের চেহারার গভীর রেখাগুলো বলছে এগুলো পার্থিব লীলা খেলার সাক্ষী হয়ে আসছে শতবর্ষ ধরে। শাহী খান্দানের নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোন সদস্য তিনি।

তার গলার আওয়াজে বার্ধক্যের কম্পমান গাম্ভীর্যতা ছাড়াও একটা গভীর আন্তরঙ্গতার পরশ সবার মন ছুয়ে যাচ্ছে। শাহী মহলে নিশ্চয় আগ থেকেই তার বেশ প্রভাব ছিলো। তার কথায় সবাই নীরব হয়ে গেলো।

'তোমরা সবাই আজ ব্যক্তিত্বহীন হয়ে গেছো;' এই শুভ্র কেশধারী বৃদ্ধ বললেন, 'আজ আমি এমন কথা বলবো যা কোন প্রজা শাহী মহলে দাঁড়িয়ে বলার কল্পনাও করেনি কোন দিন। তোমরা একে অপরের রক্ত ঝরানোর আগে আমার কথাগুলো শুনে নাও। তারপর তোমরা তোমাদের তলোয়ার আমার বুকে গেঁথে দিয়ো।...'

'সবাই মনে হয় জানো শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে আমার বয়স। তোমরা সবাই এও দেখেছো, সালতানাতে রোম রোমসাগর পেরিয়ে মিসর, শাম ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিলো। তারপর পালা ছিলো আরবকেও রোমের সীমানাভুক্ত করার। শাহে হেরাকল বলতেন, পারস্যকে পদানত করে রোমের সালতানাত হিন্দুস্তান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে।...'

নিজেদের সালতানাতের এই শক্তিমত্তা তোমরাও দেখছো। এই সালতানের পরিধি বাড়ানোর জন্যই হেরাকল কায়সারে রোম ফোকাসের গদি উল্টিয়ে ছিলেন। সে সময়টা আমার খুব ভালো করেই মনে আছে। ফোকাস ভোগবিলাসে ডুবে যাওয়া এক বাদশাহ ছিলেন। তিনি নিজেই সালতানাতে রোমের জন্য অনেক বড় বিপদের কারণ হয়ে উঠেছিলেন।'...
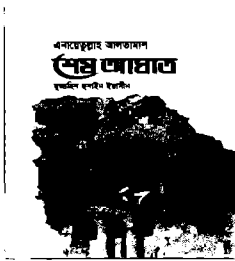
বলতে বলতে শতবর্ষী এই বৃদ্ধের গলা শুকিয়ে এলো। চেয়ে এক গ্লাস পানি পান করে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন,

'হেরাকল তো ছিলেন একজন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ জেনারেল। তিনি কৌশলে শাহে ফোকাসকে গ্রেফতার করেন এবং হত্যাও করেন। তারপর বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। তার সাফল্য আর বিজয় ধারা তোমরা তো দেখছোই।'...

'হেরাকল অগ্নিপূজারীদেরকে মিসর থেকে তাড়ালেন। তারপর শাম থেকে বেদখল করলেন। তারপর ইরাক থেকে তাড়ানোর পালা ছিলো। একাজ আরবের মুসলমানরা করে দিয়েছে। আরবদের শক্তিই বা কী ছিলো? হেরাকল বলতেন, এই মুষ্টিমেয় আরবকে এক চড়েই আরবে পাঠিয়ে দিবেন। কিন্তু এরপর কী হলো?'...

এই গুটি কয়েক আরব সালতানাতে রোমের ওপর বজ্র নিনাদ হয়ে চেপে বসেছে। কেন? কীভাবে? ওদের কাছে কী জাদু ছিলো? যার শক্তিতে ওরা আমাদেরকে শাম থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে এবং মিসরও প্রায় জয় করে নিয়েছে?'...

'অন্য দিকে পারসিকদেরকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে।'...

'আমি তোমাদেরকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। এর উত্তর না শুনলে তোমাদের আরো পস্তাতে হবে। আমাদের ধ্বংসের প্রথম কারণ হলো, হেরাকল আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন। ধর্মে অধর্ম মিশ্রণ করে ঈসা মসীহকে তিনি ধোকা দিয়েছেন। এর

পরিণামে ধর্ম দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একজন মান্যবর আসফাকে আজম ছিলেন। তারপর হেরাকল আরেকজন আসফাকে আজম নিযুক্ত করেন।'...

'সালতানাতে রোমের ওপর শাহে হেরাকলের এই পাপের অভিশাপ পড়েছে। হেরাকলের বানানো আসফাকে আজম আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তিনি নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হবেন।'

'আমার কাছে তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি নয়, সালতানাতে রোমের সম্ভ্রমবোধ অনেক বেশি প্রিয়। আশা করি, কীরাস অস্বীকার করবেন না। তিনি মানব হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে হেরাকলের সরকারি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রজাসাধারণকে বাধ্য করেন।...'

'ঈসা মসীহ আমাদেরকে প্রেম-ভালোবাসার পয়গাম দিয়েছেন। শাহে হেরাকল এবং কীরাস নিরাপদ ও সত্যিকার ধর্মানুরাগীদের নির্বিচারে রক্ত ঝরিয়েছেন। আমাদের দুশমন যারা তারা তো দুশমন ছিলোই। ঘটনা হলো, আমাদেরই ভাই কিবতী খ্রিষ্টানরাও সালতানাতে রোমের দুশমন হয়ে গেলো।'

'জানো, আরবের মুসলমানরা কি করে এমন সাফল্য পেলো?' শতবর্ষী বর্ষিয়ান লোকটি একনাগারে বলে যাচ্ছেন, 'শুধু এজন্য যে, তারা নিজেদের ধর্মকে বিভক্তি মুক্ত রেখেছে। এক আল্লাহ ও তাদের এক কিতাবের অনুসরণ করেছে। তারপর সবার মধ্যে রয়েছে দারুন একতা ও ভালোবসার সম্পর্ক।'...

'আমি এটা বলতে যাবো না যে, মুসলমানদের ধর্ম সত্য। কিন্তু আমি এটা অবশ্যই বলবো যে, এই মুসলমানরা সত্যপ্রিয, নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের অনুরাগী। কোন ধর্মই রক্তপাত, জুলুম অত্যাচার ও জোরজবস্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করতে পারে না। আমি আমার বক্তব্যকে নিরপক্ষ রেখে বলবো, মুসলমানরা নিজেদের অসাধারণ চরিত্র মাধুরী দিয়ে অমুসলিমদেরকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।'...

'তোমরা দেখবে, পরবর্তী প্রজন্মও দেখবে এবং প্রত্যেক যুগের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধকারী ঐতিহাসিকরা অনগাত জাতিকে বলবে, যেদিন আমাদের মতো মুসলমানরাও নিজেদের ধর্মকে বহুকালে বিভক্ত করে ফেলবে সেদিন থেকেই তাদেরও পতন শুরু হয়ে যাবে।'

'তোমাদের নিশ্চয় এ অভিজ্ঞতা হয়েছে, ফেরকা বিভক্ত হওয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হয় সেটা হলো, নিজেদের শত্রুদেরকে চিহ্নিত না করে, তাদের থেকে নিজেদেরকে না বাঁচিয়ে বিভক্ত দলগুলো পরস্পরকে পরস্পরের দুশমন মনে করে নিজেদেরকে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে।..

তখনই বহিঃশত্রুরা তাদের ওপর সুযোগ বুঝে ঝাপিয়ে পড়ে।' 'আরো কয়েকশ বছর পর মুসলমানদের পরিণামও তাই হতে পারে। তারাও আমাদের মতো প্রতিটি ময়দানে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে।'

বর্ষীয়ান সেই ব্যক্তি আবারো কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিলেন। তিনি বলে যাচ্ছেন অক্লান্ত। সবাই শুনছেও পিনপতন নীরবতা নিয়ে।

'যে জাতির কর্ণধারদের মধ্যে ক্ষমতা আর নেতৃত্ব লাভের নিকৃষ্ট লোভ জন্মে যায় তাদের পতন অনিবার্য', বর্ষীয়ান বক্তা বলে যাচ্ছেন, 'আজ আমাদের মধ্যেও সেই নোংরা খেলা শুরু হয়ে গেছে। যে বাদশাহ মরে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত কে হবে।'...

'তোমরা এটা মনে করো না, আমি বুড়ো বলে ঘরে বসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকি এবং আমার আশে পাশে কী হচ্ছে সেটা আমি জানতে পারি না। সালতানাতে রোমের মধ্যে আমার অন্তরাত্মা প্রোথিত হয়ে আছে। আমার ব্যক্তিগত সোর্স সব সময় তৎপর থাকে এবং প্রতিটি খবর আমার কাছে পৌঁছে দেয়।'...

'আমি জানি, শাহী মহলে কী সব নাটক হর হামেশা রচিত হচ্ছে। তোমরা সিংহাসনের লোভে একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করছো এবং তোমাদের তলোয়ারও পরস্পরের বিরুদ্ধে আজ কোষমুক্ত হয়ে পড়েছে।'...

'কিন্তু আরবীয় মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের কোন বিরোধ-বিদ্বেষ নেই। তাদের কোন সিংহাসনও নেই। নেই রাজমুকুটও। তাদের সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু এক আল্লাহ। যার হুমুক সবাই মেনে থাকে।...'

'আজ তোমরা তলোয়ার দিয়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সমস্যার সমাধান করা শুরু করেছো। আর এটাই এক ভয়ঙ্কর প্রথায় পরিণত হবে। আর শেষ হবে সেখানে যেখানে মুসলমানরা রোম সাগর পাড়ি দিয়ে এখানে এসে তাদের ঝাণ্ডা উড়াবে। আর তোমাদের 'তখত ও তাজ' রোম সাগরে ফেলে দেবে।'...

'এখন জটিল সমস্যা যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো, মার্টিনা নিজেকে সালতানাতে রোমের মালিকা বানিয়ে বসে আছেন। আর কোস্তানিস সন্দেহ করছে শাহে হেরাকল ও কন্তন্তীনকে মার্টিনা বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছেন। আমার মনে হচ্ছে এর কোন প্রমাণ নেই। এটা ভিত্তিহনি এক অভিযোগ।'...
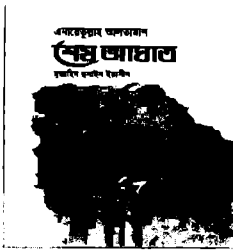
‘কোস্তানিস এই অভিযোগের প্রমাণ পেশ করুক’, এক জেনারেল যে মার্টিনার সমর্থক–উঠে দাঁড়িয়ে এই আওয়াজ তুললো, ‘মালিকার ওপর এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা অতি জঘন্য এবং ভয়াবহ এক অপরাধ।’

তার কথা শেষ হতেই চার দিক থেকে একই আওয়াজ উঠতে লাগলো, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোস্তানিস প্রমাণ পেশ করুক।’

কয়েকটি আওযাজ এমনও উঠলো,

‘সে যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহলে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে তাকে খারিজ করে দেয়া হবে।’

‘আমি অবশ্যই প্রমাণ পেশ করবো।’ কোস্তানিস উঁচু আওয়াজে বললো, ‘কিন্তু তোমরা এটাও শুনে নাও, আমার পেশ করা সাক্ষীকে কেউ যদি হুমকি ধমকি দাও, ভয়, দেখাও কিংবা তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়, তাহলে আমি তার সঙ্গে তলোয়ারের ভাষায় কথা বলবো।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাক্ষীকে উপস্থিত করা হোক। এখানে তার অকপটে কথা বলার ও প্রমাণ পেশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে। কেউ তার দিকে চোখ রাঙ্গিয়েও তাকাতে পারবে না।’ মার্টিনার সমর্থকরা একথা বলে উঠলো।

ডাক্তার দুজনই ওখানে উপস্থিত রয়েছে। মার্টিনার ডাক্তার এবং পরবর্তীতে কোস্তানিসের নিয়োগ করা ডাক্তার দুজনেই এখানে শুরু থেকে ছিলো।

কোস্তান্তীন হরমের তিনটি মেয়েকে উপস্থিত করালো। এর মধ্যে একজন কোস্তানিসের অতি ঘনিষ্ঠজন মীরা। অন্য দুজনকে মার্টিনা সেদিন রাতে কীরাসকে খুশী করার জন্য তার কামরায় রাত কাটাতে পাঠিয়েছিলেন। হুকুম পেয়েই তারা এসে উপস্থিত হলো।

কোস্তান্তীন সবার আগে তার নিয়োগ করা নতুন ডাক্তারকে উঠে আসতে বললো, ‘আপনি সবার সামনে এসে বলুন, আমার বাবার চিকিৎসা করতে গিয়ে আপনি কি কি সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন এবং কী মন্তব্য করেছিলেন?’ কোস্তান্তীন তার ডাক্তারকে বললো।

ডাক্তার সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন,

'আমাকে যখন কস্তন্তীনের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয় ততদিন আরেকজন ছয় সাত দিন তার চিকিৎসা করে ফেলেছে। ইতোমধ্যে রোগীর অবস্থা অনেকটাই আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে। আমি রোগীর অবস্থা দেখেই নিশ্চিত হয়ে যাই রোগী ভুলে কোন বিষাক্ত জিনিস খেয়ে ফেলেছে কিংবা তাকে কোন বিষাক্ত জিনিস খাওয়ানো হয়েছে।'...

ডাক্তার কিছু প্রমাণ ও উদাহরণ পেশ করে বুঝালো, একমাত্র বিষ খেলেই এসব লক্ষণ দেখা যায়। এসব লক্ষণ কস্তন্তীনের মধ্যে স্পষ্ট ছিলো। যদি বিষপান করানোর পর পর তার চিকিৎসা করা হতো তাহলে বিষ নেমে যেতো। কিন্তু কস্তন্তীনের অবস্থা এমন পর্যায় গিয়ে পৌঁছলো যে, বিষ তার ক্রিয়া সারা দেহেই ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এ পর্যায়ে রোগী সবধরনের চিকিৎসার উর্ধ্বে চলে যায়।

এর ছ'দিন পরই তো রোগী মারা গেলো।

'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।' প্রথম ডাক্তার দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার শুরু করে দিলো। 'এলোক পেশাগত বিদ্বেষবশতঃ এসব কথা বলছে। মালিকায়ে মার্টিনার সঙ্গে আমার অধিক সুসম্পর্ক রয়েছে বলে এই ডাক্তারের মনে আমার বিরুদ্ধে ভীষণ রাগ জন্মেছে। তাই আমার ওপর এত বড় ভয়াবহ ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে।'

'তুমি এখন চুপ করে বসে থাকো।' সেই অশীতপর বর্ষীয়ান লোকটি বললেন, 'তোমারও জবানবন্দি নেয়া হবে। তখন যা ইচ্ছে তাই বলো। এভাবে আরেকজনের কথায় হস্তক্ষেপ করো না।'

'উপস্থিত সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও গভীর মনে চিন্তা করুন।' সেই প্রথম জবানবন্দিদাতা ডাক্তার বললো, 'আমি তো এটা বলিনি যে, এই ডাক্তারই হেরাকলকে বা কস্তন্তীনকে বিষ দিয়েছে। এই লোকের আগ বাড়িয়ে এত চেচামেচি ও আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা এটাই প্রমাণ করে যে, এ লোক জানতো, রোগীর মধ্যে বিষাক্ত কোন কিছু আছে বা সে নিজে রোগীকে বিষাক্ত কোন কিছু দিয়েছে।'...

'আমার কথায় কে কি মনো করলো না করলো এতে আমার কোন পরোয়া নেই। মানব সেবায় ব্রতী নিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের যে নৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে আমায় এ বিদ্যা শিখেছি তা অক্ষুণ্ন রাখতে আমি আমার জীবন দিতেও প্রস্তুত।'...

'আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো, যে রোগীর চিকিৎসা আমি শুরু করেছিলাম শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে আমি সুস্থ করে তুলতে পারিনি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মানুষের এক সময় চলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তার চলে যাওয়াটাকে আমি আমার চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় স্বাভাবিক বলতে পারছি না।'
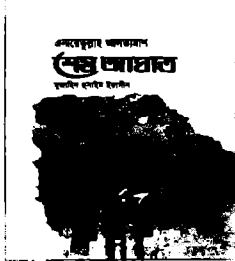
উপস্থিত সবার মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো। দ্বিতীয় ডাক্তার একথা বলে তার বক্তব্য শেষ করলো,

'এই শহরে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে। তাদেরকে ডাকিয়ে কোস্তান্তীনের লাশ দেখানো হোক। তারাই সনাক্ত করবে, লাশের বর্ণই বলে দিচ্ছে, এই মৃতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।'

এবার তো সবার মধ্যে বেশ অস্থিরতা দেখা দিলো। কোস্তানিস মীরাকে ডেকে সবার সামনে এনে দাঁড় করালো।

'মন থেকে সব ধরনের ভয়-ভীতি দূর করে দাও মীরা, কোস্তানিস অভয় দিয়ে বললো, 'আজ এখানে কোন সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী নেই। এখানেই যে বর্ষীয়ান ব্যক্তিত্বরা বসে আছেন আজ তাদেরই শাসন এখানে কার্যকর আছে।'

'সব ধরনের সিদ্ধান্ত আজ তারাই দেবেন। তুমি আমাকে সেই প্রথম ডাক্তারের যেসব কথা বলেছিলে সেটা সবিস্তারে সবাইকে শোনাও।'

মীরা একে একে সব বলে গেলো। মার্টিনা তাকে কেন এবং কী বলে সে রাতে ডাক্তারের শয়ন কক্ষে পাঠিয়েছিলো। ডাক্তার মদের নেশায় হেরাকলের চিকিৎসা সম্পর্কে কী বলেছিলো, সিংহাসন সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলো ইত্যাদি সবকিছু নির্ভয়ে বলে গেলো।

এমনকি মীরা যে সে রাতে ডাক্তারের হাত থেকে নিজের দেহ বাঁচিয়ে রেখেছিলো সেটাও বললো। মীরা অবশেষে বললো, ডাক্তার মদের নেশার ঘোরে বলেছিলো,

'শাহে হেরাকলের প্রাণ আমার হাতের মুঠোয়। আমি চাইলে কালই তার দেহ থেকে প্রাণপাখি বের করে দিতে পারি। কিন্তু যে কাজ ধীরে ধীরে হয় সেটাই সফলতার মুখ দেখে।'

তারপর হেরেমের অন্য দু'টি মেয়েও একে জানালো, ওদেরকেও মালিকায়ে মার্টিনা সে ডাক্তারের ঘরে এক রাতের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এই মেয়ে দুটিও মীরার মতো রূপসী।

'মালিকায়ে মার্টিনা!' সেই বর্ষীয়ান রোমীয় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কি আপনার কাছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আশা করতে পারি যে, আপনি এই মেয়ে তিনজনকে কেন ডাক্তারের ঘরে পাঠিয়েছিলেন?'
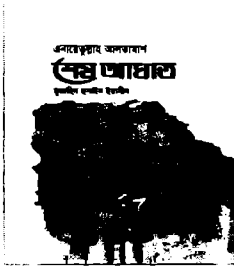
'আমি অস্বীকার করছি না।' মার্টিনা জবাব দিলেন, 'প্রথমবার আমি ডাক্তারকে এজন্য সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছি। যাতে ডাক্তার হেরাকলের চিকিৎসা পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে করে যায়।'...

'তারপর কন্তন্তীন অসুস্থ হলেও আমি এতই পেরেশান হয়ে যাই যে, ডাক্তারকে আবারও খুশি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম।'

'শাহে হেরাকলও মারা গেছেন এবং কন্তন্তীনও চলে গেছে।' আরেক বর্ষীয়ান পণ্ডিত দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনি যদি নিজেকে সম্রাজ্ঞী বলে দাবী করেন তাহলেও আপনার এই জবাবকে আমরা এজন্য মেনে নেবো না যে, আপনি সম্রাজ্ঞী বলে যা বলবেন তাই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে।...আপনার জবাবে এখানে কেউ সন্তুষ্ট হতে পারেনি।'

এসময় কোস্তানিস উঠে দাড়িয়ে সবাইকে হাত নাড়িয়ে নিশ্চুপ হয়ে যেতে অনুরোধ করলো।

'আমি এই বয়সেই এই দাবী করবো না যে, আপনাদের প্রবীনদের মতো আমি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী হয়ে গেছি।' কোস্তানিস বললো, 'আপনারা সবাই তো দেখতেই পাচ্ছেন, মার্টিনা ও ডাক্তার আমাদের অভিযোগ মানছেন না এবং মানবেনও না তারা।'...

'কিন্তু আমি নিশ্চিত, আমার দাদা হেরাকল ও আমার বাবাকে মার্টিনা ও ডাক্তার বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছেন। আমি এখন সবার কাছে এ অধিকার প্রয়োগের অনুমতি চাইবো যে, সত্য উদ্ঘাটনে আমি যা ইচ্ছা তাই করবো এখন এবং সবার সামনেই তা করবো।'

কোস্তানিসের কথায় সবার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস না জন্মালেও এতে সবাই নিশ্চিত যে, কোস্তানিস যা দাবী করছে তা ভুল নয়। এজন্য সবাই নীরব রইলো। এমনকি মার্টিনার সমর্থকরাও নিশ্চুপ রইলো।

কোস্তানিস শাহী মুহাফিজকে হুকুম করলো, দুটি ভীষণ শক্তিশালী ও তাগড়া ঘোড়া নিয়ে আসতে। সঙ্গে মোটা রশিও নিয়ে আসতে বললো। একটু পরই দুটি ঘোড়া নিয়ে এলো দুই ঘোড়সওয়ার। কোস্তানিস দুই ঘোড়ার জিনের সাথে দুটি রশি বেঁধে দিলো।

এর সামান্য কিছু সময় পরই দেখা গেলো, হেরাকল ও কোস্তান্তিনকে বিষ প্রয়োগ করা ডাক্তারকে টেনে হেচড়ে নিয়ে তার দু'হাত ও দু'পা ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা রশি দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

কোস্তানিস দুই ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়ায় চড়তে বলে উচু আওয়াজে বললো, 'তোমরা দু'জন আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষা করবে। আমি যখন হাত ওপরে উঠিয়ে নিচে নামাবো তোমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে।'

দুই ঘোড়ার মাঝখানে রশি দিয়ে বাধা ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাড়ালো কোস্তানিস।

'ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মরবে।' কোস্তানিস ডাক্তারকে বললো, 'সত্য বলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করো। মার্টিনা সম্রাজ্ঞী নয়। সে তোমার কিছুই করতে পারবে না। আমার একটি ইঙ্গিতেই তুমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

ডাক্তার দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে ডানে বামে দুই ঘোড়ার দিকে তাকালো। এরপর বড় করে দীর্ঘাশ্বাস ফেললো।

তারপর ডাক্তার গড় গড় করে সব বলে গেলো। সব শেষে বললো,

'হেরাকল বা কোস্তান্তিনের সাথে তো আমার ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা ছিলো না। এ পাপ আমাকে করিয়েছে মালিকায়ে মার্টিনা।'...

মার্টিনা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো,

'মৃত্যু ভয়ে ও' মিথ্যা বলছে। আমার বিরুদ্ধে এটা এক ষড়যন্ত্র। ও' চায় না আমি মালিকা হই।'

'এখনো তো ডাক্তারের জবানবন্দি শেষ হয়নি।' কেউ একজন উঠে দাড়িয়ে বললো, 'এখন আর মার্টিনার কোন কথা বলার অধিকার নেই। মার্টিনা অপরাধী...মালিকা নয়।'

মার্টিনা তখনো কিছু না কিছু বলছিলো। কিন্তু তার কথা কেউ শুনছিলো না। তাকে সবাই মিলে ধমকিয়ে চুপ করালো। ডাক্তারকে কথা পূর্ণ করতে বলা হলো।

'মার্টিনা আমাকে ভোগ করার জন্য শুধু হেরেমের মেয়েই দিতো না, বখশিষ হিসাবে স্বর্ণের টুকরোও দিতো। আমার ঘরে গেলেই তোমরা সেগুলো পাবে। এখন আমি এমন কিছু কথা বলবো, যা শুনে আপনারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারবেন। তবু সত্য যখন বলছি পুরোটাই বলবো।'...

'মার্টিনা নিজে বা নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য এমন পাগল হয়ে উঠে যে, নিজের অবস্থান নিজে ভুলে যায় এবং সাধারণ এক মেয়ের মতো তার দেহ আমার হাতে উঠিয়ে দেয়।...আমি তো তাকে আমার রক্ষিতা মনে করতাম।'

মার্টিনা আবার চিৎকার চেচামেচি শুরু করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে হারকিলিউনাস তলোয়ার কোষমুক্ত করে এই বলতে বলতে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে গেলো যে,

'এত বড় সাহস, আমার বিরুদ্ধে এমন জঘন্য অপবাদ।'

চার পাচজন হাকিম উঠে হারকিলিউনাসকে নিরস্ত্র করলো। কোস্তানিসের হাতের ইশারায় সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেলো।
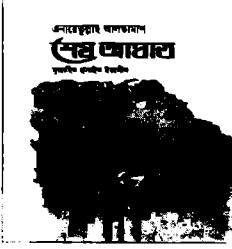
‘এখনো কোন সন্দেহ আছে যে, এই ডাক্তারই আমার বাবা ও দাদার হত্যাকারী? কোস্তানিস জিজ্ঞেস করলো এবং বললো, ‘সবাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।’

‘আর কোন সন্দেহ নেই। ডাক্তারই খুনী।’ অসংখ্য আওয়াজ উঠলো।

‘এই রক্তের বদলা নেয়ার অধিকার কি আমার নেই?’ কোস্তানিস জিজ্ঞেস করলো। তার সমর্থনে অনেকেই হ্যা হ্যা করে উঠলো।

এই ডাক্তার একাই খুশী নয়; কোস্তানিস বললো, ‘লোভে পড়েই সে এই কাজ করেছে।’ সে যদি শাহে হেরাকলকে সব বলে দিতো, তাহলে তিনি মার্টিনাকে জীবিত রাখতেন না। আর আমরাও আজ এভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হতাম না। আমি কি ঠিক বলিনি?’

‘একশবার ঠিক বলেছো।’ অসংখ্য কণ্ঠ শোনা গেলো।

কোস্তানিস দুই ঘোড় সওয়ারকে ঘোড়া ছুটাতে ইঙ্গিত করলো। দুই ঘোড়ার মুখ উত্তর ও দক্ষিণমুখী করা ছিলো। ঘোড়া দুটি দুদিকে তীব্র বেগে ছুট দিলো।

পিলে চমকে দেয়া ডাক্তারের চিৎকার বেরিয়ে এলো। সমবেত সবাই নির্বাক হয়ে দেখলো পলকের মধ্যে ডাক্তারের দুই কাধ থেকে দুই হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দুই পা পেটের অংশ নিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুই ঘোড়ার সঙ্গে চলে গেছে। পেছনে তার দেহের বিভিন্ন টুকরো পড়ে আছে।

ঘোড়া কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলো। কোস্তানিসের হুকুমে ডাক্তারের ছিন্ন ভিন্ন দেহের বিভিণ্ন টুকরো এক জায়গায় জমা করা হলো। কোস্তানিস এক মুহাফিজকে তিন চারটি শিকারী কুকুর নিয়ে আসতে বললো।...

একটু পরই দেখা গেলো, শিকারী কুকুরগুলো তিন চার মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের ছিন্ন ভিন্ন দেহ খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছে। রয়ে গেলো শুধু হাড়গুলো।

হেরাকল ও কস্তন্তীনের আসল খুনী সেই মার্টিনার কিছুই হলো না। হেরাকলের স্ত্রী হওয়াতে তাকে কোন ধরনের শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা বা সাহস কারো ছিলো না। তাছাড়া শাহী খান্দানের জন্য তো সাতখুন মাফ ছিলো। কিন্তু মার্টিনা রোমের সবচেয়ে ক্ষমতাধর বাদশাহ ও তার ছেলেকে হত্যা করিয়েছে।

তাই মার্টিনার জন্য শাস্তির ফয়সালা হলো যে, মার্টিনা কোন দিনই আর সম্রাজ্ঞী হতে পারবে না। এ ব্যাপারে তার কোন হস্তক্ষেপও চলবে না।

মার্টিনা এবারের মতো নিশ্চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু মার্টিনা তো নিশ্চুপ ও নিরস্ত্র থাকার মতো নারী নয়। কিছু দিনের জন্য মার্টিনা তার ফণা নামিয়ে নিলো।

কস্তন্তীনকে পর দিন দাফন করা হলো।

কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারের সমস্যার সমাধান হলো না। মার্টিনার সমর্থক জেনারেল ও আমলারাও মার্টিনাকে খুনী আখ্যা দিয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেলো। আর যারা তার বিরোধী ছিলো তারা তো তাদের পক্ষের ফৌজকে তার বিরুদ্ধে উস্কে দিলো। এজন্য ফৌজের মধ্যে বিদ্রোহের এক অস্থিরতা দেখা দিলো।

রোমের ইতিহাসে এই প্রথম মার্টিনা ও কোস্তানিসকে কেন্দ্র করে সারা দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধার লক্ষ্যণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

অধিকাংশ সেনাসদস্যই চাচ্ছিলো, কোস্তানিসকে সিংহাসনে বসানো হোক। কিন্তু কস্তন্তীনের মৃত্যুর বহুদিন পরও এর কোন সমাধান হচ্ছিল না।

ওদিকে মার্টিনাও চুপ করে বসে রইলেন না। তার ছেলে হারকিলিউনাসকে সিংহাসনে বসানোর জন্য দু'তিনজন জেনারেলকে আবার খরিদ করার চেষ্টা করতে লাগলো।
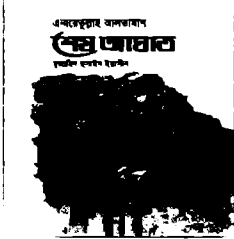
কীরাস ইচ্ছে করেই এখন মার্টিনা থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকছেন। গোপনে মার্টিনার সবচেয়ে বড় সহযোগী এই কীরাস। তিনি যখন শুনলেন, মার্টিনা আবারও ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করেছে তিনি মার্টিনার কামরায় গিয়ে একদিন হাজির হলেন।

'তুমিও আমার দুশমনদের সাথে হাত মিলিয়েছো কীরাস?' তোমাকে আমি কত ওপরে উঠিয়েছি তুমি সম্ভবতঃ সেটা ভুলে গেছো।' মার্টিনা রাগত কণ্ঠে কীরাসকে বললেন।

'এসব চিন্তা ভাবনা মন থেকে এখন দূর করে দাও মার্টিনা।' কীরাস শান্তগলায় বললেন, 'আগে পরিস্থিতি বিচার করো। এখানে কিবতী খ্রিষ্টান ও তাদের সহযোগীরা রয়েছে। হেরাকল আমার হাতে ওদের যে পাইকারী দরে হত্যা করিয়েছে সেটা তো ওরা ভুলে যায়নি।'...

'তোমার সাথে আমার সামান্যতম যোগাযোগ আছে এমন সন্দেহ কারো হলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে কতল করে দেবে। আমি চেষ্টা করছি সেনাসাহায্য নিয়ে মিসর অভিযানে চলে যাবো এবং ওখান থেকে মুসলমানদেরকে নিশ্চিত বের করে দেবো।'...

'মিসর যখন আমরা দখল করে নেবো তখন তোমার ছেলেকে ওখানে আমি রাজকীয় মুকুট দান করবো এবং আমরা নিজেরাই মিসর রাজ হওয়ার কথা ঘোষণা করবো। এজন্য ওখানে আমার অনেক কৌশল গ্রহণ করতে হবে।'...

দেখো কীরাস।' মার্টিনা বললো, 'আমার তো আর সিংহাসনে বসা হবে না। আমার ছেলেকে বসিয়ে দাও। পাহাড় পরিমাণ সম্পদ তোমার পায়ে এসে আছড়ে পড়বে। কিন্তু কোস্তানিস যদি সিংহাসনে বসে তাহলে আমি বলে দিচ্ছি, সে শুধু লা-পাত্তা হয়ে যাবে।'

'নিজেকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখো যেন তুমি মরে গেছো।' কীরাস বললো, 'হারকিলিউনাসকে সিংহাসনে বসাতে হলে কোস্তানিসকেও হাতে রাখতে হবে। আগে আমাকে এই বিদ্রোহ পরিস্থিতি শান্ত করতে দাও।'

কীরাস প্রথমে আমীর উমরা ও বড় বড় আমলাদের মধ্যে জোর তৎপরতা চালালো সিংহাসনের সমঝোতা ভিত্তিক সিদ্ধান্তের জন্য। তার পরামর্শে সর্বসম্মতিক্রমে ফায়সালা হলো, কোস্তানিস ও হারকিলিউনাস দুজনই সিংহাসনের রাজমুকুট পরবে। তবে দুজনের সিদ্ধান্তে কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হলে কোস্তানিসের সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য হবে।

এখন থেকে সিংহাসনের ব্যপারে মালিকায়ে মার্টিনার কোন হস্তক্ষেপ চলবে না।

প্রতিটি ঘরে এই শাহী ফরমান পৌছে দেয়া হলো।

এই শাহী ফয়সালা ও ফরমান জারী হওয়ার পর জনগণের মধ্যে এর দারুণ প্রতিক্রিয়া হলো। বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধের সব শঙ্কাই দূর হয়ে গেলো। এখন খোদ সেনাসাহায্যের জন্য প্রস্তুত করার স্বতঃস্ফূর্ত দাবী উঠলো, তাদেরকে যেন দ্রুত মিসর প্রেরণ করা হয়।

দ্বিতীয় শাহী ফয়সালা এই হলো যে, সেনাসাহায্য কীরাসের নেতৃত্বে মিসর যাবে। আর জেনারেলরা তাকে সব রকম সহযোগিতা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে কীরাসের নেতৃত্ব তারা সানন্দে মেনে নেবে।

এই ফয়সালাও কার্যকর হলো।

ব্যবিলন বিজয়ের পরপরই আমর ইবনুল আস (রা.) হযরত উমর (রা.) এর নামে পয়গাম লিখিয়ে পত্রদূতকে সেদিনই মদীনায় রওয়ানা করিয়ে দিলেন।

পয়গামে ব্যবিলন বিজয়ের সংবাদ ছাড়াও সেনা সাহায্যের আবেদনও ছিলো। পয়গাম আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রা. এর হাতে পৌছাতেই তিনি মদীনার সব মুসলমানকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করলেন।

সবাইকে ব্যবিলনের বিজয় সংবাদ শুনিয়ে বললেন, আমর ইবনুল আসের এখন কঠিন সেনা সাহায্যের প্রয়োজন। ব্যবিলনের বিজয় অলৌকিকতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। নেহায়েত হাতে গোনা সৈন্য নিয়ে যে অভিযান আমর ইবনুল আস (রা.) শুরু করেছিলো সেখানে এতগুলো সফল যুদ্ধের পর আর কতজন সৈন্য তার হাতে থাকতে পারে?

মুসলমানদের তখনো বেতনভুক্ত সেনাবাহিনী পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটানো হয়নি। সেনাবাহিনীতে লড়াকু লোকজন স্বেচ্ছাকর্মী হয়ে যোগ দিতো। তারপর তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দুর্ধর্ষ সেনায় রূপান্তরিত করা হতো।

আমীরুল মুমিনীন উমর রা. এর মিসরের উদ্দেশ্যে সেনা সাহায্যের জন্য ঘোষণা দেয়ার পর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেনা সাহায্যের জন্য একদল স্বেচ্ছাকর্মী প্রস্তুত হয়ে গেলো। মদীনা থেকে দূরদুরান্তের লোকজনও এতে যোগ দিয়েছে। এই সেনাদল এখন আমীরুল মুমিনীনের হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

ইতিমধ্যে আমর ইবনে আসের পয়গামের জবাব লিখিয়ে আমীরুল মুমিনীন পত্রদূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাতে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে অভিযান পরিচালনার অনুমতি রয়েছে।

সিপাহসালার আমর ইবনে আস রা. আমীরুল মুমিনীনের জবাবী পয়গামের অপেক্ষায় রইলেন। মিসর সম্পর্কে তো সিপাহসালার ইবনে আসই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনিই জানেন কে কোথায় কোচ করলে মুসলমানদের সুবিধা হবে। কিন্তু তিনি আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ছাড়া কোথাও এক কদমও আগে বাড়েননি।

ইতিহাসের কোথাও এটা স্পষ্ট তথ্য নেই যে, মদীনার সেনা সাহায্য ব্যবিলনে কবে পৌছেছিলো। তাতে কতজন সেনা ছিলো তারও উল্লেখ নেই কোথাও।

মদীনার পয়গাম আসার পর আমর ইবনে আস (রা.) সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করিয়ে দিলেন, পরের দিন ঘোড় দৌড়ের ময়দানে সমবেত সেনাদলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হবে। এ ঘোষণা শুনতেই মুসলিম সেনাদলের মধ্যে উচ্চাসনের একটা তাজা আবাহ বয়ে গেলো।

কারণ, তারা তো সবাই ব্যবিলন থেকে ইস্কান্দারিয়া অভিমুখে অভিযানের জন্য মুখিয়ে আছে।
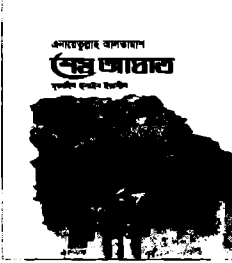
পরদিন আমর ইবনুল আস রা. সমবেত মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে উদার কণ্ঠে বললেন,

'হে ইসলামের অকুতোভয় মুজাহিদরা, আমি এটা শুনে সীমাহীন আনন্দিত যে, তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে দুশমনের ওপর চূড়ান্ত আঘাত করার জন্য ব্যকুল হয়ে আছো এবং আমার চেয়ে তোমাদের ব্যকুলতা অনেক বেশি।'

'মুজাহিদদের এমনই আবেগী মনোবল থাকা উচিত। কিন্তু আমি তোমাদের এই মনোভাবের প্রশংসার স্থলে বাস্তব একটা কথা বলবো, তোমাদের জোশ-উদ্বেলতা এবং পিছু হটতে থাকা শত্রুদলের পিছু ধাওয়া করার সংকল্প সত্যিই প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু আমি দেখেছি। অধিকাংশ মুজাহিদ শুধু এজন্য সামনে বাড়তে মুখিয়ে আছে যে,

'তারা নিজেদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়ে রেখেছে যে, তারা আর কোনদিন পরাজয়ের সম্মুখীন হবে না। আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে একের পর এক বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করে চলেছেন। আর উপর্যপুরি সাফল্য বিজয়ীদেরকে এমন নেশাকাতর করে তোলে যে, তারা বেপরোয়া হয়ে যায়। ওরা মনে করতে থাকে এই দুশমন আর কোথাও তাদের বিরুদ্ধে জমে লড়াইয়ের দুঃসাহস দেখাবে না।'....

'বিজয়ের নেশা যে ক্ষতি ডেকে আনে সেটা হলো, কোন লড়াইয়ে অতি মামুলি পরাজয় ঘটলেও মনোবল ও সংকল্প একেবারেই টুটে যায়। তাই মনে রেখো জয়ের সঙ্গে পরাজয়ও ওৎপেতে থাকে। যে কোন ময়দানে সেটার সম্মুখীন তোমরা হতে পারো। বাস্তবতা যেন তোমাদের কাছে উপেক্ষিত না হয়।'...

'মনে রেখো, দুশমন এখন পিছু হটতে থাকলেও কোথাও না কোথাও গিয়ে ওরা জমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং তোমাদের ওপর জবাবী হামলা চালাবে। তাই ওদেরকে ছোট করে দেখো না।'...

'এটা ঠিক যে, তোমরা রোমীয়দের ওপর তোমাদের চরম ভীতি ও আধিপত্য বিস্তার করেছো, কিন্তু এরপরও বাস্তবতা হলো, ওরা সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সংখ্যার বিচারে ওদের ধূলি ঝড়ের সামনেই তো আমাদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা।'

'রোমীয় জেনারেলরা আমাদের বিরুদ্ধে এখনো তাদের সৈন্যদেরকে কার্যকর কোন পন্থায় লড়াতে পারেনি। তাদের সেনাদলে এখনো এমন কিছু অংশ বা ব্যাটালিয়ন রয়ে গেছে। যারা আমাদের মুখোমুখি হয়নি। ওরা তোমাদের বীরত্বও দেখেনি এবং আমাদেরকেও ওদের বীরত্ব দেখায়নি। ওদেরকে যদি কোন অভিজ্ঞ জেনারেল কার্যকর পন্থায় ময়দানে ব্যবহার করতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা অস্তীত্বহীন হয়ে পড়বো।'...

'আমাদের সেনা সাহায্য আসলেও সেটা স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। অথচ রোমীয়দের অনেক বড় সেনাসাহায্য আসছে। তবে ওদের সেনা সাহায্য পৌছার আগেই আমরা ইস্কান্দারিয়া পৌছে যাওয়ার চেষ্টা করবো। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, এই দেশের মাটি দুশমনের। ওরা এর বালু -কনা পর্যন্ত চিনে। কিন্তু আমাদের জন্য এর পুরোটাই অজানা-অচেনা।'...
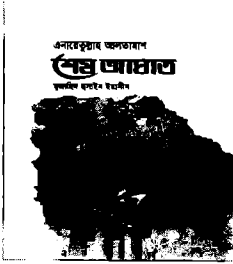
সিপাহসালার আমর ইবনুল আস (রা.) বলে যাচ্ছেন,

'আজ থেকে হাজার হাজার বছর পরও ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেবে, ব্যবিলনের দুর্গ ছিলো এক অজেয় দুর্গ। সেটা তোমরা জয় করেছো এটাও আপাত দৃষ্টিতে এক অবিশ্বাস্য সত্য।'...

'এর কয়েকটি কারণের একটি হলো, দুর্গে যে সব সৈন্য ও জেনারেলরা ছিলো তারা নিশ্চিন্ত ও চরম আত্মবিশ্বাসী ছিলো যে, এ শহর কেউ জয় কতে পারবে না। সামান্য কিছু মুসলমান এ দুর্গ জয় করবে এটা ওরা ঘুর্নাক্ষরেও কল্পনা করেনি। এ ধারণার কারণে ওরা প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতি যত্নবান ছিলো না।'...

'ওদের মতো তোমরা যদি এমন আত্মবিশ্বাসে ডুবে থাকো যে, তোমাদের কখনো পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হবে না। তাহলে পরম মুহূর্তেই পরাজয় তোমাদের গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসবে।'

'যতই আমরা অগ্রসর হচ্ছি প্রায় অনতিক্রম্য প্রতিকূলতায় পড়ছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয়ের আশা তো রাখতেই হবে, কিন্তু পরাজয়ের পরিণতির কথাও মনে রেখো। সর্বশেষ অজেয় শহর ইস্কান্দারিয়া এখন আমাদের গন্তব্য। যা কয়েকটি প্রদেশের সমান।'...

'ইস্কান্দারিয়া মিসরের হৃদয়। তাই রোমীয়রা এখন ইস্কান্দারিয়া রক্ষায় তাদের সবকিছু উজাড় করে দেবে। ওখানেই মুসলমানদের ওপর শেষ আঘাতটি হানবে ওরা। ইনশাআল্লাহ, আমরাও ওদের ওপর এবার আমাদের শেষ আঘাতটি করবো।'

'তাই ভেবে চিন্তে আমাদের কদম ফেলতে হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা হলো, তিনি তার পথের লড়াকুদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দান করেন।'

এর স্বপক্ষে তি নি পরিত্র কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করলেন।

ব্যাবিলনের লোকজন বিশেষ করে কিবতী খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের কাছ থেকে যে মনমুগ্ধকর আচার-ব্যবহার পেয়েছে এর দারুণ সুফল এখন মুসলমানরা পেতে শুরু করেছে। হেরাকল ও রোমীয়দের প্রধান আক্রমণের শিকার ছিলো কিবতীরা। আতঙ্ক ও সন্ত্রস্ততাই ছিলো ওদের জীবনের সঙ্গী।

মুসলমানরা ওদেরকে সুস্থির, নিরাপদ ও সম্মানের জীবনের স্বাদ এনে দেয়। ওরা তো এর পূর্বে বিজয়ী রোমীয়দের ভয়ে তো নিজেদের কিশোরী ও যুবতী মেয়েদেরকে লুকিয়ে ঝুকিয়ে জীবন যাপন করে এনেছে।

যে কোন সময় ওদের হাতে শীলতাহানি ও ধর্ষিত হওয়ার আশঙ্কায় ওরা সব সময় পালানোর পথ খোলা রাখতো। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে সেই আতঙ্কিত জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে। এক কথায় মুসলমানদের এমন অপ্রত্যাশিত আচরণে ওরা বিস্ময়বিষ্ট।

ওদের অবসর-আড্ডা এবং আলাপ চারিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে মুসলমান ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক।

'ভাই, মুসলমানরা মানুষ না। ফেরেশতা।'

যুবক-বৃদ্ধ এবং অধিকাংশের মন্তব্যই এমন।

'ইসলাম ধর্মই এমন যে, সাধারণ মানুষকে ফেরেশতাদের মতো নিষ্কলুষ বানিয়ে দেয়।'

'ওদের নবীও ছিলেন এমনই শ্রেষ্ঠ আদর্শের পতাকাবাহী।'

'সেই নবীর অনুসারীরাও তার আদর্শকেই একমাত্র জীবনের অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে।'

'এজন্যই ওদেরকে কেউ রুখতে পারে না।'

'যতদিন ওরা এ আদর্শ আকড়ে থাকবে কেউ ওদেরকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।'

'ওদের মূল প্রেরণা ও আদর্শের উৎস কী?'

'কেন ওদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআন ও ওদের নবী (সা.) এর অমূল্য বাণী হাদীস শরীফ।'

'কুরআন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ওদের কাছেই পাওয়া যাবে।'

'মুসলমানরা কি এই যুদ্ধ করতে এসেও পবিত্র কুরআন সঙ্গে রেখেছে?'

'কেন প্রতিদিন ভোরে কি ওদের কুরআন পাঠের মধুর গুঞ্জরণ শুনতে পাও না?'

'হ্যা, আমি একদিন শুনেছিলাম।'

'আমি একদিন না, কয়েকদিন শুনেছি।'

'আরে আমি তো প্রতিদিন শুনি। আমার কাছে এত ভালো লাগে যে, ওদের তেলাওয়াত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি উঠতে পারি না। ওরা যখন গভীররাতে উঠে আমিও তখন উঠে যাই। বলা যায়, আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। গত এগার দিন ধরে আমার এ অবস্থা চলছে।'

ব্যবিলনের ভেতরে বিশাল এক বাজারের পাশের খোলা মাঠে বসে কিবতী খ্রিষ্টানদের একটি দল এসব বলাবলি করছিলো। দেখতে দেখতে ওদের আড্ডার পরিসার বড় হতে লাগলো। শ'দেড়েক মানুষ জমে গেলো। সবাই কিবতী খ্রিষ্টান।

তাদের সবার মন্তব্যেই ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে উচ্ছসিত প্রশংসার সরল স্বীকারোক্তি ঝরে পড়ছিলো।
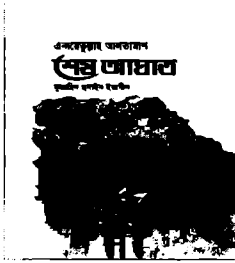
'আমরা শুধু ইসলামেরই প্রশংসা করছি। আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের কি কোন গুণাগুণ নেই?' কেউ একজন উচু গলায় বললো।

'এ কথার অস্বীকারই বা কে করেছে ভাই?' একজন উত্তর দিলো।

'ঈসায়ী ধর্মও সত্যধর্ম। কিন্তু ঈসায়ী ধর্মের অনুসারীরাই তাকে বিকৃত করেছে।'

'হ্যা, ভাই, অসংখ্য দলে বিভক্ত আজ ঈসায়ী/খ্রিষ্টধর্ম।'

'একমাত্র আমরাই আসল ঈসায়ীর ওপর প্রতিষ্ঠিত আছি। কিবতী খ্রিষ্টানরাই প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম।'

'খ্রিস্টানদের প্রত্যেক দলই যা দাবী করে, তবে আমি তোমাদের কিবতীদের খাটো করছি না এবং তোমাদের কিবতীদের নিয়মনীতি এখনো অনেকটা বাইবেলের মধ্যে লেখা আছে। তোমাদের আসফাকে আযম বিনয়ামীন ও সঠিক লোক। কিন্তু তার কাছেও আসল, অবিকৃত ইঞ্জিল বা বাইবেল নেই। সহিহ/বিশুদ্ধ বাইবেল অনেক আগেই ঈসায়ী পণ্ডিতরা এবং পাদ্রীরা নিজেদের মতো করে বিকৃত করে ফেলেছে। আমার মতো কথাটা তোমরাও জানো।'...

এক বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ একথা বললেন।

ব্যবিলনের সবাই তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। ধর্ম সমাজ ও বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় তাকে সবাই প্রায় 'আসফাক' এর আসনে বসিয়েছে। তার নাম যফীর বিন কুরতাস।

যফীরের কথায় মজমার সবাই নিরব হয়ে গেলো। সবাই তার দিকে সশ্রদ্ধ প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তিনি আরো কিছু বলবেন এমন প্রত্যাশাই সবাই করছেন।
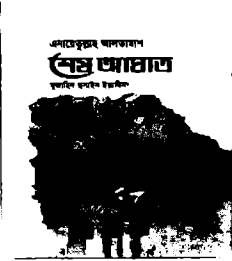
'এই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি কি জানো?' যফীর বিন কুরতাস বলে গেলেন।

'ওদের আসল শক্তি হলো কুরআন ও তাদের নবীর আদর্শগাথা।'

'আদর্শগাথা' বলতে কী বুঝাচ্ছেন? মান্যবর যফীর?' এক কিবতী জিজ্ঞেস করলো।

'আদর্শগাথা মানে হলো, তাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, বাণী, তার প্রতিটি নড়াচড়া, এমনকি তার নীরবতা-সরবতা, সম্মতি-অসম্মতি এবং তার জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা। যাকে মুসলমানরা 'হাদিস' বলে স্মরণ করে।'

'আমরা কি মুসলমানদের মতো আমাদের নবীর খাঁটি অনুসারী হতে পারি না?' কেউ একজন প্রশ্ন করলো।

'আমাদের বাইবেল কি কম শক্তিশালী/ আমাদের নবী ঈসা মসীহেরও তো 'হাদীস' আছে।' আরেকজন বললো।

'আমাদের ধর্মের প্রতি কি আমাদের ভালোবাসা নেই।'

'আমরা কেন ওদের মতো হতে পারবো না?'

'মুসলমানদের চেয়ে আমরা আরো বড় ধর্মানুরাগী হতে পারবো।'

যফীর বিন কুরতাস হাত নেড়ে সবাইকে থামালেন।

'বন্ধুরা, সত্যি কথা বলতে কি আমরা আমাদের নবী ঈসা মসীহের খাটি অনুসারী হতে চাইলেও হতে পারবো না।'

'কেন?' 'কেন?'

'এসব কী বলছেন আপনি।'

'অবশ্যই পারবো।' জটলার সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো। তাদের কণ্ঠে কিছু উষ্মাও প্রকাশ পেলো।

যফীর বিন কুরতাস আবার হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত করে বললেন,

'বন্ধুরা, শোনো কোন কিছু বুঝতে চাইলে আগে যুক্তি-বুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করলে দেখবে, আমাদের বাইবেলই এখন আর সেই অবিকৃত খাটি বাইবেল নেই।'...

'যে বাইবেল বা ইঞ্জিল নিয়ে আমাদের গর্ব, আমি আগেও বলেছি সেই বাইবেল অনেক আগেই বিকৃত হয়ে গেছে। যাকে অবলম্বন করে আমরা শক্তিশালী ধর্মসত্ত্বায় নিজেদেরকে বলীয়ান করবো, সেই উৎস- শক্তিই যদি দুর্বল হয় তাহলে কিভাবে আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠবো?'...

'আর আমাদের নবী ঈসা মসীহেরও কম মূল্যবান বাণী ছিলো না। কিন্তু তার সেসব অমূল্য বাণী বা আদর্শগাথা কষ্টিপাথরে যাচাই করে কেউ সংরক্ষণও করেনি। খুব সামান্যই সংরক্ষিত হয়েছে। তাও প্রামাণ্য নির্ভর নয়।'...

'সুতরাং বাস্তবতা আর তর্ক এক জিনিস নয়। তর্কে বাস্তবতা উদ্ধার হয় না। সত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করার দক্ষতা থাকলেই বাস্তবতা উদ্ধার হয়। সেই সত্যের সামনেই আমাদের দাড়ানোর সময় এসে গেছে।'

তার কথায় সমবেত কিবতীর যেন সম্বিত ফিরে এলো। সবাই এক সঙ্গে যফীর বিন কুরতাসকে সুধালো,

'আমরা এখন কি করবো?'

যফীর বিন কুরতাস গম্ভীর গলায় অনেকটা সিদ্ধান্ত শোনানোর ভঙ্গিতে বললেন,

'আমি ঠিক করেছি, যে ধর্মগ্রন্থ অবিকৃত, বিশুদ্ধ সত্যের কষ্ঠিপাথরে যাচাইয়ের পর উত্তীর্ণ, যার বিশুদ্ধতা প্রলয়কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে সেই গ্রন্থের অনুসারী হবো। যে মহান নবীর ওপর এই গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনবো।'

কয়েক মিনিট সমবেত কিবতীরা যফীর বিন কুরতাসের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তারপর এক সঙ্গে দশ বারজন হঠাৎ দাড়িয়ে বললো,

আমাদের সিদ্ধান্তও তাই।'

'এটা আমাদের সবার সিদ্ধান্ত।' জটলার সবাই আকাশ বিদারী আওয়াজে বলে উঠলো।

পরের দিন যফীর বিন কুরতাসের নেতৃত্বে প্রায় ছয়'শ কিবতী আমর ইবনে আস রা. এর হাতে মুসলমান হয়ে গেলো।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডে সমাপ্য